জাতির পিতা নার্সিসাস সিনড্রোম এবং অন্যান্য

মাহমুদুর রহমান

মাহমুদুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক জ্বালানী উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া সিরামিক প্রযুক্তিতে জাপান থেকে ১৯৮৬ সালে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী। বাংলাদেশে সিরামিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে বিশেষত বোন চায়না প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্ব সিরামিক বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক কোম্পানী সমূহ যেমন ইংল্যান্ডের রয়্যাল ডলটন, ইতালীর জিনোরি, জাপানের তাকাসাগো এবং নিক্কোর মতো প্রতিষ্ঠানের নিকট মাহমুদুর রহমান একজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব। সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেসরকারি খাতের একজন সফল পেশাজীবী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন।

২০০১ সালে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে এবং জ্বালানী খাতে শৃঙ্খলা ও সততা আনয়নে তিনি সফলতার সংগে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বেসরকারি এবং সরকারি খাতে বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালনে তিনি প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার অধিকারী।

বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই এক গভীর সংকটকাল অতিক্রম করছে। এ সময়ে সত্যিকারের ঘটনা, তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে যে কয়েকজন দেশপ্রেমিক লেখক দুর্নীতি ও বিদেশী আধিপত্যবাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য লেখালিখি করছেন তন্মধ্যে মাহমুদুর রহমান অন্যতম।

'যে সুশীল(?) সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চিহ্নিত করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল এবং সরকারকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তারাও এখন সম্ভবত পিঠ বাঁচানোর তাগিদে উল্টো গীত গাইতে শুরু করেছে। বিশেষ সমাজভিত্তিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠান, সিপিডি এতদিন ধরে দৃশ্যত সরকারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার পর এখন অনেকটা আকস্মিকভাবেই সরকারের মুদ্রা নীতি ও জ্বালানি নীতির বিষয়ে সমালোচনামুখর হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক পরাশক্তির স্থানীয় পোষ্য কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি অতীতের রাজনৈতিক সরকারের দলগুলোয় ক্রিয়াশীল চাটুকারদের মতো সর্বতোভাবে নীতিনির্ধারকদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যাতে সরকার অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে। ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমাতাসীনদের বিরক্তি উৎপাদনজনিত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত আমাদের নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন সরকারকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ তাদের ভোল পাল্টানোর এ দুর্বল প্রচেষ্টা দেখে ডুবন্ত জাহাজ থেকে পলায়নপর ইঁদুরের গল্পই দেশবাসীর স্মরণে আসবে। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এ ব্যক্তিরাই বাংলাদেশের বর্তমান জটিল অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তারা পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্নকারী অপতৎপরতা চালিয়েছেন, বর্তমান সরকারের প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন নেতিবাচক পরামর্শ দিয়ে শাসকদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছেন। সর্বদা অর্ধসত্য সংবলিত তথ্য দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন। এ শ্রেণীর এখন আত্মোপলব্ধি করা উচিত, কোনো মুখোশ ধারণ করেই আর জনগণের রুদ্ররোষ থেকে পালানো যাবে না। বাংলাদেশের দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরা আজ যেমন তাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে, একই পন্থায় জ্ঞানপাপীরাও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডের জন্য অদূর ভবিষ্যতে বিচারের সম্মুখীন হবে এমন প্রত্যাশা দেশবাসী করতেই পারে।'

'বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ও রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি জনগণেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক-এগারোর সরকারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ পরিবর্তনটি যে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ যে একটি সমৃদ্ধশালী ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে সক্ষম, এটি আমি সর্বদাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছি। তবে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই দুর্নীতি ও বিদেশী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে।'

জাতির পিতা
নার্সিসাস সিনড্রোম
এবং অন্যান্য

মাহমুদুর রহমান

বুকমাস্টার

www.pathagar.com

জাতির পিতা, নার্সিসাস সিনড্রোম এবং অন্যান্য

মাহমুদুর রহমান

প্রকাশক
আহমদ হোসেন মানিক
বুকমাস্টার, ৮৬ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৩৪৪২৩০

প্রথম প্রকাশ
২৬ জুলাই ২০০৭

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার

মুল্য
দুইশত টাকা

Jatir Pita, Narcissus Syndrom Abong Onyanyo by Mahmudur Rahman
Published by Ahmed Hossain Manik, Bookmaster, 86 Purana Paltan Lane, Dhaka 1000.
First Publication 26 July 2007, Price : Tk. 200.00, US$ 10

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শহীদ জিয়াউর রহমানকে
যার দেশপ্রেম এবং সততা দায়িত্ব পালনে
আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে।

www.pathagar.com

প্রাককথন

আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে কখনও সংবাদপত্রে কলাম লিখব এ ধরনের কোন কল্পনা কস্মিনকালেও মনের কোন নিভৃতে স্থান পায়নি। বরং যে সব বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক অথবা 'সুশীল' সমাজের প্রতিনিধিরা সংবাদপত্রের নিয়মিত কলামিস্ট তাদের লেখার ক্ষমতায় সর্বদাই চমৎকৃত হয়েছি। বেসরকারি খাতে একজন পেশাজীবীর কর্মজীবনে মালিক পক্ষের জন্য অবশ্য নিয়মিতভাবেই প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নানা রিপোর্ট লিখতে হতো । তবে তার মাধ্যম সর্বদা ইংরেজী ভাষাই ছিল। পাঁচ বছরের সরকারি কর্মজীবনে বিষয়ের পরিবর্তন হলো। রসায়ন, সিরামিকস্, টেক্সটাইলের সংগে যুক্ত হলো ম্যাক্রো ইকোনোমিক্স, কুটনীতি, জ্বালানী, ইত্যাদি। সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের সংগে দীর্ঘদিন পর লেখার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ফিরে এলো। প্রায় তিন যুগ আগে কলেজ পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করার পর স্বজনদের কদাচিৎ পত্র লেখা ছাড়া বাংলা চর্চার সুযোগ হয়নি। অকপটে স্বীকার করছি, প্রথম দিকে সরকারি নথি লেখার সময় প্রায়শই বাংলা অভিধানের পাতা উল্টাতে হতো। তবে পাঁচ বছর একজনের জীবনে দীর্ঘ সময়। শেষের দিকে দেখতাম অভিধান ছাড়াই বাংলায় নথি লেখার কাজ চলছে। যাইহোক, দেশের রাজনীতির এক টালমাটাল সময়ে অবশেষে সরকারি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলাম। ভাবলাম লেখা-লিখির এবার ইতি।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর মহান আল্লাহ্তায়ালা বোধহয় চান অন্যকিছ। সরকার পরিচালনার বিশাল সাগর ছেড়ে ফিরে এলাম পারিবারিক ব্যবসার ক্ষুদ্র জলাশয়ে। দেশে তখন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে চারদিকে শুধুই নৃশংসতা, অরাজকতা এবং আত্মবিনাশী কর্মসূচী। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের এক ইউরোপীয় ক্রেতা বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কাজে এলেন। ভদ্রলোক আমার দশ বছরের পুরনো বন্ধু এবং বাংলাদেশ তার কাছে অতি পরিচিত। তিনি মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের লগি-বৈঠা হাতে উন্মত্ত মানুষের নৃশংসতার দৃশ্য তাকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করেছে। এ বাংলাদেশ তার একেবারেই অচেনা। লজ্জিত হলাম, বিব্রত হলাম, বড় কষ্ট পেলাম। ভাবলাম কোথায় যাচ্ছে আমার প্রিয় মাতৃভূমি। একটি অতি উচ্ছৃঙ্খল জাতির পরিচয় কি আমরা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি? বিনিয়োগ বোর্ডে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের এ ভাবমূর্তি নিয়েই তো প্রায় একাকী যুদ্ধ করতে হয়েছে বিদেশী মদদপুষ্ট মহাশক্তিমান বিরুদ্ধবাদীদের সংগে। মনে হলো প্রতিবাদ করতে হবে, নইলে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতি

www.pathagar.com

ঘটবে। সে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবেই কলম হাতে তুলে নিলাম। লিখলাম, 'অবরোধের রাজনীতি ও বিপন্ন বাংলাদেশ'। লেখাতো হলো, এখন সমস্যা হলো এ অখ্যাত কলামিস্টের লেখা ছাপাবে কোন পত্রিকা ? অনুজ প্রতীম প্রতিভাবান সাংবাদিক 'নয়া দিগন্তের' চীফ রিপোর্টার মাসুমুর রহমান খলিলীকে বলতেই এক কথায় সে তার পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিল। দিনটি ছিলো গত বছর ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখ। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহেই লিখছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান, ঝুঁকি এবং সম্ভাবনার কথা বোঝার চেষ্টা করে চলেছি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের উত্থান সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যে একটি উদাহরণ হতে পারতো। অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রাথমিক ভিত্তিও আমরা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরিতাপের বিষয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা, দুর্নীতির বিস্তার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতার সমন্বয়ে অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ আজ শক্তি মদমত্ত বিশ্ব এবং আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় একমাত্র ওয়াকিবহাল এবং দেশপ্রেমিক জনগণের জাগরণই পারে সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে বাংলাদেশকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে আবার পরিচালনা করতে।

এর মধ্যে এক-এগারোর পরিবর্তনে দেশের মানুষ আশান্বিত হতে শুরু করেছিলো। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই প্রতীয়মান হচ্ছে যে শাসক শ্রেণী পুনর্বার জনগণের আশা আকাঙ্খার ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে অতি দ্রুত শাসক শ্রেণীর সংগে সাধারণ জনগোষ্ঠীর দূরত্ব তৈরী হচ্ছে। বর্তমান শাসকদের শাসন প্রক্রিয়াঅবলোকন করে বিশ্ব কবির একটি কবিতার বিখ্যাত পংক্তি স্মরণে আসছে -

প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি,কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই

তাই জরুরী শাসকদের বিরক্তি উৎপাদনের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই লিখে চলেছি তাদের ভুল এবং ব্যর্থতার কাহিনীও। অতীত এবং বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে চিন্তার খোরাক দেয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। যাই লিখছি তাতেই উৎসাহ দিয়ে চলেছেন অগ্রজপ্রতিম, শ্রদ্ধাভাজন, নয়া দিগন্তের নির্বাহী সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন বাবর। তার সম্পাদকীয় বিভাগের সদা হাস্যময় নবীন সহকর্মী আলফাজ আনাম আমাকে লেখার তাগাদা দেয়ার কাজটি সুচারুরূপে পালন করে চলেছেন। নয়া দিগন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সার্বিক সহযোগীতার জন্যে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ বইয়ের সবগুলো নিবন্ধই বিগত সাত মাসে লেখা। লেখা বাছাইয়ের কাজটি করেছেন বুকমাস্টারের স্বত্বাধিকারী, ভ্রাতৃপ্রতিম জনাব আহমদ হোসেন মানিক। তার আগ্রহ এবং উদ্যোগের ফলেই বইটি প্রকাশিত হতে পেরেছে। বইটি প্রকাশনায় যারা কাজ করেছেন তাদের সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং সালাম জানাচ্ছি। বইটি একজন পাঠককেও ঘুম থেকে জাগাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

২৬ জুলাই ২০০৭

মাহমুদুর রহমান
mahmudurart@yahoo.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

অবরোধের রাজনীতি ও বিপন্ন বাংলাদেশ / ০৯

সংবিধান ও মৌলিক অধিকার শুধুই তাদের জন্য? / ১২

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিশ্রুতি ও দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি / ১৭

অপ্রকাশ্য অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশ / ২১

অন্তরে বাহিরে মহাজোট / ২৫

অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার বিপদ সংকেত / ৩১

কেমন ছিল চারদলীয় জোট সরকারের প্রশাসন? / ৩৭

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের ইতিবৃত্ত / ৪২

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় দুদকই কি যথেষ্ট? / ৪৮

সরকারের দৃষ্টি এবার প্রসারিত করার পালা / ৫৪

মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা : ক্ষতিপূরণের নেপথ্যে / ৫৯

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসনের চিত্র / ৬৫

দেশে-বিদেশে জাতির পিতা / ৭১

বাংলাদেশে সুশাসন ও মার্কিন পুরস্কার / ৭৮

বিলম্বে বোধোদয় / ৮৪

নার্সিসাস সিনড্রোম / ৯১

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত নির্বাচন ২০০৮ / ৯৭

কাঠগড়ায় রাজনীতিবিদ / ১০৪

কী কথা তাহার সনে / ১০৯

সংস্কার এবং প্রস্থান / ১১৬

বায়বীয় সিন্ডিকেটের সন্ধানে / ১২২

জরুরি অবস্থা ঃ আক্রান্ত বিনিয়োগ / ১২৮

'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' কারে কয়? /১৩৩

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র প্রাসংগিকতা / ১৪০

ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ সংযোগের নেপথ্যে / ১৪৭

স্বাধীনতা থেকে এক-এগারো এবং পরবর্তী গন্তব্য / ১৫৪

বাজেটের বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা / ১৬৮

বাংলাদেশের মিডিয়া টাইকুনরা, টিআইবি এবং একজন ওসমান চৌধুরী / ১৭৬

বিত্তবানদের বিস্ময়কর মাতৃভূমি বিদ্বেষ / ১৮২

ভারত-আওয়ামী লীগ বিশেষ সম্পর্কের সম্ভাব্য বিবর্তন / ১৮৮

দিশাহীন যাত্রা / ১৯৬

সহস্রাব্দের দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা / ২০৩

সমন্বয়হীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা / ২১০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবরোধের রাজনীতি ও বিপন্ন বাংলাদেশ

আমাদের রাজনীতিবিদরা তাদের ভাষ্য অনুযায়ী সর্বদাই জনগণের জন্য রাজনীতি করেন। তাদের কারোরই চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। শুধু এ দেশের দুঃখী জনতার ভাগ্য পরিবর্তনের মহৎ উদ্দেশ্যেই নাকি তাদের জীবনব্যাপী আত্মত্যাগ। বিশেষত অতি জনপ্রিয়তার দাবিদার চৌদ্দদলীয় জোট বাংলাদেশের জনগণের স্বঘোষিত ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের অধিকাংশই পেশাগতভাবে সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ, আইনসিদ্ধভাবে অর্থ উপার্জনের কোনো পেশার সংগে তাদের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে আমজনতা একেবারেই অন্ধকারে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, অভিজাত এলাকায় বসবাস করেন, অনেকেরই বাহন হচ্ছে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের নিশান কিংবা পাজেরো অথবা লেক্সাস। জনসভায় তাদের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন, স্বাধীনতার পরের সাড়ে তিন বছর এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়কাল ব্যতীত এ দেশে কোনো উন্নতিই সাধিত হয়নি। এসব বক্তব্য প্রদানের সময় তারা নিজেদের দিকে ভুলেও তাকান না। দেশের অর্থনীতির কোনোই উন্নতি না হলে তাদের পায়েই ১৯৭১-এর বাটার রাবারের জুতোর জায়গায় এখন ইতালিয়ান সু কোন জাদুবলে শোভাবর্ধন করছে, সে প্রশ্ন করার কথা আমাদের দেশের অতি স্বাধীন সাংবাদিকদের স্মরণে থাকে না অথবা সাহসে কুলোয় না।

দুর্জনরা যা-ই বলুক না কেন, স্বাধীনতার পর এ ৩৫ বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি এখন তারই দেশের জনগণের আব্রু রক্ষায় বেশ বড় রকমের ভূমিকা রাখছে। এ দেশের ৩০ লাখ শ্রমিকের পরিশ্রম এবং ৫ হাজার উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ও মেধার ফসল হচ্ছে – সমগ্র বিশ্বের পরিধেয় বস্ত্রের শতকরা ৪ ভাগের অধিক সরবরাহ করছে একা এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালে যে দেশ ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যও রফতানি করতে পারত না, সে দেশের রফতানির পরিমাণ এ বছর এত গোলযোগ ও মনুষ্যসৃষ্ট বাধা সত্ত্বেও ১২ হাজার মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। স্বাধীনতার পর এ ৩৫ বছরে শুধু রফতানির প্রবৃদ্ধি ৬০ গুণ। অবিশ্বাস্য কিন্তু অতি সন্তোষের সফলতার কাহিনী।

এ সময়ের মধ্যেই এক স্বাপ্নিক বাংলাদেশী ড. মোহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল বিজয়ী হয়েছে। দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে বিশাল আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতকে পেছনে ফেলেছে আমাদের এ বাংলাদেশ। সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করেছি আমরা। তবু দুর্ভাগা এ মাতৃভূমির ললাট থেকে কিছু না হওয়ার কলংকতিলক জনদরদি সব রাজনীতিবিদ কিছুতেই মুছতে দেবেন না। কারণ বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে এ সংবাদে তাদের ভিনদেশী সমর্থকদের স্বার্থহানি হবে।

www.pathagar.com

বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা দেশে-বিদেশে কম হয়নি। বছরের পর বছর দুর্নীতিতে বাংলাদেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বানানো হয়েছে, একটি শান্তিপূর্ণ দেশের গায়ে নব্য আফগানিস্তানের লেবেল লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে প্রতিটি শ্মশ্রুমন্ডিত নাগরিকের মধ্যে মৌলবাদী খোঁজার অপচেষ্টা করা হয়েছে, এখানে বিনিয়োগ লাভজনক হবে না এ প্রচারের সুবিধার জন্যই তথাকথিত ব্যবসায়ী জরিপের মাধ্যমে সুশীল সমাজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করার কোনো উদ্যোগ আর বাদ যায়নি। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশটি এগিয়েছে। প্রফেসর ইউনূসের মতো অনেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থানপর্ব অবশেষে শুরু হয়েছে। এ সেদিন আঙ্কটাডের মহাসচিব ড. সুপাচাই বাংলাদেশের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লিখলেন, "The overall pattern of change for the LDC's as a group is strongly influenced by what is happening in Bangladesh."

তার কথায়, এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোয় পরিবর্তনের সামগ্রিক ধারা বাংলাদেশে কী হচ্ছে তার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হবে। তিনি আরো লিখলেন, "Between 1990-1993 and 2000-2003, half of the total increase in manufacturing value-added in the LDC group as a whole was attributable to the growth of manufacturing in Bangladesh."

আয়তনে অতি ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশের জনগণের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার এ স্পর্ধা আমাদের বন্ধুদের সহ্যের সীমা বোধ হয় পার করে দিয়েছে। কাজেই শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর সরাসরি আক্রমণ। অবরোধের পর অবরোধ দিয়ে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে জীবনযাত্রা। বিদেশী ক্রেতাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে বাংলাদেশের সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক চরম ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো অর্থনীতিবিদই জানেন যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রফতানিনির্ভর। কাজেই রফতানি ব্যাহত করা গেলে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা প্রতিযোগিতা করছি একটি আঞ্চলিক পরাশক্তি এবং একটি বিশ্ব পরাশক্তির সঙ্গে। একে তো অসম প্রতিযোগিতা, তার ওপর যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত অবিবেচকের মতো রাজনীতির নামে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের কর্মকান্ডে লিপ্ত হন, তাহলে বাংলাদেশকে আবার সেই তলাবিহীন ঝুড়িতে ফিরিয়ে নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে পিছিয়ে নিতে আর বানোয়াট জরিপের প্রয়োজন হবে না, এমনিতেই আমরা উৎপাদকের পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী দেশের বাজারে পরিণত হব।

এবারের অবরোধের সময় নির্ধারণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অক্টোবর মাসে ঈদের ছুটির পর থেকেই কার্যত বাংলাদেশ অচল হয়ে রয়েছে। বিদেশে যারা বিভিন্ন পণ্য রফতানি করেন তারাই অবহিত আছেন যে, অক্টোবর ও নভেম্বর এ দুটো মাস রফতানি বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় পণ্য রফতানি হয় প্রধানত বড়দিন ও নববর্ষের বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য। রফতানি বাণিজ্যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি আশংকা করছি, ২০০৭ সালে বড়দিন ও নববর্ষের পণ্য সরবরাহের সুযোগ আমরা আর পাব কি না ; আর পেলেও তা কী পরিমাণে কমে যাবে। অবরোধের

www.pathagar.com

রাজনীতির রূপকাররা এতই নির্মম যে তারা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন চাকরিজীবীরা বেতন পাবেন, ঠিক তখনই অবরোধ দিয়েছেন। বেতন না পাওয়ার কারণে শ্রমিকরা যদি অনাহারে থাকেন অথবা চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পারার কারণে যদি তারা কিংবা তাদের প্রিয়জনরা প্রাণ হারান - তাহলে তথাকথিত জনদরদি নেতারা কেমন করে সে ক্ষতি পূরণ করবেন এটিই জিজ্ঞাস্য। তারা হয়তো বলবেন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। তাদের ঈশপের সে অতি পরিচিত গল্প মনে করিয়ে দিতে চাই, যেখানে আক্রান্ত ব্যাঙেরা বলেছিল, 'হে বালকেরা তোমাদের জন্য যা খেলা, আমাদের জন্য সেটিই মরণ।' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমাদের তথাকথিত বিশিষ্ট নাগরিকরা, যারা সব বিষয়ে সবর্দা সরব থাকেন, তারা দেশের অস্তিত্বের এ প্রসংগে একেবারেই নীরব। ব্যাপারটি মোটেই কাকতালীয় নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার এ খেলায় তারাও কিন্তু তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বেশ বিশ্বস্ততার সংগে পালন করে চলেছেন।

অবরোধ যে একটি জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মসূচি এবং চৌদ্দদলীয় অন্ধ সমর্থক ব্যতীত সর্বস্তরের জনসাধারণ এ কর্মসূচির কারণে বিক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, এটি চৌদ্দদলীয় নেতৃবৃন্দ যে বোঝেন না তা নয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে প্রতি সপ্তাহে তারা দুই থেকে তিন দিন লাগাতার অবরোধ দিয়ে আবার যে তা স্থগিত করছেন, তা জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চৌদ্দদলীয় সমর্থক ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টিও হয়তো বা তাদেরকে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছে। ব্যবসায়ীরাও নিশ্চয়ই এটি বোঝেন যে, চৌদ্দদল ক্ষমতায় গেলেও শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীই অনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ চৌদ্দদলীয় সমর্থক ব্যবসায়ীরাও বর্তমান অবরোধের কারণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব হবে না, এটিই বাস্তবতা। গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রিয় মাতৃভূমিকে ঘিরে বিদেশী স্বার্থরক্ষার এজেন্ডা বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তঃস্থায়ী দুর্বলতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ক্রমাগত ব্যর্থতা চৌদ্দদলীয় জোটের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে এক প্রকার বৈধতা দান করেছে। এখন একমাত্র নিঃশব্দ অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ (silent majority) জনগোষ্ঠীর সরব ও কার্যকর প্রতিরোধই পারে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো রক্ষা করতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন এবং অর্থনীতি দেশী-বিদেশী কৌশল প্রয়োগে বিপর্যস্ত। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ আবাসভূমি রেখে যেতে হলে আমাদের দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং তা এখনই।

০৬.১২.০৬

www.pathagar.com

সংবিধান ও মৌলিক অধিকার শুধুই তাদের জন্য?

নিবন্ধের শুরুতেই অকপটে স্বীকার করছি, আইনশাস্ত্রে আমার লেখাপড়া অতি সীমিত। সেই কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে কুড়িটি কোর্সের মধ্যে ১০০ নম্বরের একটি কোর্স ছিল ব্যবসাসংক্রান্ত আইন বিষয়ক। বিষয়টি আমার কাছে খুবই নিরস মনে হতো এবং এ যাবৎ আমার আইনসংক্রান্ত লেখাপড়া ওই ১০০ নম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারি দায়িত্ব ত্যাগের পর গত এক মাসেরও অধিক সময় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং দেশের সব প্রখ্যাত আইনজীবীর ১৮০ ডিগ্রি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সূত্র ধরে বাংলাদেশের সংবিধান বোঝার চেষ্টা শুরু করেছি। আইবিএ ব্যতীত আমি প্রধানত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্র। কাজেই কিছুটা হলেও নিজেকে একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি বলে দাবি করলে পাঠকরা হয়তো খুব বেশি আপত্তি করবেন না।

আমার জানা মতে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সে বিতর্কের অবশ্যই একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে। কিন্তু চৌদ্দদল সমর্থক আইনজীবীদের বক্তব্য পড়ে ও শুনে আমার মনে হচ্ছে, মিডিয়াসৃষ্ট এসব সংবিধান বিশেষজ্ঞ নিজেরাই এক একজন জীবন্ত সংবিধান এবং সে কারণে তারা তাদের বিশ্লেষণের আইনগত ভিত্তি প্রদানের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করছেন না। আমার জানা মতে, যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত সংবিধান নেই, রয়েছে সংসদ এবং রানী প্রদত্ত Statute। আমাদের দেশের আইনবিদ্যার এ মহীরুহদের যুক্তরাজ্যে রফতানি করা গেলে সে দেশের সংবিধান, আইনের শাসনের যে কী অবস্থা হতো তা কল্পনা করেই পরমানন্দ অনুভব করছি। আমাদের ওপর ২০০ বছর রাজত্ব করার প্রতিশোধের মোক্ষম অস্ত্র হতে পারেন এ আইনজীবীকুল।

বাংলাদেশের ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট – উভয় মিডিয়ার প্রচারের ওপর ভিত্তি করলে চারজন আইনজীবী বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের দাবি করতেই পারেন। এরা হলেন – ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর। এ চারজন আইন বিশেষজ্ঞ (!) সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সংবিধানকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিশ্লেষণ করে যেভাবে আমাদের মতো আমজনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, তা সংবিধানকে অস্বীকার করার সমতুল্য কি না তা পাঠকরাই বিবেচনা করবেন।

রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সংবিধানকে উদ্ধৃত করে বললেন– ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের বয়স যেহেতু ৭২ বছর পার হয়েছে কাজেই তার প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণ সংবিধানসম্মত হয়নি। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অশালীনভাবে ব্যঙ্গোক্তি করলেন, 'ইয়াজউদ্দিন

www.pathagar.com

সাহেবকে যে বাহাত্তরে ধরেছে, সেটা তিনি ভুলে গেছেন'। এ ধরনের বক্তব্য যে কতটা কুরুচিপূর্ণ এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মতো একজন প্রবীণ নাগরিকের কাছ থেকে এমন বক্তব্য আসা উচিত কি না, সে বিতর্কে না জড়িয়ে দেখা যাক, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে সংবিধান কি নির্দেশ দিচ্ছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮:৪ উদ্ধৃত করছি–

'কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি–

ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক; অথবা খ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা গ) কখনো এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।'

আমার মতো আইন না জানা ব্যক্তিরও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, সংবিধান রাষ্ট্রপতির বয়সের কোনো উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করেনি। এবার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত নির্দেশনা জানার জন্য আমাদের অনুচ্ছেদ ৫৮গ পড়তে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৮গ:৬ রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টার অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের বৈধতা দিয়েছে এভাবে– ['৫৮গ: ৬:– এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলিকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন']। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এ ক্ষেত্রে স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এবং এ কারণেই উপদেষ্টা হওয়ার বয়সবিষয়ক উর্ধ্বসীমা তার ক্ষেত্রে যে সাংবিধানিকভাবেই প্রযোজ্য হবে না, এটি বোঝার জন্য পাঠকের ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মতো সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার জনাব ইসলামকে বোধহয় সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে তিনি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং পরে অপসারিত হয়েছিলেন। সে সময়ে তার বয়স কত ছিল এবং এখন ব্যারিস্টার ইসলামের 'বাহাত্তর' কত দূর, সেটি জানার বাসনা রইল।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বিদুষী কন্যা ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর এক টকশোতে বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে সরানোর কৌশল হিসেবে তার বাড়ির বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ বক্তব্য দোকান মালিক সমিতির এক নেতার বিচারপতি আজিজের বাড়িতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার হুমকির সমতুল্য। একজন ব্যারিস্টারের মনমানসিকতা দেখে একজন ব্যারিস্টারের শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। প্রথম কথা হচ্ছে বিচারপতি আজিজকে কষ্ট দেয়ার জন্য তার পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখতে হবে, এটি কোন জাতীয় বর্বরতা? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সংবিধান কি কাউকে এমন ধরনের হুমকি প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে? এ ধরনের হুমকি যে সংবিধান এবং দেশের প্রচলিত আইনের কতখানি বিরোধী, তা সংবিধানের মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো পাঠ করলেই সবাই বুঝতে পারবেন। জ্ঞানপাপীদের ধৃষ্টতার সীমা বোঝানোর জন্য এখানে শুধু সংবিধানের

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২৭, ৩২ এবং ৪৪ উদ্ধৃত করছি -

'অনুঃ ২৭ : আইনের দৃষ্টিতে সমতা – সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী '

'অনুঃ ৩২ : জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ – আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না'

'অনুঃ (২২) [৪৪ : মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ – ১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (২৪)(১) দফা] অনুযায়ী (২৩) [হাইকোর্ট বিভাগের] নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল' ২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন (২৩) [হাইকোর্ট বিভাগের] ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন] ।

সম্প্রতি পিতৃতুল্য সিনিয়র আইনজীবী এটর্নি জেনারেলের প্রতি অত্যন্ত অবমাননাকর উক্তি করে ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর চৌদ্দদলীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের কাছে অতিশয় সমাদৃত হয়েছেন এবং দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ততোধিক নিন্দিত হয়েছেন ।

ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ড. কামাল হোসেন প্রধান বিচারপতির এজলাস আক্রমণ করে এবং সুপ্রিমকোর্ট চত্বরে ধ্বংসযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণের শেষ ভরসাস্থল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মতো একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন । সংবিধান ও আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ছাড়া এ ধরনের তান্ডব চালানো অসম্ভব । চৌদ্দদল সমর্থক আইনজীবীদের প্রচন্ড করতালির মধ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে ব্যারিস্টার মাহমুদ চরম অশ্রদ্ধাপূর্ণ এবং আদালত অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন - 'আজ থেকে আপনি মাননীয়ও নন, প্রধানও নন, বিচারপতিও নন ।' প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে এ বক্তব্যের মধ্যে জাতি বাকশালী শাসনব্যবস্থার যাবতীয় সভ্যতাবিরোধী ঔদ্ধত্যের প্রত্যাবর্তনের অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছে । সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিকের দাবিদার, বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই ড. কামাল হোসেনের সংবিধান ও আইনের শাসনবিরোধী অবস্থান জাতিকে নিঃসন্দেহে হতাশ করেছে । ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ড. কামাল হোসেনকে নিগৃহীত করে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল । ১৯৯৬ থেকে ২০০১ – এ সময়কালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ড. কামাল হোসেনের বাসার সামনে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে এবং তার পরিবারকে বিব্রত করার জন্য রাতারাতি বস্তি বসিয়েছিলেন । এত অপমানিত হওয়ার পরও চৌদ্দদলভুক্ত আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ড. কামাল হোসেনের রয়েছে । তবে দৃষ্টিকটুভাবে চৌদ্দদলের পক্ষাবলম্বনের মাধ্যমে সংবিধান বিকৃত অথবা খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করে তিনি তার নামের প্রতি সুবিচার করছেন না । সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে আদালতের অবমাননা করে এখন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে যৌথভাবে পত্রিকার পাতায় আকুল আবেদন ছাপিয়ে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা জনমানুষের কাছে ড. কামাল হোসেনের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করছে কি না সে বিবেচনার ভার তার ওপরই ছেড়ে দিলাম ।

www.pathagar.com

বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ দুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি। উভয়েরই সততা ও বিশ্বস্ততার সুনাম রয়েছে। চৌদ্দদলীয় রাজনীতিবিদরা এবং মিডিয়া যেভাবে এ দুজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পরিবারসহ অপমানিত করেছে তাতে জাতি হিসেবে আমাদের মযার্দাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই নিন্দিত কর্মকান্ডে আমাদের বিশেষ দলীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞরা শুধু সার্বিক সমর্থনই প্রদান করেননি, বরং নিজেরাও বিভিন্ন মিডিয়াতে তাদের প্রতি অপমানসূচক মন্তব্য করেছেন। এবার যে সেই অন্যায় ও অপমানের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে, তা তাদের আকুল আবেদন থেকেই দেশবাসী বুঝতে পারছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপমানিত' কবিতার বিখ্যাত দুটি পংক্তি অন্তত ড. কামাল হোসেনকে সবিনয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি :

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

চৌদ্দদলের নেতৃবৃন্দের সংবিধানবিরোধী দাবিগুলোর আপাতত সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে, সংবিধান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করার আবদার। তাদের দাবি অনুযায়ী সংবিধান বহির্ভূতভাবে অন্তত পক্ষে ৩০ দিন পর নির্বাচন হতে হবে। এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আবার সংবিধানের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এ প্রসংগে অনুচ্ছেদ ১২৩ : ৩ এবং সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন উদ্ধৃত করব।

অনুচ্ছেদ : ১২৩ : (৩)

'মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যের সাধারণ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হইবে।'

সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন

'সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

'(৩) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হইবে।'

সংবিধানে নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ না থাকায় চৌদ্দদলীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এবং তাদের সমর্থক মিডিয়া বিভিন্ন কুযুক্তির অবতারণা করছেন। কেউ সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অতি সরলীকরণের মাধ্যমে বিকৃত করে সস্তা বক্তব্য দিচ্ছেন যে, জনগণের জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য জনগণ নয়। এই যুক্তিতে তাদের বক্তব্য হলো সংবিধান লঙ্ঘন করলে যদি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জনগণের কষ্টের অবসান হয়, সে ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘনই উত্তম। আবার অন্যরা বলছেন, রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং পুনরায় সংবিধান লঙ্ঘন করা যেতেই পারে। ক'দিন আগে চ্যানেল আইয়ের আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে চৌদ্দদলের সমর্থক 'প্রথম আলো'র এক সাংবাদিক এ জাতীয় যুক্তির মাধ্যমে চৌদ্দদলের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তিনি সংবিধানবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছিলেন আবার প্রতি পাচ মিনিট পরপর আত্মপক্ষ সমর্থনে বলছিলেন, 'আমি কিন্তু চৌদ্দদলের সমর্থক নই।' ভন্ডামিরও একটা সীমা থাকা দরকার। আসল কথা হলো ওই সাংবাদিক নিজেও

www.pathagar.com

জানেন, এগুলো যুক্তি নয়, কুযুক্তি। আর তাই নিজেকে বাঁচানোর এ দুর্বল অথচ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের আইনগত ভিত্তিমূলেই আঘাত করা হচ্ছে। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংবিধানকে অবজ্ঞা করার একটি নিকৃষ্ট নজির এ গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে এবং নির্বাচন পেছানোর এ দাবি মেনে নেয়া হলে যে 'প্যান্ডোরার বাক্স' খোলা হবে, তাকে আর বন্ধ করা সম্ভব হবে কি না তা সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে দেশে একটি বিশেষ শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে, যারা নিজেদের দেশের সব আইন ও জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করার কারণে তারা নিজেদের ছাড়া বাংলাদেশের আর সব নাগরিককে শাসিত হিসেবে বিবেচনা করেন। আর তাদের বিচারে দেশের সংবিধান ও মৌলিক অধিকারে শাসিতের কোনো স্থান নেই। এ শ্রেণী এবং তাদের স্তাবকদের জন্য বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করব এ নিবন্ধ, 'Too often we seek for justice, just for us.'

১২.১২.০৬

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিশ্রুতি ও দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি

আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা কিংবা তাদের স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য সেটি পত্রিকার পাতায়ই হোক কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়ই হোক, সচরাচর বিকৃত তথ্য এবং বাক-চাতুর্য নির্ভর হয়ে থাকে। টেলিভিশনের টকশোগুলো দেখলে বা পত্রিকার বিভিন্ন নিবন্ধ পাঠ করলে মনে হবে দর্শক ও পাঠকের কাছে সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই এবং বাংলাদেশের জনগণের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকে তারা প্রচন্ড অবজ্ঞা করেন। এ জাতীয় অবজ্ঞার সর্বশেষ নিদর্শন ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করলে ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানোর ব্যাপারে মহাজোট নেত্রীর বায়বীয় প্রতিশ্রুতি। বিরোধী দলে গেলে হরতাল না করার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে চালের ভবিষ্যৎ মূল্যবিষয়ক এ প্রতিশ্রুতির গুণগত পার্থক্য নেই। সংসদে দেয়া বহুল আলোচিত প্রতিশ্রুতি কী পরিমাণ রক্ষিত হয়েছে তা বোধকরি অবরোধে, হরতালে বিপর্যস্ত পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৫৭ বছর বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর কিংবা পবিত্র নগরী মক্কায় বসে সংসদ নির্বাচন এগিয়ে আনার প্রতিশ্রুতির পরিণতি নিশ্চয়ই জনগণ এখনো ভুলে যায়নি। পবিত্র নগরী মক্কা কিংবা সংসদে দেয়া প্রতিশ্রুতিরই যেখানে কানাকড়ি মূল্য নেই, সেখানে চালবিষয়ক বক্তব্য তো নেহায়েতই এক মেঠো বক্তৃতা মাত্র। জোটনেত্রী হয়তো ভেবেছেন – এসব বক্তব্য শুধু তাৎক্ষণিক হাততালি পাওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশের ক্ষমাশীল জনগণ রাজনৈতিক কপটতার বিরুদ্ধে সচরাচর খুব একটি প্রতিক্রিয়া দেখায় না। এটি তো সত্যি যে সকাল-বিকাল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরও জেনারেল এরশাদ রাজনীতি করছেন এবং আওয়ামী লীগ যেরকম নাটকীয় কায়দায় তাকে দলে ভেড়াল তাতে যে কারও মনে হতে পারে যে, তিনি এখনো বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতির জন্য প্রাসঙ্গিক এবং অতি প্রয়োজনীয় একজন নেতা। বাস্তাবতা হলো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংবাদমাধ্যম আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থক এবং তাদের নেত্রীর যেকোনো বাণীকে তারা 'বেদবাক্য'রূপে বিবেচনা করে। আমরা সবাই জানি যে, বিশ্বাস যেখানে অন্ধ, যুক্তি সেখানে অনুপস্থিত। কাজেই বাংলাদেশে চালের মূল্য ১০ টাকা কেজি হওয়া কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্বে যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও স্তাবকশ্রেণী বলেই যাবে যে, এটি সম্ভব।

চালের মূল্য কেজিপ্রতি ১০ টাকা হওয়া সম্ভব কি না, তা বাংলাদেশে চালের মোট চাহিদা এবং আমাদের কৃষকদের কেজিপ্রতি উৎপাদন খরচ হিসাব করলেই বোঝা যাবে। বাংলাদেশে চালের মোট চাহিদা প্রায় ২ কোটি ৭৫ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মোটা চালের চাহিদা প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টন। ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন – বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জন্য পানি এবং কৃষি শ্রমিকের মজুরি এগুলো বিবেচনায় নিলে প্রতি কেজি চালের উৎপাদন খরচ পড়ে কমপক্ষে ১৪ টাকা।

www.pathagar.com

কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের জন্য কেজিপ্রতি এক টাকা লাভ প্রদান করলে চালের ন্যূনতম মূল্য হওয়া উচিত কেজিপ্রতি ১৫ টাকা। এর সঙ্গে পরিবহন, মজুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ধরলে সরকারের সংগ্রহ মূল্য কোনো হিসাবেই কেজিপ্রতি ১৬ টাকার নিচে নামা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ১০ টাকা কেজি দরে নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে চাল সরবরাহ করতে হলে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে কেজিপ্রতি কমপক্ষে ছয় টাকা। অর্থাৎ ২ কোটি মেট্রিক টন চালের জন্য বছরে এই খাতে ভর্তুকি প্রয়োজন হবে ১২ হাজার কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের বাৎসরিক রাজস্ব আয়ের ২৫ শতাংশ। দেশের অর্থনীতিবিদগণ এবং উন্নয়ন সহযোগীরা অবগত আছেন যে, জ্বালানি তেল ও সার হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করার কারণে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখনই প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করতে হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উন্নয়ন বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য বাংলাদেশকে বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং এই সুযোগ ব্যবহার করে অতি ক্ষুদ্র উন্নয়ন সহযোগী দেশের রাষ্ট্রদূতও আমাদেরকে প্রায় প্রতিদিন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে অযাচিতভাবে জ্ঞান বিতরণ করছেন। এ জ্ঞান বিতরণ কখনো কখনো নির্দেশ প্রদানেও পরিবর্তিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশের যেকোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য বেদনাদায়ক ও অপমানজনক। এমতাবস্থায় ১২ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়ে যারা ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানোর বায়বীয় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তাদেরকে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা বোধকরি অন্যায় হবে না।

চৌদ্দদলীয় জোটের ভাষ্য অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা চারদলীয় জোট সরকারের একটি অন্যতম প্রধান ব্যর্থতা। চৌদ্দদলীয় জোটের সমর্থক অর্থনীতিবিদগণ প্রায়ই ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ এ দুই আমলের বিভিন্ন পণ্যমূল্যের পার্থক্য তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই জনগণ তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। অপরদিকে চারদলীয় জোট সমর্থকদের বক্তব্য হচ্ছে – ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালে উচ্চহারে সব খাতে মজুরি বৃদ্ধির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে এবং সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ক এ বিতর্ক অর্থনীতির গোড়া থেকেই চলে আসছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক, এ তত্ত্বে অনেক অর্থনীতিবিদই সম্ভবত একমত হবেন। ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ মি. জোসেফ স্টিগলিজ Globalization and its Discontents নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ে অতি সংবেদনশীলতার সমালোচনা করে লিখছেন– 'The IMF is particularly concerned about inflation. Countries whose governments spend more than they take in taxes and foreign aid often will face inflation, especially if they finance their deficits by printing money. Of course, there are other dimensions to good macroeconomic policy besides inflation. The term macro refers to the aggregate behavior, the overall levels of growth, unemployment, and inflation, and a country can have low inflation but no growth and high unemployment. To most economists, such a country would rate as having a disastrous macroeconomic framework.' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

মুদ্রা তহবিল মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। যেসব রাষ্ট্রের সরকার রাজস্ব আয় এবং বিদেশী সাহায্যের চেয়ে বেশি ব্যয় করে, সেসব দেশ মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়বে, বিশেষত যদি তারা মুদ্রা ছাপিয়ে ঘাটতি দূর করে। তবে মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত সুস্থ সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচক রয়েছে। সামষ্টিকের অর্থ হচ্ছে অর্থনীতির সামগ্রিক আচরণ, প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির সামগ্রিক অবস্থা। একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি কম, কিন্তু প্রবৃদ্ধি নিম্ন এবং বেকারত্বের হার উচ্চ হতে পারে। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের রাষ্ট্রকে বিপর্যয়কর সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ বলে মনে করবেন।

বাংলাদেশ ক্রমেই একটি উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়ে উঠছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের ফলে সঙ্গত কারণেই বিগত পাঁচ বছরে কিছুটা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। উচ্চ বেকারত্ব ও নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রুত কর্মসংস্থান ও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এ দুই অর্থনৈতিক মডেলের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি আমরা সবাই দ্বিতীয় মডেলটিকেই গ্রহণ করব। কারণ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য কিছুটা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মূল্য আমাদের অর্থনীতির নিয়মেই পরিশোধ করতে হবে।

আমার প্রায় ৩০ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শিল্প কারখানায় শ্রমিক এবং পেশাজীবীদের সঙ্গে কাজ করে। বিভিন্ন স্তরের সহকর্মীদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে শুধু প্রকৃত মজুরির হার সূচকই একজন কর্মজীবীর আর্থিক অবস্থার বিশ্বস্ত ও সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারে।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কালের (১৯৯৬-২০০১) সঙ্গে চারদলীয় জোট সরকারের সময়কালের (২০০১-২০০৬) প্রকৃত মজুরির হার সূচকের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

অর্থবছর	সরকার	প্রকৃত মজুরির হার সূচক
১৯৯৬-৯৭	আওয়ামী লীগ	১২০
১৯৯৭-৯৮	"	১২২
১৯৯৮-৯৯	"	১১৮
১৯৯৯-০০	"	১২১
২০০০-০১	"	১২৫
২০০১-০২	চারদলীয় জোট	১৩০
২০০২-০৩	"	১৪১
২০০৩-০৪	"	১৪৬
২০০৪-০৫	"	১৪৯
২০০৫-০৬	"	১৪৮

উপরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের শাসনামলের পাঁচ বছরে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে ১২০ থেকে ১২৫ অর্থাৎ মাত্র ৫। আর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনামলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১২৫ থেকে ১৪৮ অর্থাৎ ২৩। এ পরিসংখ্যানের তাৎপর্য হচ্ছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ এ সময়কালে

www.pathagar.com

দ্রুত শিল্পায়ন, অধিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার সূচক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের তুলনায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবার দেখা যাক, একই সময়কালে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক বৃদ্ধির অবস্থান কী ছিল :

অর্থবছর	সরকার	ভোক্তা মূল্যসূচক বৃদ্ধির হার
১৯৯৬-৯৭	আওয়ামী লীগ	৩.৯৬
১৯৯৭-৯৮	"	৮.৬৬
১৯৯৮-৯৯	"	৭.০৬
১৯৯৯-০০	"	২.৭৯
২০০০-০১	"	১.৯৪
২০০১-০২	চারদলীয় জোট	২.৭৯
২০০২-০৩	"	৪.৩৮
২০০৩-০৪	"	৫.৮৩
২০০৪-০৫	"	৬.৪৮
২০০৫-০৬(প্রাক্কলিত)	"	৭.২৫

অর্থাৎ আওয়ামী লীগের শাসনামলের পাঁচ বছরে গড়ে সূচক বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮১ এবং চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৩৫। আমরা এ পরিসংখ্যানে বিশাল কোনো পার্থক্য কী দেখতে পাচ্ছি? যেকোনো যুক্তিবাদী পাঠক একমত হবেন যে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও উপরের পরিসংখ্যানসমূহ প্রমাণ করছে, সামগ্রিকভাবে জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্য কমেছে।

পণ্য সরবরাহের উৎস বিবেচনায় দ্রব্যমূল্যের দুটো মাত্রা রয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি অথবা স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে স্থানীয় বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অবশ্যই ক্ষতিকারক। কিন্তু দেশে উৎপাদিত পণ্য বিশেষত কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়লে এবং সে বাড়তি মূল্য সরাসরি কৃষকরা পেলে সেটি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ২২ শতাংশ কৃষি খাত থেকে এলেও ২০০০-২০০৩ অর্থবছরের জরিপ অনুযায়ী কৃষিতে এখনো ৫২ শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত।

কাজেই এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা না গেলে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি দ্রুততর করা এবং জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শ্রমিকদের এবং সামগ্রিকভাবে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে হলে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। একই সংগে দ্রব্যমূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে এবং শহরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হলে সরকারকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করে সরবরাহ লাইন খাটো করতে হবে। তবে কোনো সরকারের পক্ষেই আলাদিনের চেরাগের সাহায্য ব্যতীত চালের মূল্য ১০ টাকা কেজি দরে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এটিই বাস্তবতা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বালখিল্য মাত্র।

২৩.১২.০৬

www.pathagar.com

অপ্রকাশ্য অর্থনৈতিক আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশ

একবিংশ শতাব্দীতে আগ্রাসনের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশই এখন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতি। যেকোনো আন্তর্জাতিক আইনেই একটি দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার অপচেষ্টা সে দেশের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের সমতুল্য। এ ধরনের অঘোষিত যুদ্ধ থেকে সদস্য রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আজকের জাতিসংঘ বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির আজ্ঞাবাহক মাত্র। জাতিসংঘের সদ্য বিদায়ী মহাসচিব কফি আনানের সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলোয় জাতিসংঘের অসহায়ত্ব নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে। ইরাক আক্রমণের বিষয়ে এখন তিনি বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথ বাহিনীর ইরাক আগ্রাসন প্রতিহত করতে না পারা জাতিসংঘের একটি বিশাল ব্যর্থতা এবং তার নিজের জন্যও অত্যন্ত বেদনার উপাখ্যান। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, সেনা আক্রমণের আগে দীর্ঘ ১২ বছর ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধের নামে আগ্রাসন চালিয়ে দেশটিকে ধ্বংস করা হয়েছে। লাখ লাখ শিশুকে বিনা চিকিৎসায়, অপুষ্টিতে, অনাহারে মারা যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এখন আবার ফিলিস্তিন ও ইরানে আমরা একই নাটকের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। ফিলিস্তিনের অপরাধ হচ্ছে, সে দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের পছন্দের সরকার নির্বাচিত করেছে। এ অপরাধের জন্য তাদের প্রদেয় সব ধরনের সাহায্য তো বন্ধ করা হয়েছেই, উপরন্তু ইসরাইলের কাছে শুল্ক হিসেবে তাদের পাওনা অর্থও দেয়া হচ্ছে না।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তাদের নির্লজ্জ, দ্বিমুখী চরিত্র নিঃশব্দে অবলোকন করা ছাড়া অসহায় বিশ্ববাসীর আর কিছুই যেন করার নেই। এ আপাত-অসহায়ত্বের পেছনেও রয়েছে অর্থনীতি। কারণ, যে দুটি রাষ্ট্র এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জাতিসংঘকে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে, সেই চীন ও রাশিয়া উভয় রাষ্ট্রই মার্কিন ডলারের আকর্ষণে নতজানু। সম্ভবত তাদের কৌশল হচ্ছে, আগামী এক বা দুই দশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো সংঘাতে না জড়িয়ে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ করে তোলা। কাজেই ধরে নেয়া যায়, অন্ততপক্ষে আগামী দুই দশক বর্তমানের মতোই জাতিসংঘ অকার্যকর থাকবে এবং দুর্বল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার জন্য কোনো নিরাপত্তা পরিষদ এগিয়ে আসবে না, যদি না কোনো পরিস্থিতিতে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি ওই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসে। আঞ্চলিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য বিপদ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায়ই আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির এ অবতারণা ও বিশ্লেষণ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাঁচ বছরে অর্থাৎ অর্থবছর ২০০১-০২ থেকে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত আমাদের বার্ষিক

www.pathagar.com

গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৭ শতাংশ। এ সময়ে শিল্প প্রবৃদ্ধি, রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বছরে গড়ে যথাক্রমে ৭.৬, ২২.০ ও ১৪.৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। দ্রুত শিল্পায়ন, অধিক বিনিয়োগ ও উচ্চ রফতানি প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সহজেই ৮ শতাংশ অতিক্রম করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির এ জাতীয় সাফল্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে অপরিলক্ষিত থাকেনি। স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর লিখিত এক প্রতিবেদনে আঙ্কটাড বাংলাদেশের শিল্প খাতের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, ৫০টি এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রের শিল্প খাতের মোট মূল্য সংযোজনের অর্ধেকই আসছে বাংলাদেশের শিল্প খাত থেকে। জাতিসংঘের সদ্য বিদায়ী মহাসচিবের সহকারী জেফরি সাক্স্ তার The End of Poverty গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানে রাষ্ট্ররূপে (Bangladesh : On the ladder of development) বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে জন্ম নেয়া আমাদের এ মাতৃভূমির দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের বর্ণনা প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীকে অনুপ্রাণিত করবে। জেফরি সাক্স্ লিখেছেন, 'Bangladesh was born in a war for independence against Pakistan in 1971. That year, it experienced massive famine and disarray, leading an official in Henry Kissinger's State Department to famously label it an 'international basket case'. Bangladesh today is far from a basket case. Per capita income has approximately doubled since independence. Life expectancy has risen from forty-four years to sixty-two years. The infant mortality rate (the number of children who die before their first birthday for every 1,000) has declined from 145 in 1970 to 48 in 2002. Bangladesh shows us that even in circumstances that seem the most hopeless there are ways forward if the right strategies are applied and if the right combination of investments is made.'

(বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে জন্মলাভ করে। ওই সময়ে বাংলাদেশে চরম দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলার ফলে হেনরি কিসিঞ্জারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে আখ্যায়িত করেন। আজকের বাংলাদেশ সেই অবস্থা থেকে অনেক দূরে। মাথাপিছু আয় স্বাধীনতার সময় থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গড় আয়ু ৪৪ বছর থেকে বেড়ে ৬২ বছর হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭০ সালের ১৪৫ থেকে কমে ২০০২ সালে ৪৮-এ দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ আমাদের দেখিয়েছে, আপাত-নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে অগ্রগতি লাভ সম্ভব, যদি সঠিক কৌশল ও বিনিয়োগের মিশ্রণ নিশ্চিত করা যায়।)

বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্প্রতি এ জাতীয় আরো প্রশংসনীয় আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, আঙ্কটাড, গোল্ডম্যান সাক্স্, টাইম ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমগুলো যা বোদ্ধা পাঠকবৃন্দ ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছেন। কী ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো সাধিত হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

রফতানি পণ্যসম্ভার যেহেতু সীমিত এবং প্রধানত পোশাক সামগ্রীনির্ভর, সে কারণে ২০০৫ সালে বিশ্ববাণিজ্যের কোটামুক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তর আমাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ২০০৪ সালে তাদের বিভিন্ন নিবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্য চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ পোশাক শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কর্মচ্যুত হবে এবং দেশের অর্থনীতি মারাত্মক সংকটে পড়বে। আমাদের দেশের বিশেষ মতের অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাও ভিন্ন কারণে একই ধরনের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যম এবং চারদলীয় জোট সরকারের বাস্তবোচিত কৌশল ও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সামর্থ্য বেড়ে যাওয়ায় কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থা আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে।

২০০৫ সালে বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য একটি অত্যন্ত নাজুক সময়ে দেশে নির্বাচনের সঠিক পরিবেশ সৃষ্টির আন্দোলনের নামে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার ইস্যুতে ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই থেকে টানা ৫২৭ দিন আন্দোলন করেছে চৌদ্দদলীয় জোট। এ সময়ের মধ্যে ১৭ দিন অবরোধ, ৮ দিন হরতাল ও ১২ দিন নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির করে দেয়া হয়েছে। এ আন্দোলনের সময়ের সহিংসতার বীভৎস রূপ জাতি প্রত্যক্ষ করেছে আটাশে অক্টোবর। এই দিনে চৌদ্দদলীয় জোটের নেতাকর্মীরা যে নৃশংস ও কলংকজনক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন তার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। এখান থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের আবার দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করতে হবে। অর্থনৈতিক আগ্রাসনের দ্বিতীয় ফ্রন্ট গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের নামে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ২০০৬ সালকে বেছে নেয়া হয়। বিভীষিকাময় কয়েকটি দিনের মধ্যেই ধ্বংস করা হয়েছে অসংখ্য গার্মেন্টস কারখানা, বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, রাস্তায় যানবাহন ভাঙচুরের মাধ্যমে দেশে এক সম্পূর্ণ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। দুই ফ্রন্টে পরিচালিত এ ধরনের আগ্রাসনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশকে একটি 'অকার্যকর রাষ্ট্র' হিসেবে চিত্রিত করার পাঁচ বছরব্যাপী দেশী ও বিদেশী চক্রান্তকে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী অব্যাহত হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে রফতানি বাণিজ্যকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। বছরের এ সময়ই বড়দিনের রফতানি কার্যাদেশের পণ্য বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়ে থাকে। এ কারণেই ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রফতানিতে আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব হলেও অক্টোবর মাসে আমাদের রফতানি ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসের তুলনায় কম হয়েছে। ২০০৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময় পরিধিতে বাংলাদেশ থেকে ৩২৫১.৮৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করা হয়েছে। আগের অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় এ বছর রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩১ শতাংশ। অথচ অক্টোবর মাসে রফতানি হয়েছে ৮৭০.৭৮ মিলিয়ন ডলার যা ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসের চেয়ে ২ মিলিয়ন ডলার কম। বাংলাদেশের রফতানি কমলে প্রধানত পাঁচটি দেশ

www.pathagar.com

লাভবান হবে। দেশগুলো হলো – ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দদলের প্রতি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এ পাঁচটি দেশের মধ্যে কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা দেশে অঘোষিত গৃহযুদ্ধ শুরু করেছেন। এখানে পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়া যেতে পারে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি এবং সাবেক গণবাহিনী প্রধান হাসানুল হক ইনু টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইতোমধ্যে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। অঘোষিত যুদ্ধের পর এবার সম্ভবত ঘোষিত যুদ্ধ অসহায় দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এত কিছুর পরও বাংলাদেশের অগ্রসরমান অর্থনীতির গতিকে রুদ্ধ করা যাচ্ছে না। ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং ব্যাংকের এ যাবৎ প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আমাদের দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৭.১-এ উন্নীত হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বিশ্লেষণে এ অভিমত দিয়েছে যে, শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, তেজী রফতানি এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণেই আমরা এ বছর এত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে যাচ্ছি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ইতোমধ্যে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং আশা করা যাচ্ছে বর্তমান অর্থবছরের মধ্যেই এ রিজার্ভ ৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে। এখানে উল্লেখ্য, ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে চারদলীয় জোট দায়িত্ব নেয়ার সময় বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র ১ বিলিয়ন ডলারের সামান্য ওপরে ছিল। জিডিপির এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার স্বস্তিদায়ক রিজার্ভ দেশের জন্য নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। তবে এ আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো অবকাশ নেই যে দেশী ও বিদেশী আক্রমণকারীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুনরায় আক্রান্ত হবে না। আগামী একটি মাস আমাদের জন্য অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত না শান্তি পূর্ণভাবে সব প্রধান দলের অংশ নেয়ার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পরাজিত দল বা জোট নির্বাচনের রায় মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ সংকট থেকেই যাবে। দেশপ্রেমিক জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য এবং আগামী ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে সুস্পষ্ট রায়ই পারে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বাংলাদেশবিরোধী অপশক্তিকে পরাজিত করতে।

০৭.০১.০৭

www.pathagar.com

অন্তরে বাহিরে মহাজোট

খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০ সালে গ্রিক মহাকবি হোমারের রচিত কালজয়ী মহাকাব্য ইলিয়াডে বর্ণিত রয়েছে যে, গ্রিক বাহিনী দীর্ঘ দিন ধরে অবরোধ করেও ট্রয় নগরীতে প্রবেশ করতে না পেরে অবশেষে একটি কাঠের ঘোড়ার সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। শত্রুবাহিনী কর্তৃক নির্মিত এবং চতুরতার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আপাত পরিত্যক্ত সেই বিশালাকার ঘোড়াটিকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ট্রয়বাসীদের একাংশ 'ঈশ্বরের উপহার' রূপে কল্পনা করে নেয়। সন্দেহবাদীদের বাধা সত্ত্বেও নগরবাসীরা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত নগরীর অভ্যন্তরে সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে এসে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনে। গভীর রাতে ওই ঘোড়ার অভ্যন্তরে লুকানো গ্রিক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে সুরক্ষিত ট্রয় নগরীর প্রধান ফটক খুলে দেয় তাদের সহযোদ্ধাদের প্রবেশের জন্য এবং পরিণামে ট্রয়ের ললাটে পরাজয় ও ধ্বংস নেমে আসে। শত্রুর বহিরাঙ্গ দেখে সবকিছু সরলভাবে বিচার করলে তার পরিণতি এমন করুণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যাহোক, হোমারের উপাখ্যানের সেই ট্রয়ের ঘোড়া প্রায় তিন হাজার বছর ধরে একাধারে নির্বুদ্ধিতা ও ধূর্ততার নিদর্শন হয়ে আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝানোর জন্যই হোমারের গল্পের অবতারণা করেছি। বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি আজ দু'টি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারার বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে আমজনতার কাছে পরিষ্কার। এ ধারার রাজনীতি মূলত বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ, বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি সমশ্রদ্ধাভিত্তিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা এবং রাজনৈতিকভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্র, এই নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক নীতির স্বচ্ছতার জন্য এই ধারা সম্পর্কে জনগণের সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ। সমস্যা হলো দেশের রাজনীতির প্রথম ধারার বিশে-ষণ যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন দ্বিতীয় ধারার চরিত্র বিশে-ষণ করা।

দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ অধুনা মহাজোটের প্রধান চরিত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এ দল ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা যুদ্ধের সহযোগী ভারতের প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণের নীতি, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত বাণিজ্যসহ বিশ্বায়নে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগের রাজনীতি অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম হন্তারক ছিল আওয়ামী লীগ। দেশের বেশিরভাগ জনসাধারণ অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালে সংসদে কোনো রকম বিতর্ক কিংবা আলোচনা ছাড়াই কণ্ঠভোটে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয়

www.pathagar.com

স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইনটি কতটুকু গণবিরোধী এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য কতটা অবমাননাকর ছিল, তা পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য চতুর্থ সংশোধনীর ১১৭(ক) ধারা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট।

'১১৭ক। জাতীয় দল। ০১. রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্রে শুধু একটা রাজনৈতিক দল (অতঃপর জাতীয় দল নামে অভিহিত) থাকবে।

০২. যখন এক দফার অধীন কোনো আদেশ প্রণীত হয়, তখন রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

০৩. জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচি, সদস্যভুক্তি, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

০৪. দফার অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশসাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।

০৫. এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যখন জাতীয় দল গঠিত হয়, তখন কোন ব্যক্তি–

(ক) যদি তিনি, যে তারিখে জাতীয় দল গঠিত হয়, সেই তারিখে, সংসদ সদস্য থাকেন তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় দলের সদস্য না হইলে সংসদ সদস্য থাকিবেন না এবং সংসদে তাহার আসন শূন্য হইবে;

(খ) যদি তিনি জাতীয় দলের দ্বারা রাষ্ট্রপতির বা সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত না হন, তাহা হইলে অনুরূপ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না;

(গ) জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করিবার বা অনুরূপ দলের সদস্য হইবার কিংবা অন্যভাবে অনুরূপ দলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

৬) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোনো আদেশ পরবর্তী কোনো আদেশ দ্বারা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।"

আওয়ামী লীগের অসহিষ্ণু, অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন, গণতান্ত্রিক মুখোশের অন্তরালে এ দলটি অদ্যাবধি একটি ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মন-মানসিকতায় তারা এখনো চতুর্থ সংশোধনীতে বর্ণিত সেই তথাকথিত 'জাতীয় দল'। অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সামান্য বাম ঘেঁষা মধ্যপন্থী দলরূপে পরিগণিত হতো। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেশকে সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট-ভারত বলয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে অনেকটা বাধ্য

www.pathagar.com

হয়েই ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ তাদের মূলনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পর পর নীতির এ পরিবর্তন আওয়ামী লীগকে জনগণের কাছে একটি অস্থির রাজনৈতিক দলরূপে পরিচিতি দিয়েছে এবং তাদের দলীয় কর্মী-সমর্থকরা সঙ্গত কারণেই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর দেশের ক্ষয়িষ্ণু বামপন্থীদের একটি উলে-খযোগ্য অংশ আওয়ামী লীগের সংগে গাঁটছড়া বাঁধে। এদের অন্যতম মিত্র জাসদ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের চরম বিরোধিতা করেছে। এমনকি এক পর্যায়ে গণবাহিনী গঠন করে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথও গ্রহণ করেছিল। কথিত আছে, সেই গণবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমানে আওয়ামী লীগের পরম মিত্র হাসানুল হক ইনুরা। জাসদ, রক্ষীবাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। জাসদ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আজ ইনু সাহেবের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী ও লালবাহিনীর দ্বন্দ্বের সেই তিক্ত ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে পরম মিত্রে পরিণত হয়েছেন। এদের হঠকারি রাজনীতির কারণে যে হাজার হাজার তরুণ সে সময়ে নিহত হয়েছিল, তারা এখন ইতিহাসের ফুটনোট মাত্র। এ বামপন্থীদের ঘোষিত নীতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং তার সঙ্গে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন এবং মৌলবাদ বিরোধিতা যা আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। শেখ হাসিনার আর এক মিত্র একদা কঠিনতম শত্রু গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কামাল হোসেনকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে তাকে বিব্রত করার জন্য তার বাসভবনের সামনে রাতারাতি বস্তি বসানো হয়েছিল। সে সময়ে তার সম্পর্কে শেখ হাসিনার অনেক অবমাননাকর উক্তির মধ্যে 'কাকের কা-কা' বিষয়ক উক্তি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ড. হোসেন নীতিকথা আওড়াতে পছন্দ করেন, সুবিধামতো সংবিধানের অপব্যাখ্যা দেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকেন এবং দেশের সব দুর্যোগ মুহূর্তে বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কালো টাকার বিরুদ্ধে কথা বললেও তার ব্যক্তিগত আয়করের হিসাব নিলে সহজেই প্রমাণিত হবে, তিনি একজন বড়মাপের আয়কর খেলাপি। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ড. কামাল হোসেন একজন একনিষ্ঠ মার্কিনপন্থী রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত এবং তার আইন ব্যবসায়ের সুবাদে সর্বদাই বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানিগুলোর স্বার্থরক্ষা করেছেন। জনশ্রুতি রয়েছে, তার কন্যার বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে আমেরিকান ইহুদি লবির কাছেও তার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এহেন সভাপতির দল গণফোরামের বড়(!) মাপের অনেক নেতাই আবার বাম ঘরানা থেকে এসেছেন। কি আশ্চর্য!

ড. কামাল হোসেন একদা প্রচন্ড এরশাদবিরোধী ছিলেন। যদিও এখন তিনি এরশাদের সপক্ষে বিভিন্ন ওকালতি যুক্তি দিচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে অতিপ্রিয় এ রাজনীতিবিদ জনগণ কর্তৃক সব সময়ই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, ড. কামাল হোসেনসহ গণফোরামে এমন কোনো নেতা নেই যিনি তার নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারবেন। এহেন জগাখিচুড়ি মার্কা দলও আজ মহাজোটের অন্যতম শক্তি।

www.pathagar.com

বিএনপি মনোনীত সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সাবেক সদস্য অলি আহমদের যৌথ নেতৃত্বাধীন বিএনপির দলছুট, আধা ও সিকি নেতাদের নিয়ে গঠিত নতুন দল এলডিপি আওয়ামী লীগের আরেক মিত্র। এ দলটি একটিমাত্র নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হচ্ছে, যেকোনো মূল্যে তাদের আদি সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিসাধন করা। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' – এ বহুল প্রচারিত কৌশলের কারণেই একদা 'সাবাশ বাংলাদেশ'-এর উপস্থাপক আজ শেখ হাসিনার পরম আজ্ঞাবাহী মিত্র। এ দল সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি শব্দ ক্ষয় করে নিবন্ধের স্থানের অপচয় করা নিরর্থক।

জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগ নবরূপে পুরনো মিত্ররূপে অভিহিত করলে পাঠকবর্গ সম্ভবত খুব একটা আপত্তি করবেন না। ১৯৮২ সালে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে সরকার গঠন করলে তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদকে শেখ হাসিনা স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের সাজানো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদান করেছিল আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ সালে জেল থেকে জেনারেল এরশাদ শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনে সমর্থন দিয়ে ১৯৮৬ সালের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। কাজেই সাবেক স্বৈরশাসকের আওয়ামী বলয়ে প্রত্যাবর্তনে বিস্মিত হওয়ার মতো ব্যক্তি খুব বেশি না পাওয়ারই কথা। বরং মাঝখানে বিএনপির সাথে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এরশাদের আপাত পূর্বরাগ একটি সুনিপুণ প্রতারণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এরশাদকে তথাকথিত মহাজোটে গ্রহণ এবং তাকে পল্টনের জনসভায় মহাতারকার সম্মান প্রদর্শনের সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী এলডিপি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (ইনু) ও গণফোরাম নেতাদের অসহায় আত্মসমর্পণ করুণার উদ্রেক করেছে। এদের রাজনীতি এতটাই দেউলিয়া হয়েছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অঙ্গনের ভাঁড়ে পরিণত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ দেশবাসীকে সর্বশেষ চমক উপহার দিয়েছে রীতিমত চুক্তি করে 'মহা মৌলবাদী,' ক্ষুদ্র ধর্মভিত্তিক দল খেলাফত মজলিসের ততোধিক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে জোটভুক্ত করে। এর আগে থেকেই অবশ্য ইসলামপন্থীদের দলে ভেড়ানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নানাভাবে সচেষ্ট ছিল। নামসর্বস্ব ইসলামি দলগুলো যেমন জাকের পার্টি, তরিকত ফেডারেশন, চরমোনাই ইত্যাদির সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্রমূলক সখ্য চলছে বিগত কয়েক বছর ধরে। কিন্তু চুক্তি করে ফতোয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার উদ্যোগ আওয়ামী লীগের মরিয়া অবস্থানকেই প্রমাণ করেছে। রাজনীতির চরিত্রের এ সর্বশেষ পরিবর্তনে সবচেয়ে বিব্রত হয়েছে আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থক বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মীরা। এ চুক্তি থেকে তাদের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরানোর অক্ষম অথচ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা টেলিভিশনের পর্দায় প্রত্যক্ষ করে দেশবাসী পরম কৌতুক অনুভব করেছে। তাদের অসহায় কাকুতি-মিনতি দেখে বাংলা কবিতার অতি পুরনো এবং বহুল ব্যবহৃত পংক্তি 'মেরেছো কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না' উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এখানেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আওয়ামী লীগ তাদের দীর্ঘদিনের ঘোষিত নীতি-আদর্শ পরিত্যাগ করে একটি বিচিত্র রঙধনু মোর্চা গঠন করতে এত মরিয়া হলো কেন? এ প্রশ্নের

www.pathagar.com

প্রথম জবাব হতে পারে যে, তারা ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের ভোট কৌশল অনুসরণ করছে নিজেদের ভোট ব্যাংক বাড়ানোর জন্য। এ কৌশল বাস্তবায়নে অবশ্য জনবিচ্ছিন্ন বাম দলগুলো এবং শায়খুল হাদিসের দলসহ নামসর্বস্ব ইসলামি দলগুলোর উপযোগিতা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, এ তথাকথিত মহাজোট গঠনের মাধ্যমে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন জোটকে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়া গেছে। অর্থাৎ তাদের বিবেচনায় ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারলে মহাজোটের নির্বাচনে বিজয়লাভ সম্ভব হবে। নীতি ও আদর্শহীন এই বিচিত্র রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করার উদ্দেশ্য শুধুই যদি হয়ে থাকে ক্ষমতায় আরোহণ করা, তাহলে সমলোচনার খুব একটা অবকাশ নেই। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোনো রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা। আর দীর্ঘ পাঁচটি বছর বিরোধী দলে থাকার পর আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মরিয়া হতেই পারে।

২৮ অক্টোবরের তান্ডব ও নৃশংসতা এবং মহাজোটের পরবর্তী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার পর এ জোটকে শুধু একটি নির্বাচনী মোর্চা হিসেবে বিবেচনা করার আর অবকাশ নেই। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি অকার্যকর মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী একটি দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে, এ বিষয়টি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষত জ্বালানির মালিকানা কব্জা করতে আগ্রহী দেশী-বিদেশী চক্রের কাছে সুখকর হয়নি। গত ১৫ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমছে এবং সে কারণেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগও কমা উচিত। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে অর্থাৎ জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সর্বমোট বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেছে মাত্র ১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে শুধু রফতানি খাতে আমরা আয় করেছি প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ রফতানির মাত্র ৪.৩০ শতাংশ। একটি গণতান্ত্রিক, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর দেশের ক্রমাগত স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা বর্তমান তথাকথিত 'নতুন বিশ্বব্যবস্থার' আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করেছে। দেশবাসীর কাছে ক্রমেই প্রতীয়মান হচ্ছে, এ অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মহাজোট নামক একটি বাংলাদেশ বিধ্বংসী শক্তি একজোট হয়েছে। এদেশে নিযুক্ত বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনীতিকদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতিউৎসাহ এবং অনেক ক্ষেত্রেই কূটনৈতিক শালীনতা ভঙ্গ করে উপদেশ বর্ষণ বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে তাদের ভূমিকা থাকার সন্দেহকে করেছে আরো ঘনীভূত। দু'টি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উলে-খ্য। পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন, বাংলাদেশে আহমদিয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুবার তাদের উদ্বেগ প্রকাশ এবং আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গত বিএনপি সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছে। অথচ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সংগে শায়খুল হাদিসের আহমদিয়া বিরোধী চুক্তির ব্যাপারে তারা

www.pathagar.com

পিনপতন নীরবতা পালন করছে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশই ঐতিহ্যগতভাবে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার সমর্থক। অত্যন্ত বিস্ময় নিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা অবলীলায় এখন আইনের শাসন এবং একটি সার্বভৌম দেশের সংবিধান বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন। বাংলাদেশে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানকারী সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদকে পাশে নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সরাসরি বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী বক্তব্য অনেককেই বিস্মিত করেছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে মহাজোটকে এখন আর শুধু একটি কৌশলগত নির্বাচনী মোর্চা হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। মহাজোট প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী শক্তির বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত ও পরিচালিত একটি মহাপ্রকল্প। ঐতিহাসিক ট্রয় নগরবাসীর মতো আমরাও যদি এ মহাজোটের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে এবং আমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বিভাজনের রাজনীতির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই দেশে অনৈক্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি সাহসী, কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক মানুষ এ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত অনুধাবন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে আক্রমণকারীরা অবশ্যই পরাভূত হবে। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালির লড়াকু চরিত্র সর্বদাই সাবেক পূর্ববঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশের বাঙালিরাই প্রদর্শন করতে পেরেছে।

১৭-০১-০৭

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার বিপদ সংকেত

সম্প্রতি অতি নৈরাশ্যবাদীরাও স্বীকার করতে শুরু করেছিলেন, নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবশেষে উন্নয়নের একটি ইতিবাচক ধারা শুরু হয়েছে। যে আওয়ামী লীগ সব সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণার জন্য বিখ্যাত, তারাও কিন্তু দাবি করে, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত অর্থাৎ তাদের শাসনামলে দেশে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। নৈরাশ্যবাদী বামপন্থীরাও এখন বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করেই অভিযোগ করেন, প্রবৃদ্ধি মোটামুটি বাড়লেও জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন না হওয়ার কারণে সাধারণ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। গত ১৬ বছরের মধ্যে ১০ বছরই সরকার পরিচালনাকারী দল বিএনপি সব সময়ই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে। কাজেই আমরা যদি গত ১৫ বছরের সরকার পরিচালনাকারী প্রধান দুটি দলের উন্নয়নের দাবি মেনে নেই, তাহলে ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশ যে দৃশ্যতই এগিয়েছে সেটা অস্বীকার করা অতি বড় নিন্দুকের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, জিডিপি, বিনিয়োগ, শিল্প, কৃষিসহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৪.৬০ শতাংশ। পরবর্তী পাঁচ বছরে এ হার বেড়ে ৫.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়। আর ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার আরো বেড়ে ৫.৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০০৬-০৭ বাংলাদেশের জন্য একটি অনিশ্চয়তার বছর হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং একশ্রেণীর দলগুলোর সভ্যতা বিবর্জিত, নৃশংস কর্মকাণ্ড দেশে জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। অব্যাহত হরতাল, অবরোধ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিরোধী কর্মসূচির কারণে বর্তমান অর্থবছরে ইতোমধ্যেই কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় আয় কমেছে। দেশের অনিশ্চিত অবস্থার কারণে বর্তমান অর্থবছরে দেশী এবং বিদেশী উভয় বিনিয়োগই কমে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে বিনিয়োগ বোর্ড। এতদসত্ত্বেও, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অতিসম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে আশা প্রকাশ করেছেন, রাজনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও জাতীয় প্রবৃদ্ধি বর্তমান অর্থবছরে ৭ শতাংশে পৌঁছতে পারে। রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাদের কর্মকান্ডে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কতটা বাড়ত, সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের আশাবাদ থেকে সহজেই অনুমেয়। যা হোক

www.pathagar.com

মোদ্দা কথা হলো, ১৯৯১-৯২ সালে যে প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের আশপাশে ছিল সেটি আজ বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং দেশবিরোধী নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও ৭ শতাংশ হয়েছে। ১৯৯১ সালে যে রফতানি এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৯০৪ এবং ৮৫০ মিলিয়ন ডলার, বর্তমান অর্থবছরে সে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ আশা করা হচ্ছে যথাক্রমে ১২ হাজার এবং ৫ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে রফতানি ও রেমিট্যান্স উভয় খাতে দেশের আয় ছয় গুণ বেড়েছে। এ অর্জনগুলো যেকোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য গর্বের বিষয় হলেও আমাদের দেশের একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞ, বিশেষ শ্রেণীর মিডিয়া বাংলাদেশকে সর্বদাই একটি খারাপ পণ্য হিসেবেই প্রচার করে গেছেন। বিদেশী প্রভুদের অর্থ এবং মদদপুষ্ট এ শ্রেণী বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করে বিদেশীদের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতাকে দুর্বল করার সব আয়োজনই যে প্রায় সম্পন্ন করে এনেছে, তা দেশবাসীর কাছে আজ সুস্পষ্ট।

এখানে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, আশির দশকে স্বৈরশাসকের প্রায় ধ্বংস করে দেয়া অর্থনৈতিক অবস্থা কোন পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কী কৌশল অবলম্বনের ফলে নব্বইয়ের দশকে পুনর্জীবন লাভ করল। প্রকৃতপক্ষে আশির দশক ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটি হারিয়ে যাওয়া দশক তথা 'লস্ট ডিকেইড'। স্বৈরতন্ত্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেই কেটে গেছে প্রায় ১০টি বছর। ১৯৯১ সালে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার গঠিত হওয়ার ফলে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয় কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে। বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় অনুন্নত দেশগুলোকে দেয়া বিশেষ বাজার সুবিধার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশ লাভ করে। আমাদের গ্রামের অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নারীরা এ শিল্পে তাদের একনিষ্ঠ শ্রমদানে এগিয়ে এলে পুঁজি, উদ্যোগ এবং শ্রমের একটি চমৎকার সমন্বয় সৃষ্টি হয়। এতে যুক্ত হয় তুলনামূলকভাবে একটি স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রণীত বিভিন্ন বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা। ফলে জাতীয় আয় বাড়তে শুরু করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় এবং দারিদ্র্যতার হার কমতে থাকে। বাজার অর্থনীতির গতি আরো বেগবান হয় যখন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তাদের দীর্ঘদিনের লালিত দলীয় অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করে। সরকার পরিবর্তন হলেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের শঙ্কামুক্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৯১-৯২ সালে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ১১ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১৮.৭০ শতাংশে উন্নীত হয়। একই সময়ে জিডিপির আকারও ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার স্থলে ৪ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকায় পরিণত হয়। এখন শংকা হচ্ছে বর্তমান অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতির এই ঊর্ধ্বগতি ধরে রাখা সম্ভব হবে কি না? আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, সংবিধান মান্য করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ অতি সীমিত। সংবিধানের ৫৮ঘ ধারায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে :

www.pathagar.com

"৫৮ঘ ধারা : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী। -(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।"

সংবিধানের উপরোল্লিখিত ধারা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং তারা শুধু সরকারের দৈনন্দিন কাজ করবেন এবং জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। এ ধারায় বিশেষভাবে যা প্রণিধানযোগ্য তা হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবেন না। উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর এবারের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর এ আড়াই মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৫ জন উপদেষ্টা ইতোমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বরত আছেন। এবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে চরিত্রটি দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, এ যাবৎ প্রায় সব উপদেষ্টাই সংবিধান নির্দেশিত নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজ নির্বাহ না করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানেই তাদের প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করেছেন। দীর্ঘ তিন মাসে অর্থনীতিবিষয়ক জাতীয় নির্বাহী কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত না হওয়া অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারের নির্লিপ্ততারই উদাহরণ। মন্ত্রণালয়গুলোর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ায় অর্থনীতির ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমেই শুল্ক আদায়ের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে শুল্ক আদায় হয়েছে ৭ হাজার ২২৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মাত্র ১ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২১ শতাংশ কম। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তার আগের বছরের তুলনায় শুল্ক আয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৪ শতাংশ এবং শুল্ক আদায় হয়েছিল ১৬ হাজার ১৭ কোটি টাকা। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান অর্থবছরে শুল্ক আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরের কথা, সম্ভবত গত বছরের সমপরিমাণ শুল্ক আদায়ও সম্ভব হবে না। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে শুধু শুল্ক খাতে দেড় হাজার কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। অর্থনীতির বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বছর শেষে এ ঘাটতি ৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ নেয়া বাড়বে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা ইতোমধ্যেই আশংকাজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ ৬ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা, যদিও বর্তমান অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী সরকারের সারা বছরে ঋণ নেয়ার কথা ছিল ৫ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও দেখা দিয়েছে শ্লথ গতি। এমন আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে, বর্তমান অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকতে পারে। অর্থনৈতিকবিষয়ক জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ বৈঠক হয়েছে ১৬ অক্টোবর ২০০৬। গত সরকারের অনুমোদিত ৪৬টি প্রকল্পের প্রজ্ঞাপন অদ্যাবধি জারি করা হয়নি। জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সভা না হওয়ার কারণে নতুন ৩০টি প্রকল্প সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। বৈদেশিক প্রকল্প ঋণ ও সাহায্যের অর্থপ্রবাহের পরিমাণও এ বছর অত্যন্ত অপ্রতুল। সব মিলিয়ে ধারণা করা যেতে পারে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপির শতকরা হিসাবে সরকারি বিনিয়োগ আশংকাজনকভাবে কমে গত দশ বছরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সৃষ্টি করার জন্য সরকারের একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়ন করা। পরিবর্তিত কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্যের সংগে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তিন বছর মেয়াদি নতুন আমদানি নীতির কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল গত বছরের ১ জুলাই থেকে। কিন্তু অর্থবছরের প্রায় ৭ মাস পেরিয়ে গেলেও নতুন আমদানি নীতি ঘোষণার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আদৌ এই নীতিটি ঘোষণা করা হবে কি না তা নিয়েও এখন সংশয় দেখা দিয়েছে।

সরকারি খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণ করতে পারে বেসরকারি বিনিয়োগ। গত পাঁচ বছরে দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জিডিপির শতকরা হিসাবে বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রায় ৩ শতাংশ বেড়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ। এখানে আরো উল্লেখ্য, একই সময়ে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রায় ১ শতাংশ কমেছে। বর্তমান অর্থবছরের সমস্যা হলো, প্রথমে গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিরতা, তারপর রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সম্প্রতি সরকারের ধরন নিয়ে অনিশ্চয়তা, এ ত্রিবিধ কারণ বিনিয়োগকারীদের 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। বর্তমান অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার আশংকা বিনিয়োগ বোর্ড ইতোমধ্যেই ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্প খাতে বিনিয়োগের জন্য অতিআবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বেশ কিছুদিন দেশ গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার পর অতি সম্প্রতি গ্যাস সংকট আবার বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। অক্টোবর থেকে জরুরি অবস্থা জারি পর্যন্ত অবরোধ, হরতাল ইত্যাদির কারণে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র সময়মতো উৎপাদনে যেতে না পারাই গ্যাস সংকটের কারণ বলে পেট্রোবাংলা থেকে দাবি করা হয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্রটির গত নভেম্বরে উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও এখন বলা হচ্ছে মার্চ ২০০৭ সালের আগে উৎপাদন শুরু করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ সমস্যার সংগে এখন আবার গ্যাস সমস্যা যুক্ত হলে তা বেসরকারি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

এ অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। অনেকে বিতর্ক তুলতে পারেন, এ আশংকা অমূলক। কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের উচ্চ

www.pathagar.com

প্রবৃদ্ধি ৬.৭০ অতিক্রম করতে পারে। তাদের বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ বছরের প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে গত বছরের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ মাত্র। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, দ্রব্যমূল্য ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা নিয়ে জোট সরকারের সমালোচনা থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় তারা প্রশংসনীয় সাফল্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল। পদার্থবিদ্যার গতি জড়তার 'ইনার্শিয়া অব মোশন' তত্ত্ব অর্থনীতিতেও সাধারণত সমানভাবে কার্যকর থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আগের বছরে যদি দেশে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে চাঙ্গাভাব থাকে তাহলে পরের বছর শিল্পপ্রবৃদ্ধি বেড়ে যায়। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির পর প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে শিল্পে মূল্য সংযোজিত হতে শিল্পের প্রকারভেদে ১২ থেকে ২৪ মাস প্রয়োজন হয়। কাজেই বর্তমান অর্থবছরের স্থবিরতা অব্যাহত থাকলে আমাদের উন্নয়ন অন্ততপক্ষে আগামী দুই বছর ধরে বাধাগ্রস্ত হবে। প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার কমলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই কর্মসংস্থান কমে যাবে এবং দরিদ্রতা বাড়বে। গত কয়েক বছরের বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচক আমাদের আশান্বিত করতে শুরু করেছিল, বাংলাদেশ সহস্রাব্দের সব লক্ষ্য অর্জনেই সমর্থ হবে। সে আশাবাদ অব্যাহত থাকবে কি না, তা এখন নির্ভর করবে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা এবং কর্মকান্ডের ওপর।

বাস্তবতা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আইনসিদ্ধ হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এ নিশ্চয়তা বোধহয় কেউ দিতে চাইবেন না যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন প্রক্রিয়া, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল প্রজ্ঞাপন এবং সে বাতিল করা নির্বাচনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৭ জন সংসদ সদস্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করার অভিযোগ ভবিষ্যতে উত্থাপিত হবে না। কোনো কোনো বিদেশী কূটনীতিকের মতো আমরাও যদি আমাদের রাষ্ট্রের সব আইনের ভিত্তি সংবিধানকে একটি অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে তুচ্ছজ্ঞান করতে চাই, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। আমাদের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ 'জনগণের জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য জনগণ নয়'–এ জাতীয় সস্তা এবং সুবিধাবাদী বক্তব্যের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল দুর্বল করেছেন। সংবিধান নির্দেশিত ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সময়সীমা ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা এখন যে মহৎ পরিকল্পনা সম্পন্ন করে জাতীয় নির্বাচন দেয়ার কথা বলছেন, তাতে আরো কত ৯০ দিন অতিক্রান্ত হবে তা ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে। যে রাজনীতিবিদরা এতদিন ৯০ দিনের বাধ্যবাধকতা নিয়ে পরিহাস করেছেন, তারাই এখন আবার ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ থেকে নতুন করে ৯০ দিনের হিসাব কষছেন। এদের কে বোঝাবে, বোতলের দৈত্যকে একবার মুক্তি দেয়া হলে আবার সে দৈত্য বোতলে ঢুকবে কি না সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তার সদিচ্ছার ওপর, রাজনীতিবিদদের আবদারে নয়।

তবে দেশের ভালো চাইলে, অর্থনীতির উন্নয়ন চাইলে, যত তাড়াতাড়ি জনগণের নির্বাচিত একটি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় ততই মঙ্গল। স্বদেশের

www.pathagar.com

জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের চেয়ে উত্তম এবং বৈধ কোনো সরকারব্যবস্থা এ যাবৎ আবিষ্কার হয়নি। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে কোনো ষড়যন্ত্র ছাড়াই আমরা দ্রুততার সঙ্গে সর্বনাশের দিকে ধাবিত হব। আশির দশকের এক পতিত, দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরশাসককে সব দল মিলে মহা তারকারূপে পুনর্বাসিত করে সেই অগস্ত্যযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটা আমরা বোধহয় নিয়েই ফেলেছি। তদুপরি বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ পশ্চিমা দূতাবাসগুলো সম্প্রতি যেভাবে আশির দশকে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানকারী ব্যক্তিকে নিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছে তা নতুন কোনো ইঙ্গিত বহন করে কি না সেটাই বিচার্য। বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরণে রাজনৈতিক বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় না করে উপদেষ্টারা তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় অধিকতর মনোযোগী হবেন, জাতি এটিই প্রত্যাশা করে। সংবিধান প্রণেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংগত কারণেই একটি স্বল্পকালীন সরকার হিসেবে বিবেচনা করে এর আকার ১১ জনে সীমিত করেছিলেন। মন্ত্রণালয়ের বিভাগ চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে বিনয়ের সংগে বলতে চাই, ১১ জন অতি জিনিয়াসের পক্ষেও এতগুলো মন্ত্রণালয় দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালনা করা অসম্ভব। কাজেই বর্তমান সরকারের মেয়াদ সম্পর্কে সব বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণার মাধ্যমে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাতে পারলে অর্থনীতির থেমে যাওয়া চাকা পুনর্বার সচল হওয়ার আশা আমরা সবাই করতে পারি।

২৭-০১-০৭

www.pathagar.com

কেমন ছিল চারদলীয় জোট সরকারের প্রশাসন?

ছোটগল্পের নায়িকা কাদম্বিনীকে 'মরিয়া' প্রমাণ করতে হয়েছিল, সে আগে মরে নাই। চারদলীয় জোট সরকারকেও ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে, তাদের সরকার প্রশাসনকে দলীয়করণ তো করেইনি বরং তারা প্রশাসনে বহুলাংশে মেধা, দক্ষতা ও সততাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছরব্যাপী সরকার পরিচালনায় মহাজোটভুক্ত দলগুলো প্রশংসা করার মতো একটি বিষয়ও যে খুঁজে পায়নি তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের বিষয়ে সাফল্য সীমিত হলেও একটি দিকে মহাজোট ভাগ্যের বরপুত্র। আর তাহলো মহাজোট বিশেষত আওয়ামী লীগের সব বিষয়ে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মিডিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থন। বশংবদ মিডিয়ার সহায়তায় মহাজোটের একটি সফল প্রচারণা ছিল, গত জোট সরকার দুর্নীতিতে সহায়তার জন্য প্রশাসনে সব অযোগ্য, অসৎ ও দলীয় ব্যক্তিদের বসিয়েছিল। নির্বাচনে অংশ নেয়ার বহুবিধ শর্তের মধ্যে মহাজোটের একটি শর্ত ছিল, প্রশাসনকে নির্দলীয় করার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে। চারদলীয় জোট এ প্রচারণার কোনো বলিষ্ঠ জবাব পেশাদারিত্ব বা বিশ্বাসযোগ্যভাবে জনগণের সামনে কোনোদিনই তুলে ধরেনি কিংবা ধরার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিএনপি দল হিসেবে আধুনিকমনস্ক হলেও এবং তাদের নেতারা নিজেদের সজ্জিত করার জন্য সর্বদা দামি ও বিদেশী পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হলেও, দলের প্রচারের বিষয়ে সর্বদাই উদাসীন থেকেছেন। তাদের বক্তব্য ছিল, জনগণ পাশে থাকলে মিডিয়া এবং প্রচারণার একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই। আজ দেশের রাজনীতির অবস্থা ও তাদের দলের নেহাতই বেহাল অবস্থা দেখে তারা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে, মিডিয়ার অব্যাহত প্রচারণা এবং বিদেশী কূটনীতিকদের বিরামহীন তৎপরতার সামনে তৃতীয় বিশ্বের যেকোনো দেশের জনগণ কতটা অসহায়। জনগণের শক্তির বিচার হবে তো ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। বর্তমানের বাস্তবতায় দুটোর একটিরও যখন কোনো সম্ভাবনা নেই তখন প্রচারণার শক্তিই যে আসল শক্তি, এ সরল সত্যটি সেসব নেতা আজো যদি উপলব্ধি না করে থাকেন, তাহলে রাজনীতি থেকে তাদের বোধ হয় অবসর নেয়ার সময় এসেছে।

আমাদের দেশের মিডিয়ার স্টাইলটি সচরাচর আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচক। মিডিয়ার নেতিবাচক চরিত্র নিয়ে প্রফেসর ড. ইউনূস বহুবার আক্ষেপ করেছেন এবং তাদের চরিত্র বদল করার পরামর্শও দিয়েছেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি, তবে অন্তত একবারের জন্য হলেও মিডিয়াকে বেশ কড়া সমালোচনা হজম করতে হয়েছে। কারণ, যিনি সমালোচনা করেছেন তিনি তো আর আমাদের মতো আমজনতা নন।

www.pathagar.com

মিডিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করলে বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির যে কী পরিণতি হতে পারে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ। মিডিয়া রীতিমতো চক্রব্যূহ তৈরি করে পৌরাণিক কাহিনী মহাভারতের অসহায় অভিমন্যুর মতো বধ করেছে তাকে এবং তার পরিবারকে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাদের মিডিয়ার চিরচেনা রূপ এখন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। টেলিভিশনের পর্দায় স্পিকার হাতে ডজন ডজন ক্ষুদে বাংলাদেশী ল্যারি কিং, ডেভিড ফ্রস্ট, টিম সেবাস্তিয়ানদের এখন কী ভদ্র আর বিনয়ী মূর্তি। কোথায় গেল সেসব চোখা চোখা প্রশ্নবাণগুলো বরং প্রশ্নকর্তাদের চোখে-মুখে এখন সর্বদাই একটা বিগলিত, জ্ঞানমুগ্ধতার আবেশ। পত্রিকার পাতায় পাতায় প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ জন উপদেষ্টার বাণী, বক্তৃতা, বক্তব্যের প্রশংসার বন্যা। স্বঘোষিত বাংলাদেশের বিবেক বলে খ্যাত একজন সম্পাদক তো প্রকাশ্যে দাবিই করে ফেলেছেন, তাদের লেখালেখির কারণেই নাকি বর্তমান জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এ দাবিটি কি সঠিক নাকি অতি অহংকারী ভদ্রলোকটি তার ক্ষমতা জাহির করার জন্য এ দম্ভোক্তি করেছেন তা আমাদের অজানা।

যা হোক, আসল কথা হচ্ছে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সৎ, দক্ষ, নির্দলীয় সরকার হিসেবে ইতোমধ্যেই মহাজোট এবং সংবাদ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এটি হরতাল, অবরোধে বিপর্যস্ত দেশবাসীর জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের খবর। এবার এ ১১ জন মহৎ ব্যক্তির অতীত, তাদের কর্মজীবন, গত জোট সরকারের আমলে তারা সরকারি কোনো দায়িত্বে ছিলেন কি না – এ তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করা যাক। প্রধান উপদেষ্টাকে দিয়েই শুরু করি। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ অত্যন্ত মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ষাটের দশকে শিক্ষকতা দিয়ে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সূত্রে ওপরের দিকে স্থান দখল করেন এবং সিএসপি হিসেবে পাকিস্তান সরকারের চাকরি নেন। সে সময় তার সহপাঠী এবং পরবর্তী সময়ে সহকর্মী ছিলেন আরেক সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বিশ্বব্যাংকের চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং ২০০১ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। ২০০১-এর নির্বাচনে জয়লাভের পর তদানীন্তন বিএনপি সরকার ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে নিযুক্তি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং বিএনপি সরকারের সামষ্টিক অর্থনীতির সাফল্যের তিনিও একজন অন্যতম রূপকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ড. ফখরুদ্দীনকে চাকরিতে পুনঃনিয়োগ দেয়ার জন্য তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মন্ত্রিপরিষদের সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সরকার তখন বিচারপতিদের অবসরের বয়স বাড়ানো নিয়ে বিব্রত থাকায় নতুন করে আবার গভর্নরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়িয়ে নতুন বির্তক সৃষ্টি করতে চায়নি। ফলে ড. ফখরুদ্দীনকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে অবসর নিতে হয়। তবে চারদলীয় জোট সরকার ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সেবা থেকে একেবারে বঞ্চিত না হয়ে তাকে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের শীর্ষ নির্বাহী পদে নিযুক্ত করে এবং প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওই পদে

www.pathagar.com

আসীন ছিলেন। এ কথা বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না, আজকের প্রজন্মের কাছে একজন সফল ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল চারদলীয় জোট সরকারই।

প্রধান উপদেষ্টার স্ত্রীর সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। গত চারদলীয় জোট সরকারের পুরো সময়জুড়েই ড. চৌধুরী জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে যাদেরই ধারণা আছে তারাই অবগত আছেন, জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি পদটিকে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সব চেয়ে লোভনীয় পদ বা প্রাইজ পোস্টিং হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ড. চৌধুরীকে বিএনপি সরকার তিন তিনবার চাকরিতে এক্সটেনশন দিয়েছিল এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়া পর্যন্ত তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়নি। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, ড. চৌধুরী নিঃসন্দেহে একজন উচ্চশিক্ষিত ও চৌকস কূটনীতিক হিসেবে বিদেশীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত।

আনোয়ারুল ইকবাল বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া উপদেষ্টা। আনোয়ারুল ইকবাল প্রশাসনে বহুল আলোচিত '৭৩ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। বিএনপি সরকার যে রাজনৈতিক কারণে '৭৩ ব্যাচের প্রতি সব সময়ই কিছুটা শীতল ব্যবহার করেছে এ বিষয়টি প্রশাসনের সবাই অবগত আছেন। '৭৩ ব্যাচের কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও জোট সরকার আনোয়ারুল ইকবালকে র‍্যাবের মহাপরিচালক, পুলিশের সর্বোচ্চ পদ মহাপরিদর্শক ইত্যাদি উচ্চতম পদে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ দিয়েছে তার কর্মনিষ্ঠা ও সততার স্বীকৃতিস্বরূপ। 'ক্রসফায়ার' নিয়ে বির্তক থাকলেও র‍্যাব আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে গত সরকারের একটি অত্যন্ত সফল এবং জনপ্রিয় প্রকল্প। র‍্যাব গঠন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সর্বদাই আপত্তি ছিল এবং শেখ হাসিনা দাবি করতেন, র‍্যাব গঠন করাই হয়েছিল তদানীন্তন বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। এ রকম একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে আনোয়ারুল ইকবালকে নিয়োগদান জোট সরকারের যে একটি বিচক্ষণ ও অরাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল তা আনোয়ারুল ইকবালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে নিযুক্তি লাভের মাধ্যমে পুনর্বার প্রমাণ হয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ ঢাকার রাস্তায় পৈশাচিক সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার দিনও আনোয়ারুল ইকবাল বাংলাদেশ পুলিশের আইজি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

উপদেষ্টা আইউব কাদরী একজন সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। গত জোট সরকারের আমলে তিনি সরকারের সচিব হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। বিশেষত কৃষি মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে কর্মকালীন তার সঙ্গে তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর একটি চমৎকার কার্যকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মতিউর রহমান নিজামীর কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে দফতর পরিবর্তন করা হলে তার সম্মানে দেয়া বিদায় সংবর্ধনায় কাদরী মতিউর রহমান নিজামীকে তার দীর্ঘ সরকারি কর্মজীবনে দেখা একজন সেরা মন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মতিউর রহমান নিজামী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর কাদরীও কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে

www.pathagar.com

বদলি হন। আইউব কাদরীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তদানীন্তন জোট সরকার তাকে চাকরিতে একাধিকবার এক্সটেনশন দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম তার কর্মজীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে ১৯৬২ সালে শুরু করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সংগে একই বছরে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৮২ সালে এসক্যাপে যোগ দেয়া পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তাকে ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করে। ড. ইসলামের ৬৫ বছর বয়সে অবসরে যাওয়ার প্রাক্কালে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বিশেষভাবে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন ও ড. ইসলামকে চাকরিতে রাখার জন্য সরকারি চাকরিতে বয়সের সর্বোচ্চ সীমা শিথিলের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদের সভায় পেশ করা হলেও বিভিন্ন জটিলতার আশংকায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন সরকার ড. ইসলামকে সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়। বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা জোট সরকারের আমলে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি উপভোগ করেছেন।

বর্তমান যোগাযোগ উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল অবঃ আবদুল মতিনের একজন দক্ষ, সৎ ও কঠোর সেনা কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি রয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন প্রথম বিএনপি সরকারের সময় তিনি ডিজিডিএফআই'র দায়িত্ব পালন করেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার তাকে ১৯৯৭ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসরে পাঠায়। বেগম খালেদা জিয়া ২০০১ সালে আবার ক্ষমতায় ফিরে এলে জেনারেল অবঃ মতিনকে দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেন এবং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হওয়া পর্যন্ত তিন বছরেরও অধিক সময় তিনি তার ওই পদে আসীন ছিলেন। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন হওয়ার পরও স্বল্প সময়ের জন্য তিনি ওই কমিশনের সচিব হিসেবেও প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনে জনশ্রুতি রয়েছে, তদানীন্তন মুখ্য সচিব ড. কামালউদ্দিন সিদ্দিকির সংগে তার অত্যন্ত বৈরী সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অত্যন্ত আস্থাভাজন হওয়ার কারণেই মেজর জেনারেল অবঃ মতিন তার ওপর চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। কৃষি উপদেষ্টা ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবঃ মতিউর রহমান বিগত সরকারের সময় যথাক্রমে অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন এবং জাতীয় এইডস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আজকের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ জন সদস্যের মধ্যে সাতজনই বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নীতিনির্ধারক পদে সরাসরি কর্মরত ছিলেন এবং একজন তৎকালীন সরকারকে উপদেষ্টামূলক সহায়তা প্রদান করেছেন। সবাই সম্ভবত একমত হবেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, দুর্নীতি দমন বিভাগের মহাপরিচালক, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি, পুলিশের আইজি, সরকারের

www.pathagar.com

সচিব, অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান– এ জাতীয় পদগুলো একটি রাষ্ট্র এবং সরকারের স্তম্ভস্বরূপ। এসব পদ যারা অলংকৃত করেন তাদের মাধ্যমেই একটি সরকারের প্রকৃত চরিত্র সাধারণ জনগণের কাছে ফুটে ওঠে।

এসব পদায়নে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সত্যিই যে সংকীর্ণ দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে মেধা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিল তা সর্বমহল কর্তৃক বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে। এটি অত্যন্ত আশার কথা যে জনগণ, কূটনৈতিক মহল, সুশীল সমাজ ও সংবাদ মাধ্যমগুলো এক বাক্যে বর্তমান সরকারের মেধা, দক্ষতা, সততাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সরকারের নির্দলীয় আচরণের জন্য সাধুবাদ দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দলগুলো এবং বিশেষ শ্রেণীর সংবাদপত্র কর্তৃক চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণের ঢালাও অভিযোগ যে একটি নির্জলা মিথ্যা প্রচারণা ছিল – এ সত্যটি স্বীকার করে নেয়ার সৎসাহস সংশ্লিষ্টদের এবার প্রদর্শন করা উচিত। না হলে তাদের গ্রহণযোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাবে। প্রশাসনের উচ্চপদগুলোতে জোট সরকারের বাছাই প্রক্রিয়া উত্তম না হলে সাবেক সে সরকারের আটজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আজকের তত্ত্বাবধায়ক সরকার উৎকৃষ্ট সরকার হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হতো না, এটিই বাস্তবতা। জোট সরকারের প্রশাসন যদি এতই মন্দ হবে তবে সে প্রশাসন থেকেই এতজন উচ্চশিক্ষিত, সৎ ও দক্ষ প্রশাসক কেমন করে পাওয়া গেল – এ সহজ প্রশ্নটি কোনো সরল নাগরিক করলে তিনি কি শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করে ফেলবেন?

নাসিরউদ্দিন হোজ্জার একটি বহুল প্রচলিত গল্প দিয়ে এ নিবন্ধ শেষ করব। বোদ্ধা পাঠক, এ গল্পের মধ্যে এ নিবন্ধে যে বির্তক সৃষ্টি করা হয়েছে তার একটি জবাব খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন। হোজ্জা এক দিন বাজার থেকে এক সের গরুর গোশত কিনে এনে স্ত্রীকে পোলাওসহ রান্নার কথা বলে ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত করার জন্য বেরিয়ে গেলেন। নাসিরউদ্দিন হোজ্জার কথা মতো তার স্ত্রী রান্না করতে বসলেন। রান্না এতই উৎকৃষ্ট হলো এবং তার সুগন্ধ এতই লোভনীয় ছিল যে, হোজ্জার স্ত্রী লোভ সামলাতে না পেরে হাঁড়ি থেকে ব্যঞ্জনের স্বাদ নেয়ার জন্য একটি-দুটি গোশতের টুকরা খেতে শুরু করলেন। গোল বাধল তখনই যখন নাসিরউদ্দিন হোজ্জার স্ত্রী দেখলেন, হাঁড়িতে আর একটি গোশতের টুকরাও অবশিষ্ট নেই, শুধু ঝোল পড়ে আছে। নাসিরউদ্দিন হোজ্জা দুপুরের খাবারের জন্য বাড়িতে ফেরার পর তার স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করে জানালেন, বাড়ির অতি দুষ্টু বিড়ালটি সব গোশত খেয়ে ফেলেছে। হোজ্জা কোনো কথা না বলে বিড়ালটিকে ধরে এনে তার ওজন করতে বসলেন এবং দেখা গেল বিড়ালটির ওজনও ঠিক এক সের। তারপর নাসিরউদ্দিন হোজ্জা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সে অবিস্মরণীয় প্রশ্নটি ছুড়লেন, 'বেগম, এ বস্তুটি বিড়াল হলে, গোশত কোথায়? আর এটি গোশত হলে, বিড়াল কোথায়?'

০৩.০২.০৭

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশে সুশীল সমাজের উত্থান সাম্প্রতিক হলেও বর্তমানে এ শ্রেণী প্রায় সমান্তরাল সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বছর দশেক ধরে তাদের কর্মকাণ্ড আমজনতার কাছে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃত অর্থে তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে ২০০১ সালের শেষ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর থেকে। এ সময়ে তাদের পেশিশক্তি অথবা মেধাশক্তির সাফল্যজনক প্রদর্শন সম্ভব হয়েছে রাজনীতিবিদ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে দুর্নীতি বৃদ্ধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার একচ্ছত্র আনুকূল্য লাভের দ্বিবিধ কারণে। যেকোনো বোদ্ধা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, একটি বিশেষ পত্রিকাগোষ্ঠী কতটা পেশাদারিত্বের সংগে আমাদের সুশীল সমাজকে বাংলাদেশের দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তুত একটি বিকল্প শাসকশ্রেণীরূপে অবিরামভাবে প্রচার করছে। এ প্রচারণার আরো একটি কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রদানের নামে প্রকৃতপক্ষে মাত্র কয়েকজন মুখচেনা, বিশেষ ব্যক্তিকে নরদেবতার (demigod) স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। একই সময়ে কাকতালীয়ভাবে সরকারি আনুকূল্যে দেশে আমরা ব্যাঙের ছাতার মতো ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার প্রসার প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্রায়তনের একটি দেশে এতগুলো চ্যানেল খবরের ও মতামতের সন্ধানে এসব দেবতার কাছে অহর্নিশ ছুটছেন প্রায় প্রতিটি বিষয়ে। গত সরকারের প্রিয়ভাজন হওয়ার সুবাদে প্রাপ্ত লাইসেন্সে এবং দুষ্ট লোকের দাবি অনুযায়ী দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত পুঁজিকে জায়েজ করার জন্য এসব চ্যানেলের মালিক 'পোপের চেয়েও বড় ক্যাথলিক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের কৌশল হচ্ছে, সুশীল সমাজকে তোষামোদ করলে হয়তো ভবিষ্যতের সরকার তাদের প্রতি বৈরী আচরণের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল আচরণ করবে। মিডিয়ার এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অবিমৃষ্যকারী ও খেলো আচরণের ফলে আমার মতো কম জ্ঞানসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে মনে হয়েছে, এ নব্য অতি অভিজাত শ্রেণী যাবতীয় স্বচ্ছতা ও সর্বজ্ঞানের আধার এবং দেশের তাবৎ সমস্যার সমাধান তাদের নখদর্পণে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নিদারুণ ব্যর্থতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব সুশীল সমাজের বিচরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। দেশে দেশে এ ধরণের পরিস্থিতিতেই বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরাশক্তিরা তাদের জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সুশীল সমাজ তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের স্বার্থে সুশীল সমাজের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা সকল নাগরিকের জন্যই অতীব জরুরি।

সুশীল সমাজের তাত্ত্বিক উৎপত্তি হয়েছিল জার্মান দার্শনিক হেগেলের রাষ্ট্র ও সমাজকে বিভাজন করার মাধ্যমে। হেগেল এ বিভাজনের কাজটি করেছেন তার রচিত বিখ্যাত

www.pathagar.com

'Elements of the Philosophy of Right' নামক গ্রন্থে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা আর এক কালজয়ী জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের 'বুর্জোয়া' সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে হেগেলের এ দর্শন। বাম চিন্তা-চেতনার দার্শনিকরা বুর্জোয়া সমাজকে তার শ্রেণী চরিত্রের জন্য সঙ্গত কারণেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলেও, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী দার্শনিকরা সুশীল সমাজকে সর্বদাই ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছেন। তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজব্যবস্থার যাবতীয় অরাষ্ট্রীয় (non-state) কার্যক্রমই সুশীল সমাজের 'জমিদারি' (domain)। সুশীল সমাজের সংজ্ঞা, কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য নিয়ে ইত্যাকার দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপী অদ্যাবধি বর্তমান। এখন বুঝতে হবে যে, আন্তর্জাতিক অংগনে সুশীল সমাজকে কারা, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং করছে। এ বিষয়ে এবার একটু ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পর্যন্ত, মোটামুটি এ আট দশক পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র – প্রধানত এ দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে অবশ্য যুগোস্লাভিয়ার টিটো, ভারতের নেহেরু, মিসরের নাসের ও ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো – এদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা নমনীয় অথচ পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়, এমন রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement) নামে একটি তৃতীয় শক্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। জন্ম থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল এ তৃতীয় শক্তি পরিবর্তিত এককেন্দ্রিক (uni-polar) বিশ্বে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিকতার কারণেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যা হোক, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের এ দ্বৈরথে এ যাবৎ সুশীল সমাজ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক বেশ ভালোভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বে শীতল যুদ্ধ (cold war) চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র যে সাফল্যের সঙ্গে সুশীল সমাজকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পেরেছে, তার জন্য সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বের দুর্বলতাও কম দায়ী নয়। এ ব্যাপারে দুটো উদাহরণ এখানে পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। বুর্জোয়া সমাজের প্রতি মার্কসীয় তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাসের ফসলই হচ্ছে স্ট্যালিনের গুলাগ ও মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এ দুই ব্যবস্থাতেই সরাসরি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহুরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু', এই পুরনো তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সুশীল সমাজ আলিঙ্গন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অবশেষে পরাজিত হয়েছে। চীনের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কতজন তাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করবেন এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

চিলি, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া, কিউবা, ইরান, ইরাক, ভেনিজুয়েলা, আফগানিস্তান সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করেছে। এসব দেশের সুশীল সমাজকে সংগঠিত করে মার্কিন বলয়ে নিয়ে আসার জন্য যে পরিমাণ অর্থ মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে প্রতি বছর ব্যয় করে, তার একাংশও ব্যয় করা হয় না তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচনে। ক'দিন আগেও ভেনিজুয়েলার মার্কিনবিরোধী প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করার কৌশলের অংশ হিসেবে সে দেশের সুশীল সমাজকে সংগঠিত করার জন্য মার্কিন কংগ্রেস ৭৫ মিলিয়ন ডলারের

www.pathagar.com

অনুমোদন দিয়েছে। সিআইএ'র সাবেক কর্মকর্তা ফিলিপ এজি (Philip Agee) তার 'Inside the company : A CIA Diary' নামক গ্রন্থে কিউবার সরকারকে উৎখাতের জন্য সুশীল সমাজকে ব্যবহারের মার্কিন কৌশল সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৮৩ সালে মার্কিন সরকার National Endowment for Democracy (NED) নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন নীতি সমর্থনকারী সুশীল সমাজের বিস্তারে সহায়তা প্রদান করা। এর ওয়েবসাইটে বর্ণিত আছে, এ প্রতিষ্ঠানটি বিদেশের এমন সব এনজিও-কে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে যারা মানবাধিকার, স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, আইনের শাসন এবং সুশীল সমাজের অন্যান্য উদ্যোগের বিষয়ে কাজ করে থাকে। বাহ্যিকভাবে এনইডি একটি বেসরকারি, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও মার্কিন কংগ্রেস প্রতি বছর এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে থাকে। ফিলিপ এজি'র ভাষ্য অনুযায়ী প্রধানত চারটি মূল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সরকারি অর্থ বিদেশে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে ব্যয়িত হয়। এ প্রতিষ্ঠান চারটি হলো – National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI), American Center for International Labor Solidarity এবং Center for International Private Enterprise. এদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নির্বাচনে সহায়তার নামে আমরা NDI এবং IRI-এর ব্যাপক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছি।

উপরে বর্ণিত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক বাংলাদেশের সুশীল সমাজের দিকে। পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার প্রচারণার শক্তিতে সিপিডি ও টিআইবি এ দুটি প্রতিষ্ঠান ও তাদের মিডিয়া সহযোগীরা বাংলাদেশের সুশীল সমাজে একপ্রকার একচ্ছত্র জমিদারি সাফল্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের অন্যান্য সক্রিয় সুশীল সমাজের দাবিদার হয়তো আমার এ মন্তব্যে আহত হবেন। কিন্তু এটিই বাস্তবতা। সিপিডি ১৯৯৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি ট্রাস্ট ডিড (Deed of Trust)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ট্রাস্টিরা ছিলেন – রেহমান সোবহান, ফজলে হাসান আবেদ, কাজী ফারুক আহমেদ, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, শাহীন আহমেদ, খুশী কবির, সৈয়দ হুমায়ুন কবির, ড. এফ আর মাহমুদ হাসান ও নূরুল হক। এ সংগঠনের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক আন্তর্জাতিক কৌশলগত কারণে আবার পশ্চিমা কূটনীতিকদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সিপিডিকে ট্রাস্ট ডিডে প্রথমেই যে ঘোষণাটি দিতে হয়েছিল, তা হলো– প্রতিষ্ঠানটি সব সময়ই একটি অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে তার চরিত্র বজায় রাখবে। ২০০১ সাল – পরবর্তী বাংলাদেশে সিপিডি তার অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতাও তদানীন্তন বিএনপি সরকারের কিছু প্রভাবশালী মন্ত্রীর নীরব সমর্থন বা তাদের অজ্ঞানতার সুযোগে বিনা বাধায় চালিয়ে গেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশকে একটি 'অকার্যকর রাষ্ট্র' রূপে প্রমাণ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সাফল্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে তাদের অতি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মিত্রদের সহযোগিতায়। সিপিডি'র এ রকমই একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যান্ডের ডাভোসভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ নিয়ে এ

www.pathagar.com

নিবন্ধকারের সঙ্গে গত বছর তাদের দীর্ঘ ও তিক্ত বিতর্কের কথা অনেক পাঠকই হয়তো স্মরণে রেখেছেন। বিতর্কে শেষাবধি 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' প্রচ্ছন্নভাবে পরাজয় স্বীকার করে লিখিতভাবে এ প্রতিশ্রুতি প্রদানে বাধ্য হয় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণে তারা অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও সাবধানী হবে। সিপিডি'র মতো প্রতিষ্ঠানের পরনির্ভরতা কতখানি গভীরে প্রোথিত, একটি মাত্র পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই পাঠকের কাছে তা সহজেই স্পষ্ট হবে। এনজিও ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী শুধু চারটি প্রকল্পেই ফোর্ড ফাউন্ডেশন (ভারত), কানাডিয়ান হাইকমিশন, আইডিআরসি এবং সিডা (CIDA) সিপিডি'র জন্য মোট ২৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছে। বিদেশী এ অর্থ বাংলাদেশের আদৌ কোনো উপকারে লাগছে কি না, তা নিয়ে অন্তত এ নিবন্ধকারের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

দুর্নীতি দমনে বিএনপি সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং আন্তর্জাতিক অংগনে সুশীল সমাজের অব্যাহত সরকারবিরোধী প্রচারণা চারদলীয় জোট সরকারকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করে ফেলেছিল। সরকারের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তথাকথিত নাগরিক কমিটির সচিবালয়ের প্রকাশ্য দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সিপিডি ট্রাস্ট ডিডের শর্তভঙ্গ করে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অনুপ্রবেশ করে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে। এ বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে ২০০৬ সালের ৮ আগস্ট সিপিডি এক সংবাদ সম্মেলনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তার জনবলের ৫.৬ শতাংশ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত যা ট্রাস্ট ডিডের সরাসরি লংঘন। সিপিডি'র ওয়েবসাইটে বর্ণিত নাগরিক কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন – প্রফেসর রেহমান সোবহান, লায়লা রহমান কবির, প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, এম সায়ীদুজ্জামান, ফজলে হাসান আবেদ, রাষ্ট্রদূত আবুল আহসান, ড. আনিসুজ্জামান, স্যামসন এইচ চৌধুরী, মেজর জেনারেল অবঃ মইনুল হোসেন চৌধুরী, মাহমুদা ইসলাম, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এম হাফিজউদ্দিন খান, ড. ইকবাল মাহমুদ, প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, লতিফুর রহমান, রাজা দেবাশীষ রায়, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহি, অ্যাঞ্জেলা গোমেজ, এম মুজিবুল হক, প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল, এ এস এম শাহজাহান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সুশীল সমাজের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সিপিডি'র এ জাতীয় কর্মকান্ডে প্রথম থেকেই বাংলাদেশে নিযুক্ত পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা যাবতীয় সহায়তা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য সুশীল সমাজের নেতৃত্বে একটি তৃতীয় শক্তির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই যে এসব কর্মকান্ডের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, তা বোধকরি এতদিনে বাংলাদেশের জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার এদেশে সুশীল সমাজের দ্বিতীয় শক্তিশালী সংগঠন। এ সংগঠনটি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং তাদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য-অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিরা হলেন – প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, মাহফুজ আনাম, এম হাফিজউদ্দিন খান, তৌফিক নেওয়াজ, প্রফেসর খান সরওয়ার মুরশীদ, স্যামসন এইচ চৌধুরী, এস রুবী গজনবী, সুলতানা কামাল, প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ ও প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণা, এ সংক্রান্ত তথ্য বার্লিনে টিআইবি'র সদর দফতরে প্রেরণ এবং বছরে একবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করাই হলো টিআইবি বাংলাদেশের প্রধান দায়িত্ব। দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহে এ সংস্থার প্রধান একটি দুর্বলতা হলো, তারা তাদের ঘোষণা অনুযায়ী শুধু সংবাদপত্রের খবরকেই দুর্নীতিবিষয়ক ডাটাবেজ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যম জরুরি অবস্থাকালীন ছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও এ দেশের সংবাদপত্রের একটি বৃহৎ অংশ দুর্নীতিপরায়ণ, সন্ত্রাসী ও প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তিদের মালিকানায় থাকায় তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। গত ক'দিনের ঘটনাপ্রবাহে যারা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন অভিযোগে আটক হয়েছেন, তাদের মধ্যেই অন্ততপক্ষে পাঁচজন বিভিন্ন মিডিয়ার স্বত্ত্বাধিকারী হিসেবে আমাদের কাছে সুপরিচিত। এহেন ব্যক্তিদের মালিকানাধীন সংবাদপত্রের খবর একটি জাতির দুর্নীতির মানদন্ড হতে পারে কি না, সেটি সচেতন পাঠক বিবেচনা করবেন। সিপিডি'র মতো টিআইবিও প্রধানত বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রেরিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে তাদের অর্থের প্রধান যোগানদাতারা হচ্ছে – যুক্তরাজ্য সরকারের ডিএফআইডি, ডেনমার্ক সরকারের ডানিডা, নরওয়ে সরকার ও সুইডেন সরকারের সিডা। টিআইবি'র আরেকটি ব্যর্থতা হলো, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রণালয়ের প্রচারের ব্যাপারে অতি উৎসাহী হলেও দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর বিষয়ে তারা সচরাচর নিশ্চুপ থাকেন। দেশে এ ধরনের মন্ত্রণালয়গুলোকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়া হলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও যে দুর্নীতি উৎখাতে উৎসাহিত হতো, এ পরম সত্যটি টিআইবি হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই উপলব্ধি করতে চায় না বা জনগণকেও বুঝতে দিতে চায় না।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সিপিডি, নাগরিক কমিটি, টিআইবি ও অধুনা 'সুজন'-এর সদস্যদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ চারটি সংগঠনের সাথেই একই সংগে জড়িত রয়েছেন। সঙ্গত কারণেই তাদের বক্তব্য ও কর্মকান্ডের মধ্যে বিশেষ সমন্বয় সহজেই লক্ষণীয়। সুশীল সমাজের এ ৩০-৪০ জন নেতার মধ্যেও বিভিন্ন কর্মকান্ডে, মিডিয়ার প্রচারণায় এবং বিদেশীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষায় আবার সত্যিকার অর্থে সর্বদা সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা ১০ জনের উর্ধ্বে হবে না। বিদেশী অর্থ উপার্জনের জন্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল বিজ্ঞাপনই হচ্ছে 'ব্যর্থ ও অকার্যকর বাংলাদেশ' এবং নিজ স্বার্থেই যে এরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যগুলোকে অস্বীকার কিংবা আড়াল করতে চাইবে এটিই প্রত্যাশিত। আমি আগেই বলেছি, গত বিএনপি সরকারের দুর্নীতিসংক্রান্ত নিদারুণ ব্যর্থতা এবং তদানীন্তন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বর্বরোচিত সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে আমাদের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। আর এ সুযোগেই সম্ভব হয়েছে বিদেশী শক্তির সহায়তায় বাংলাদেশে সুশীল সমাজের শক্তিশালী উত্থান। ঢাকার রাস্তায় রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে যখন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চলছিল, তখন আমাদের সর্বদা সরব এ সুশীল সমাজ ছিল একেবারেই নীরব। নীরবতার অর্থই প্রচারবিমুখতা। প্রচারের যেকোনো সুযোগ নষ্ট করা সুশীল সমাজের কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের অরাজক পরিস্থিতি অনেকের কাম্য ছিল। কারণ রাষ্ট্রের এ ধরনের অরাজক অবস্থাই

www.pathagar.com

সুশীল সমাজকে গ্রহণযোগ্যতা দেয় এবং তাদের ক্ষমতা গ্রহণের পথ সুগম করে। দেশের বর্তমান রাজনীতিশূন্য পরিস্থিতি এবং বিশেষ ব্যবস্থার সরকারকে সুশীল সমাজ ইতোমধ্যেই তাদের কৌশলের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে ধরে নিয়েছে। এ কারণেই মিডিয়ায় তাদের মুখ্যতম প্রতিনিধি এক সম্পাদক প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, বর্তমান জরুরি অবস্থা তাদেরই প্রচারণার ফসল এবং এ কারণে জরুরি অবস্থা তাদের ক্ষেত্রে অন্তত প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। সরকারের কাছ থেকে এ ধৃষ্টতার অদ্যাবধি কোনো প্রতিবাদ না আসায় আমজনতা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ আরো একটি ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বামপন্থীরা সুশীল সমাজকে তার বুর্জোয়া চরিত্রের কারণে প্রতিপক্ষ মনে করলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশের বাম ঘরানার তাত্ত্বিকরা সুশীল সমাজকে প্রধানত তাদের মিত্র বলেই মনে করে। এ দেশে বহুধাবিভক্ত বাম রাজনীতির ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সঠিক মিত্র নির্বাচনে তাদের ধারাবাহিক অক্ষমতা।

এ রকম একটি অতি উর্বর পরিস্থিতিতে জনতা সেই অতি প্রত্যাশিত প্রকাশ্য ঘোষণা শুনতে পেয়েছে যে, সুশীল সমাজ এবার সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে। সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এলে তা দেশের জন্য শুভ সংবাদ বৈকি! তবে বিভ্রান্তি আছে অন্যখানে। সুশীল সমাজের রাজনীতিতে আগমন যদি প্রথাগতভাবে রাজনৈতিক দল গঠন এবং অতঃপর অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণের মাধ্যমে ঘটে তাহলে সবারই সে প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু সুশীল সমাজের ক্ষমতায় আরোহণ যদি জনগণের রায়কে পাশ কাটিয়ে কিংবা বিশেষ ব্যবস্থায়, দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী শক্তির কূটকৌশলের সহায়তায় প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আরোপিত হয় তাহলে দেশবাসীর আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ধরনের আরোপিত, ত্রিশঙ্কু সরকারের দেশ বা জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা থাকে না। ক্ষমতায় থাকাকালীন বিদেশী প্রভুদের স্বার্থসংরক্ষণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ উপমহাদেশেই ব্রিটিশ শাসকরা রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরের নামে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি তল্পিবাহক, জনস্বার্থবিরোধী, তথাকথিত কুলীন শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। সে গণবিরোধী এলিট শ্রেণী উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘায়িত করার ষড়যন্ত্রে সর্বদাই নিয়োজিত থেকেছে। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে আবার একটি পরনির্ভরশীল, স্বঘোষিত অভিজাত শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার সুঘ্রাণ পেতে শুরু করেছে এবং আকাশে-বাতাসে সে সুঘ্রাণের মাদকতায় এদের কয়েকজন ইতোমধ্যেই অস্থির, বেসামাল ও আত্মম্ভরী আচরণ দেখাচ্ছেন। আমাদের মতো সাধারণ পেশাজীবী ও আমজনতার শংকা সেখানেই।

০৮.০২.০৭

www.pathagar.com

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় দুদকই কি যথেষ্ট?

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। সরকারে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার ধারণায় এ উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ অপচয় হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে প্রতি বছর আমাদের দেশের অপচয়জনিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। আর একটি তথ্য এখানে দেয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে যে, ঋণ ও সাহায্য মিলিয়ে বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৭ হাজার কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হবে না। মোদ্দা কথা হলো, শুধু উন্নয়ন খাতে দুর্নীতি রোধ করা গেলে আমাদের আর তথাকথিত দাতা অথবা উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন হতো না। ফলে বিদেশী কূটনীতিকরা প্রতি পদে পদে এবং প্রকাশ্যে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখাতেও আর সক্ষম হতেন না।

এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে দুটি প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। প্রথম প্রশ্নটি হলো, এ দুর্নীতি ও অপচয় রোধ করা আদৌ সম্ভব কি না। দ্বিতীয়টি হলো প্রথম প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক হলে গত পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যর্থতা দূর করার জন্য আমরা কী পদ্ধতি গ্রহণ করব। আমি বরাবরই বাংলাদেশ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ এবং সে মানসিকতার ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করি যে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণ করা অবশ্যই সম্ভব। এবার দেখা যাক সে উদ্দেশ্য পূরণের কৌশলটি কী হতে পারে। সাধারণভাবে সরকারি কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট দুর্নীতির দুষ্টচক্রের তিন সহযোগী হচ্ছে রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী। আমাদের দেশে সরকারি খাতে দুর্নীতির বেশিরভাগ সংঘটিত হয় সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারি নীতি প্রণয়নে। এর মধ্যে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমের দুর্নীতিতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রধান দুটি দল হচ্ছে আমলা ও ব্যবসায়ীরা। দুর্নীতির বাকি দুটি ক্ষেত্র অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় এবং নীতি প্রণয়নবিষয়ক দুর্নীতিতে অবশ্য রাজনীতিবিদরা সচরাচর প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমলা ও ব্যবসায়ীরা থাকেন সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকায়।

দেশে নব্বইয়ের দশকে পুরোপুরি মুক্তবাণিজ্য শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত অবশ্য ভোগ্যপণ্য আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রদানবিষয়ক আরেক শ্রেণীর দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করতেন তৎকালীন শাসকরা। এ জাতীয় বিখ্যাত একটি দুর্নীতির উদাহরণ হচ্ছে স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলের শেষ সময়ের বহুল আলোচিত চিনিবিষয়ক দুর্নীতি। স্মরণ আছে, তখনকার এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নামের আগে 'চিনি' শব্দটি সহজবোধ্য কারণে বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হতো। সরকারি খাতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির কিছু বহুল আলোচিত উদাহরণের মধ্যে রয়েছে এরশাদ আমলের কাফকো (KAFCO) ও

www.pathagar.com

জাপানি বোট ক্রয়, শেখ হাসিনার আমলের মিগ-২৯ ও ফ্রিগেট ক্রয়, অতিসাম্প্রতিককালে জোট সরকারের সময়ে সিএনজি বেবিট্যাক্সি ও আরইবি'র (REB) জন্য কংক্রিট পোল (concrete pole) ক্রয় ইত্যাদি। দুর্নীতির আরো একটি বড় সুযোগ হলো সরবরাহকারীর ঋণের (supplier's credit) মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্প। এ ধরনের প্রকল্পে আবার আমাদের তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রগুলো সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে। এ শ্রেণীর দুর্নীতিযুক্ত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে কাফকো, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা, ডিএপি-১, ডিএপি-২সহ বেশ কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প। ২০০১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সঙ্গত কারণেই সরকারের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সাপ-ায়ার্স ক্রেডিটকে নিরুৎসাহিত করলেও অজ্ঞাত কারণে পরবর্তী সময়ে এ জাতীয় বেশ কিছু প্রকল্প অনুমোদন করেন।

সরকারি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতির একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে নাইকোর কাহিনী বর্ণনাই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। রাজনীতিবিদ, আমলা, বিদেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের দ্বারা প্রণীত দুর্নীতির এমন একটি উপাখ্যান সম্পর্কে অবহিত হওয়া জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে যেকোনো নতুন মন্ত্রী, উপদেষ্টা অথবা সচিবের ওরিয়েন্টেশনের অংশ হওয়া উচিত। এ উপাখ্যানের শুরু ১৯৯৮ সালের ২৮ জুন যখন তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার ছাতক, কামতা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য নাইকোর একটি অযাচিত (unsolicited) প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে অযাচিত প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে উল্লেখিত গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে প্রান্তিক ও পরিত্যক্ত (marginal) বিবেচনা করে নাইকোর সঙ্গে বাপেক্সের সমঝোতা স্মারকের প্রস্তাব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ২০ মে অনুমোদন করেন। এ সমঝোতা স্মারকের প্রধান অনুঘটক ছিলেন তৎকালীন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সচিব ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। তারই ১৬-৫-৯৯ তারিখের প্রস্তাবের ওপর ওই বিভাগের প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম অত্যন্ত দ্রুততার সংগে একই দিনে সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ প্রস্তাবে অনুমোদনের বিষয়টি আগেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কানাডীয় কোম্পানী নাইকোর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান এবং ২০০৬ সালে কর্মচ্যুত, কাশেম শরীফ সাবেক সচিব ড. তৌফিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে মন্ত্রণালয়ে বিশেষ পরিচিত।

যাহোক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন অনুযায়ী ২৩ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে ওপরে বর্ণিত সমঝোতা স্মারক সই হলো। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের একেবারে শেষ দিকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সম্ভবত স্মরণে এল যে কোনো গ্যাসক্ষেত্রকে প্রান্তিক অথবা পরিত্যক্ত ঘোষণা করার জন্য দেশে কোনো নীতিমালাই নেই। সে হিসেবে নাইকোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আইনগত বৈধতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্ভবত এ বিবেচনা থেকেই দ্রুততার সঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি পদ্ধতির খসড়া তৈরি করা হলো। কিন্তু, সমস্যা তো অন্যখানে। প্রশ্ন থেকে যাবে যে, প্রান্তিক বা পরিত্যক্ত ঘোষণার কোনো পদ্ধতি ছাড়াই সরকার তাহলে কোন আইনে ১৯৯৯ সালে ছাতক, কামতা ও ফেনী গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে পরিত্যক্ত বিবেচনা করে নাইকোর সংগে

www.pathagar.com

সমঝোতা স্মারক সই করেছে। সমাধানটি বেশ চিত্তাকর্ষক। পদ্ধতির খসড়ায় একটি নতুন ধারা সংযুক্ত হলো, এবং ধারাটি নিম্নরূপ :

10. "Explanatory note : For the purposes of these procedures, Chhatak, Kamta and Feni Gas fields shall be deemed to have been declared marginal/abandoned gas fields, and, the negotiations/discussions conducted so far with the approval accorded by the government in 1999, shall be deemed to have been in compliance with the above procedures."

অর্থাৎ পদ্ধতিটি যখনই রচিত হোক না কেন ধরে নিতে হবে যে, ছাতক, কামতা ও ফেনী গ্যাসক্ষেত্র ইতোমধ্যেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

এ ধরনের সাহসিকতাপূর্ণ দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে বাহবা দিতেই হয়। খসড়া অনুযায়ী তৎকালীন সচিব এম আকমল হোসেইন প্রস্তাব তৈরি করলেন ২০০১ সালের ৬ জুন। একই প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম কালবিলম্ব না করে একই দিনে 'সারসংক্ষেপে' স্বাক্ষর করলেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ জুন ২০০১ সালে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন অর্থাৎ ছাতক, কামতা ও ফেনী গ্যাসক্ষেত্রের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। পাঠকরা হয়তো অবাক বিস্ময়ে ভাবছেন কত সহজেই না আইন বদলায়, দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়।

২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে পরাজিত হলো। বেগম খালেদা জিয়া জনগণের বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন। নতুন সরকার। নতুন আশা। কিন্তু, ছাতক আর ফেনী গ্যাসক্ষেত্রের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং আওয়ামী লীগ আমলে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর নাইকো ও বাপেক্সের মধ্যে যৌথ প্রকল্প চুক্তি (Joint Venture Agreement) স্বাক্ষরিত হলো। এর পরের ইতিহাস পাঠকরা মোটামুটি জানেন। শুধু দুটি তথ্য এখানে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২০০৫ সালের ২০ জুন থেকে ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর এ স্বল্পসময়ে জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালে নাইকোর কাছ থেকে গ্যাসের ক্রয়মূল্য প্রতি MCF-এ ০.৩৫ মার্কিন ডলার কমিয়ে রাষ্ট্রের প্রায় ৭০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আর এ সময়কালে নাইকোকে তার গ্যাসের মূল্য বাবদ একটি ডলারও প্রদান করা হয়নি । এর ফলে টেংরাটিলার দুই দফা ব্লো-আউটজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় করার একটি বাস্তবসম্মত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি বর্তমান সরকার এ সুযোগটি কাজে লাগাবেন।

এতক্ষণ পাঠকরা হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন যে, শুধুই তো দুর্নীতির প্রকারভেদ এবং ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। দুর্নীতি দূর করার কৌশল কোথায়? প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি কারা করছেন, কেমন করে করছেন, কোন খাতে করছেন এসব চিহ্নিতকরণ দুর্নীতি নির্মূল কার্যক্রমেরই পূর্বশর্ত। এ কারণেই উপরোক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে। এবার দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। এ বিষয়েও চিন্তার ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। যেমন অনেকে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য শাস্তির ওপরই অধিকতর আস্থাশীল। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার, এ প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ এবং দুদকে সৎ ও দক্ষ

www.pathagar.com

কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করলেই দেশ থেকে মোটামুটি দুর্নীতি নির্মূল হয়ে যাবে বলে টিআইবি'র মতো সমাজের একটি বড় অংশই বিশ্বাস করেন। এ সম্পর্কে আমার ধারণা ভিন্নতর। দুদক যখন দুর্নীতি দমন ব্যুরো ছিল তখন সেখানেও অনেক সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিরা কর্মরত ছিলেন। এ ধরনের তিনজন ব্যক্তিকে তো আমিই ব্যক্তিগতভাবে জানি। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন বর্তমান যোগাযোগ উপদেষ্টা, যিনি ২০০১ থেকে দীর্ঘ তিন বছর দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক ছিলেন। সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান এবং ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম এম আই খানও দুর্নীতি দমন ব্যুরোর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন। এ তিনজনই অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা হিসেবে সমাজে পরিচিত এবং প্রশংসিত। তারা নিজেরা অত্যন্ত সৎ হয়েও কিন্তু প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করতে সক্ষম হননি। বরং টিআইবি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীতিতে একাদিক্রমে পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের ৩৫ বছরের ইতিহাসে বর্তমান সরকার এখন সবচেয়ে কঠোর দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। কিন্তু, অভিযান চলাকালীন সময়েও আমরা জানতে পারছি যে, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও ঘুষ গ্রহণ করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ছে। অর্থাৎ এত কঠোর অভিযানও দুর্নীতিবাজদের নিবৃত্ত করতে পারছে না। এর অর্থ হচ্ছে শুধু কোনো খন্ডিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারব না। এ বাস্তবতাকে প্রথমে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। তার সঙ্গে এটিও স্বীকার করতে হবে যে, শুধু স্বাধীন দুদক প্রতিষ্ঠা করলেই আমরা শুদ্ধ নাগরিক হয়ে যাব না। আমি মনে করি স্বাধীন দুদক দুর্নীতিবিরোধী সমন্বিত কার্যক্রমের একটি অংশমাত্র।

এরশাদ আমলের পর সম্ভবত গত বিএনপি সরকারই দুর্নীতির অভিযোগে সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। এরকম একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাঁচ বছর বিনিয়োগ বোর্ড এবং সরকারের শেষ ১৬ মাস জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ পরিচালনাকালে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি সংক্রান্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিবেচনায় দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চারটি কর্মসূচিকে সমন্বয় করে একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সৎ কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করা, দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সূচনা এবং দুর্নীতিবিরোধী কঠোর ও পক্ষপাতহীন অভিযান পরিচালনা। বর্তমানে শেষোক্ত কর্মসূচিটি জোরেশোরে চললেও প্রথম তিনটি কৌশল নিয়ে কোনো কার্যক্রম তো দূরের কথা এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনাও শুরু করিনি।

সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। একটি ছোট উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ শুরু করলে স্বচ্ছতাও যেমন নিশ্চিত হবে সে সংগে চাঁদাবাজি, ঘুষ গ্রহণ এবং অনৈতিক সিন্ডিকেট তৈরির সুযোগও বহুলাংশে কমে যাবে। সরকারি বৃহৎ ক্রয়চুক্তির জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ সংক্রান্ত আলোচনা সংসদে হতে পারে। যাতে বিরোধী দলও এসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মতামত জানানোর সুযোগ পায়। অবশ্য তার আগে

www.pathagar.com

সংসদ বর্জনের কুপ্রথা নিষিদ্ধ করে সংসদকে অবশ্যই অর্থবহ করতে হবে। সরকারি দায়িত্ব পালনকালে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বর্তমান পদ্ধতিতে সৎ কর্মকর্তার কোনোরকম স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন একেবারেই অনুপস্থিত। সততার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় কোনো প্রণোদনাই (incentive) বর্তমানে নেই। এ রকম পরিবেশেও যারা সৎ থাকছেন তারা শুধু নিজের বিবেকের তাড়নাতেই সৎ জীবনযাপন করছেন। এ ধরণের কর্মকর্তার সংখ্যা কম এবং স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মেই ক্রমাগত আরো কমে আসছে। অথচ ভেবে দেখুন, সততার জন্য যদি দ্রুত পদোন্নতি দেয়ার রেওয়াজ থাকত কিংবা সরকারি বাসা বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৎ কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকারের বিধান থাকত অথবা নিদেনপক্ষে বছরে একবার সরকার প্রধান সৎ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিশেষভাবে সম্মানিত করতেন, তাহলে আমরা কি প্রশাসনের এতটা অধোগতি দেখতাম? সরকার যারা পরিচালনা করেন তাদের এত চিন্তা করার সময় কোথায়? তারা আত্মউন্নয়নের কাজেই সর্বদা ব্যস্ত।

এবার সামাজিক আন্দোলন প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ষাটের দশকে আমি পুরনো ঢাকায় থাকতাম। এলাকায় জনশ্রুতি ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী এক পুলিশ কর্মকর্তার প্রচুর দুর্নীতিলব্ধ ধন-সম্পদ ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তার স্ত্রীকে কখনো কেউ তখনকার সময়ে ১০-১২ টাকার চেয়ে উর্ধ্বমূল্যের শাড়ি পরতে দেখেনি যদিও অনেক উচ্চমূল্যে শাড়ি কেনার ক্ষমতা ওই মহিলার ছিল। কারণ আর কিছুই না, পাছে লোকে কিছু বলে। তুলনা করুন তো এখনকার সমাজব্যবস্থার সংগে। দুর্নীতিলব্ধ ঐশ্বর্য প্রদর্শনের কদর্যতম প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। সামাজিক আন্দোলন ছাড়া এ মানসিকতা পরিবর্তন করবেন কেমন করে? আর মানসিকতা পরিবর্তন ছাড়া দুর্নীতি নির্মূলের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কাজেই বর্তমানে যে অভিযান চলছে তার সংগে এ নিবন্ধে প্রস্তাবিত তিনটি কর্মসূচি সমন্বয় করার জন্য বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রস্তাব রাখছি। নইলে আমি নিশ্চিত যে, দুর্নীতি নির্মূলের বর্তমান উৎসাহ খুব বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। একটি পত্র উদ্ধৃত করে এ নিবন্ধ শেষ করব। জোট সরকারের একেবারে শেষ লগ্নে তৎকালীন মুখ্য সচিব কামালউদ্দিন সিদ্দিকীকে লেখা বিনিয়োগ বোর্ডের তৎকালীন নির্বাহী চেয়ারম্যানের লিখিত এ আধা সরকারি পত্রটি। পাঠক সহজেই বুঝবেন যে, কেন এ পত্রটি আজকের নিবন্ধে অতি প্রাসঙ্গিক।

"প্রিয় মুখ্য সচিব,

আমার সালাম গ্রহণ করুন।

বিগত পাঁচ বছরের সরকারের বিভিন্ন স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সুশাসন (Good Governance) সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার এবং আপনার উত্তরসূরিদের কাজে সহায়তার জন্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সরকারি দায়িত্ব পালনকালে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় বা সরকারি রীতিনীতিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় Incentive একেবারেই অনুপস্থিত।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে আমার সর্বস্তরের সহকর্মীদের সহযোগিতায় বিনিয়োগ বোর্ডকে একটি দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা

www.pathagar.com

চালিয়েছি। এটি বোধহয় দাবি করা অসঙ্গত হবে না যে, বিনিয়োগ বোর্ড আজকের বাস্তবতায় দেশের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা কোনোরকম তথাকথিত speed money ব্যতিরেকেই বিনিয়োগ বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় সেবা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পাচ্ছেন। ফলে বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগ বর্তমান সরকার আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি জাপানের একটি বিখ্যাত Corporate Bank প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা আপনার অবগতির জন্য সংযুক্ত করলাম (সংযুক্তি ১)। এ প্রতিবেদনে বিনিয়োগ বোর্ডকে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দৃষ্টান্ত রূপে অভিহিত করা হয়েছে। UNCTAD-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের স্থান (১১৬), ভারতের স্থান (১১৯) প্রথমবারের মতো অতিক্রম করেছে।

উপরোক্ত অর্জনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়নি। এর জন্য আমার প্রতিটি সহকর্মীকে অত্যন্ত অপ্রতুল সরকারি বেতনে সততার সঙ্গে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। অত্যন্ত মর্মবেদনার সংগে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ দৃষ্টান্তমূলক কাজের বিনিময়ে Incentive তো নয়ই, এমনকি তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদিও আমি প্রদান করতে সক্ষম হইনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনার কাছে প্রেরিত ২৭-০৪-২০০৩ এবং ৮-০৪-২০০৪ তারিখের পত্রের (সংযুক্তি ২) প্রতি আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করছি যেখানে বিনিয়োগ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি অতিরিক্ত সরকারি বাসা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আপনার এবং তৎকালীন পূর্ত সচিবকেও আমি একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছি। বলাই বাহুল্য সে বাসা অদ্যাবধি বরাদ্দ হয়নি। দ্বিতীয় উদাহরণ, দীর্ঘ পাঁচ বছর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিনিয়োগ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন করাতে ব্যর্থ হয়েছি। এ বিষয়ে আপনাকে ২টি সরকারি/আধাসরকারি পত্র (সংযুক্তি ৩) এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩টি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে (সংযুক্তি ৪)। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন না হওয়ার ফলে বিনিয়োগ বোর্ডে একই পদে একজন কর্মকর্তা দীর্ঘ ১৭ বছরেরও অধিককাল ধরে কর্মরত আছেন। এ অবস্থায় সরকার কিভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে সততা অথবা সুশাসন আশা করতে পারে এটিই আমার জিজ্ঞাস্য।

ভবিষ্যতে সরকার পরিচালনায় আপনার কোনো সুযোগ হলে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আশা করি এমন সংস্কার করবেন যাতে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে সততার সঙ্গে কাজ করার একটি পরিবেশ তৈরি হয়। সরকারের প্রশাসনযন্ত্রকে সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এ ধারণার সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই সহমত পোষণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে, একান্তভাবে আপনার মাহমুদুর রহমান।"

১১.০৩.০৭

www.pathagar.com

সরকারের দৃষ্টি এবার প্রসারিত করার পালা

বাংলাদেশের মতো ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীর একটি গরিব দেশের সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, অন্তত আমার মতে, দারিদ্র্য বিমোচন। সেদিক দিয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ কিংবা বস্তি উচ্ছেদ খুব বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না সে প্রসঙ্গে বিতর্ক উঠলে তাকে জরুরি আইনের লঙ্ঘন বলে থামিয়ে দেয়া বোধ হয় উচিত হবে না। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদের মতো আমিও মনে করি, কর্মসংস্থানই হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ২২ শতাংশ কৃষি থেকে এলেও ২০০২-০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৫২ শতাংশ কর্মসংস্থান এখনো হচ্ছে কৃষি খাতে। সেবা ও শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের অংশ ৩৪ ও ১৪ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থবছরের পরবর্তী চার বছরে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে ধারণা করা যায়, বর্তমান সময়ের জরিপে হয়তো শিল্প খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং কৃষি খাতে কর্মসংস্থান সমপরিমাণ কমেছে। এতদসত্ত্বেও এখনো কৃষিতে নিঃসন্দেহে দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক নিয়োজিত রয়েছে। যা-ই হোক কৃষি, শিল্প ও সেবা তিনটি খাতই যে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালের অক্টোবরে ওই তিনটি খাত এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনীতিকে কী অবস্থায় রেখে ক্ষমতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়া এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের দায়িত্বের বিশালত্ব উপলব্ধি করা যাবে না। ১৯৯১ থেকে শুরু করে ২০০৬ পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি মনে করি।

সময়কাল	গড় জাতীয় প্রবৃদ্ধি	গড় কৃষি খাত প্রবৃদ্ধি	গড় শিল্প খাত প্রবৃদ্ধি	জিডিপি'র হিসাবে গড় বেসরকারি বিনিয়োগ	গড় রফতানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	গড় প্রকৃত মজুরির হার সূচক	গড় প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (বিলিয়ন ডলার)
১৯৯১-৯৬	৪.৬৪	০.৬০	৮.৩৫	১২.৩৫	২.৮০	১১২	১.১০
১৯৯৬-০১	৫.৩৪	৫.৭৩	৫.৬৫	১৫.৮	৫.৪০	১২১	১.৭০
২০০১-০৬	৫.৭৪	২.৭১	৭.৬০	১৭.৭৬	৭.৯০	১৪২	৩.৫০

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংক

গত জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো এবার নিবন্ধের স্বার্থে আবার উল্লেখ করা যাক। ওই সরকারের বেশ ক'জন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং সরকারের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা চক্ষুলজ্জাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। খুবই সত্যি কথা। জোট সরকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটিও সঠিক অভিযোগ। জোট সরকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ

www.pathagar.com

হয়েছে। বর্তমান নির্দলীয় সরকারের সময় দ্রব্যমূল্যের ভীতিকর বেড়ে ওঠা দেখে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগটি আর খুব একটা ধোপে টিকছে না। টেলিভিশনের এক টক শো-তে সুশীল(?) সমাজের এক অতি পরিচিত অর্থনীতিবিদকে দেখলাম দ্রব্যমূল্যের বর্তমান উর্ধ্বগতির পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সাফাই গাইতে। একই অর্থনীতিবিদ জোট সরকারের আমলে কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়ে ওঠার সাফাই গাওয়া তো দূরের কথা বরং সরকারের সমালোচনায় সর্বদা মুখর থাকতেন। আমাদের দেশের মিডিয়াসৃষ্ট বিশিষ্টজনরা আর নিজেদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা রাখলেন না। বিদেশী অর্থে পুষ্ট এসব বিশিষ্টজনের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই বোধ হয় বর্তমান সরকারের জন্য মঙ্গলজনক।

যা-ই হোক, জোট সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা সত্ত্বেও ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি যে বেগবান হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করতে হলে তাবৎ দেশী-বিদেশী পরিসংখ্যানকে অস্বীকার করতে হয়। ওপরে বর্ণিত ছক থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আলোচ্য সময়ে জাতীয় আয়, শিল্প খাত, বেসরকারি বিনিয়োগ, রফতানি, প্রকৃত মজুরির হার, সূচক এমনকি প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণেও বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। শুধু কৃষি খাতে কম প্রবৃদ্ধির কারণে জোট সরকারের কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ৯ শতাংশ অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ১.৮ শতাংশ কমেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ হার সার্ক ও এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। যে ভারতকে আগামী দিনের পরাশক্তি বিবেচনা করা হচ্ছে তাদের পক্ষেও কিন্তু এ হারে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়নি। সমালোচকরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলতে পারেন দুর্নীতি না থাকলে আমাদের অর্থনীতির উন্নতি দ্রুততর হতো এবং দরিদ্র মানুষ আরো কম সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পেত। দুর্নীতি নিয়ে এর আগের নিবন্ধেই লেখার কারণে এ বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। সারকথা হলো দেশী-বিদেশী সব পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে যে বর্তমান সরকার আগেকার যেকোনো সরকারের তুলনায় একটি শক্তিশালী অর্থনীতি নিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছে।

এবার দেশের অর্থনীতির বর্তমান চিত্র বিশ্লেষণ করা যাক। আমাদানির জন্য ঋণপত্রের পরিসংখ্যান দিয়েই শুরু করা যেতে পারে এ আলোচনা। ফেব্রুয়ারি মাসে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ কমেছে ১৪ শতাংশ। বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ ছিল ১১৪৩.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঋণপত্র খোলা হয়েছিল ১৩২৯.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। অবিশ্বাস্য এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য আশঙ্কাজনক অধোগতি। রাজস্ব আদায় দেশের সার্বিক অর্থনীতির আরো একটি উল্লেখযোগ্য সূচক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা কম হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আদায়ের তুলনায় বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১৬ শতাংশ, যা সন্তোষজনক বলা যাচ্ছে না। এর চেয়েও আশঙ্কাজনক হচ্ছে যে, ফেব্রুয়ারির রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি আরো কমে ৭.৭৮ হয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬

www.pathagar.com

অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক রাজস্ব বাড়ানোর পরিমাণ ছিল গড়ে প্রায় ১৪ শতাংশ। রাজস্ব আয় কম হওয়ার ফলে সরকারকে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অধিক পরিমাণে ঋণ নিতে হচ্ছে। এমনকি উন্নয়ন বাজেট বহুলাংশে কাটছাঁট করেও অধিকতর ঋণ নেয়ার এ প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। অর্থ উপদেষ্টা ইতোমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছেন যে বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন খাতের ব্যয় ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা কমানো হতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে জিডিপি'র হিসাবে সরকারি বিনিয়োগ বর্তমান বছরে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৬.৩ শতাংশেরও নিচে নেমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অর্থ বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয় বছর ধরেই সরকারি খাতে বিনিয়োগের নিম্নহারকে পুষিয়ে নিয়েছে বেসরকারি খাতের উচ্চ বিনিয়োগ। যেমন গত অর্থবছরে জিডিপি'র হিসাবে ৬.৩ শতাংশ সরকারি বিনিয়োগের বিপরীতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৮.৭ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগের গত পাঁচ বছরের চাঙ্গাভাব বজায় থাকবে কি না, এ নিয়ে আমি অন্তত সন্দিহান। বিনিয়োগ কমে গেলে কর্মসংস্থান কমে যাবে এবং এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যে সাফল্য লাভ করেছিলাম তা বাধাগ্রস্ত হবে, এটিই বর্তমান সময়ের আশঙ্কা।

অর্থনীতির এ পরিস্থিতি যেকোনো সরকারকে উদ্বিগ্ন করার জন্য যথেষ্ট। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, জনগণের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সরকার যেন অনেক বিলম্বে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তার ওপর প্রশাসনযন্ত্রে একধরণের সমন্বয়হীনতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুই উপদেষ্টাকে টেলিভিশনে দ্রব্যমূল্য নিয়ে একই দিনে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিতে দেখলাম। একজন বললেন, সরকারের সাম্প্রতিক কিছু অভিযানে ব্যবসায়ীরা আতংকিত বোধ করার ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। অন্যজন বললেন, সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং খুচরা বাজারে সিন্ডিকেটের কারসাজির কারণেই নাকি দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। চিন্তা করে অবাক হলাম যে, খুচরা বাজারগুলোর হাজার হাজার বিক্রেতা কী করে সিন্ডিকেট গঠন করতে পারে। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে সরকার যেকোনোভাবেই হোক একটি ধারণাশ্রয়ী কার্যক্রমের মধ্যে একটু বেশি আটকে যাচ্ছে। উপদেষ্টাদের অধিকাংশই প্রধানত রাজনীতি ও দুর্নীতি দমন নিয়ে কথা বলছেন। এদিকে দুঃখজনকভাবে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে একধরণের স্থবিরতা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। আমরা অবশ্যই অনুধাবন করি যে, বর্তমান সরকার দেশের এক বিশেষ মুহূর্তে এবং বিশেষ প্রয়োজনে দায়িত্ব গ্রহণে এক প্রকার বাধ্য হয়েছে। নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে এখনো সরকারের প্রতি প্রচুর জনসমর্থন রয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হবে শুধু চমক নিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে পড়লে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার বড় বড় কাজ অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেকোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকই চাইবে যে এ সরকার অবশ্যই সফল হোক, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো কারণে জনগণের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন কঠোরতা ও করুণার সংমিশ্রণে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে হবে। বর্তমান সরকার এখনো তার নির্মোহ কঠোর চরিত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শন করে

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজদের আতংকিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বস্তি অথবা হকার উচ্ছেদ করে অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেও আতংকিত করে তুলেছে - যা সম্ভবত অভিপ্রেত ছিল না। এবার সময় হয়েছে উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারের করুণা ও দায়িত্বশীলতার চরিত্রটি নাগরিকদের কাছে প্রদর্শন করার।

বর্তমান সরকার যারা চালাচ্ছেন তাদের উপলব্ধি করা জরুরি, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বেসরকারি খাত চালিত। এখানে বেসরকারি খাত অর্থে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের বোঝানো হচ্ছে না, গ্রামের বাজারের একজন ক্ষুদ্র দোকান মালিকও এ বেসরকারি খাতের অংশ। জোট সরকারের পাঁচ বছরে বিপুল দুর্নীতি সত্ত্বেও বেসরকারি খাতে একটি চাঙ্গাভাব বিরাজ করছিল এবং তার ফলেই অর্থনীতি এতটা গতিশীল ছিল। সরকারের বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকালীন কারো কারো অতি উৎসাহের কারণে দুর্নীতির বাইরে অবস্থিত বেসরকারি খাত আতঙ্কিত হয়ে যেন স্থবির না হয়ে পড়ে তা নীতিনির্ধারকদের নিশ্চিত করতে হবে। আশংকার কথা হচ্ছে বেসরকারি খাতের আতঙ্কিত রূপ ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এই আতঙ্কের প্রথম উদাহরণ বাজারে পণ্যের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এর ফলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিম্নবিত্ত তো দূরের কথা, অতি দ্রুত মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় উদাহরণ ফেব্রুয়ারি মাসে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ ১৪ শতাংশ কমেছে যার ফলে পণ্য সরবরাহ আরো সংকুচিত হয়ে ভোগ্যপণ্যের অধিকতর দাম বেড়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে মন্দা শুরু হয়েছে। ব্যাংকগুলোর বেশিরভাগ শাখায় লেনদেন কমেছে, আমানতকারীরা মেয়াদ পূর্তির আগেই ফিক্সড ডিপোজিট এমনকি সঞ্চয়পত্রও ভাঙিয়ে ফেলছেন এবং নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। চতুর্থ উদাহরণ বিভিন্ন বাজার উচ্ছেদের কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে খুচরা বিক্রয় অনেকাংশে কমে গেছে এবং এর ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা অধিক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পঞ্চম উদাহরণটি একেবারেই ব্যক্তিগত। আমার পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তার সরবরাহ করা মালামালের মূল্য হয়েছে ৩৭ হাজার টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তাকে ওই টাকার একটি চেক প্রদান করা হলে তিনি চেকটি নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তার বক্তব্য ছিল সময় খুব খারাপ এবং টাকা তাকে চেকের বদলে নগদে প্রদান করতে হবে। পাঠকরা ভেবে দেখুন ৩৭ হাজার টাকা আজকের দিনে কত ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর পরিমাণের অর্থ এবং এ পরিমাণের অর্থ নিয়েই যদি একজন ব্যবসায়ী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাহলে আতঙ্কের গভীরতা কতখানি।

বর্তমান সরকারে বড় বড় অর্থনীতিবিদ আছেন। শোনা যায়, বাইরে থেকে আরো অর্থনীতিবিদ তাদের সার্বক্ষণিক শলাপরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে বেসরকারি খাতের আস্থার ব্যাপারটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। নিজে পেশায় অর্থনীতিবিদ না হলেও সরকারি এবং বেসরকারি খাত মিলিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে সরাসরি সংযুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হচ্ছে জনপ্রিয়তা অর্জনের অতি উৎসাহে আমরা হয়তো অর্থনীতির সচল চাকাকে অচল করে দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত সরকারের এরকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ একটি

www.pathagar.com

অনির্বাচিত, নির্দলীয় সরকারের সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে না। আসলে প্রতীয়মান হচ্ছে, সরকারি কার্যক্রম খুব সীমিত পরিসরে এবং ক্ষুদ্র এজেন্ডায় আটকে গেছে। আমার এ মূল্যায়নে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিরক্ত বোধ করতে পারেন। দিন কয়েক আগে ফরহাদ মজহার তার এক নিবন্ধে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি হয়তো আর বেশি দিন তার মত প্রকাশ করতে পারবেন না। আমরাও একই ভীতির মধ্যে বসবাস করছি। ইতোমধ্যে আমার একটি নিবন্ধ এক জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদক বিতর্ক এড়ানোর জন্য ছাপতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এসব বাধা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই সরকারের কাছে তার চিত্ত ও দৃষ্টি দুটোই প্রসারিত করার আহ্বান জানাব। নইলে বড্ড বেশি দেরি হয়ে যেতে পারে।

১৭.০৩.০৭

www.pathagar.com

মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা : ক্ষতিপূরণের নেপথ্যে

মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রদ্বয় গ্যাসের মজুদের বিবেচনায় বিশাল কোনো গ্যাসক্ষেত্র না হলেও জ্বালানি খাত নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যেকোনো আলোচনায় এদুটো নাম সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্র দুটি বিখ্যাত হয়ে আছে ব্লো-আউট ও ব্লো-আউট-পরবর্তী সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা বিতর্কের কারণে। এ দেশের কোনো গ্যাসক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ব্লো-আউট হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে সিলেটের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রে। ব্লো-আউটের স্থানে একটি জলাভূমির উৎপত্তি হয় এবং সুদীর্ঘ ৫০ বছর পরও ওই জলাভূমিতে এখনো গ্যাস উদ্‌গিরণ হচ্ছে। জলাভূমিতে আজো গ্যাসের বুদবুদ দেখে ধারণা করা যেতে পারে, ব্লো-আউটের পর গ্যাসকূপটি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্লো-আউট সংঘটিত হয়েছে মৌলভীবাজার-১ (মাগুরছড়া) ও ছাতক (টেংরাটিলা) গ্যাসক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৯৯৭ ও ২০০৫ সালে। এর মধ্যে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে দুই দফা ব্লো-আউটের ঘটনা ঘটে যথাক্রমে জানুয়ারি ৭, ২০০৫ এবং জুন ২৪, ২০০৫। আমাদের আলোচনা এ দুটি গ্যাসক্ষেত্র নিয়েই। মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশ একারেজ ব্লক-১৪-র আওতাভুক্ত। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টালের ব্লক ১৩ ও ১৪-র জন্য একটি উৎপাদন বণ্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। ওই চুক্তির আওতায় মৌলভীবাজার-১ কূপ খনন শুরু হয় ৪-৬-১৯৯৭ এবং ১৪ জুন রাতে কূপে ব্লো-আউট সংঘটিত হয়। ব্লো-আউটের কারণে যে অগ্নিকান্ডের সূচনা হয় তা নেভাতে প্রায় ১০ দিন সময় লাগে। এ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং কমিটি ৩০ জুলাই, ১৯৯৭ জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করে। তদন্ত কমিটির সমীক্ষা অনুযায়ী পেট্রোবাংলা অক্সিডেন্টালের কাছে নিম্নোক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে :

০১. ধ্বংস হওয়া গ্যাসস্তরের ২৪৫.৮৬ বিসিএফ গ্যাসের দাম বাবদ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা; এবং

০২. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দাবি বাবদ ৬২৬.৬৫ কোটি টাকা।

১ নম্বর দাবির বিপরীতে কোনো ক্ষতিপূরণ আজ পর্যন্ত আমরা আদায় করতে পারিনি এবং ২ নম্বর দাবির ৬২৭ কোটি টাকার বিপরীতে ৬০০ কোটি টাকাই এখনো অনাদায়ী। শুধু তা-ই নয়, গত আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত চাতুর্যে অক্সিডেন্টালের সঙ্গে একটি সম্পূরক চুক্তি সই করলে ধ্বংস হওয়া গ্যাসস্তরের গ্যাসের দাম বাবদ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। সম্পূরক চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা বিশ্লেষণ করলেই বিদেশী কোম্পানির কাছে তদানীন্তন

www.pathagar.com

সরকারের বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির চিত্র পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হবে।

সম্পূরক চুক্তির ধারা ৪.৬ নিম্নরূপ :

4.6 The parties agree to add the following provisions to the PSC as Article 8B.3:

"8B.3 If Contractors produces Natural Gas in the Moulavibazar area from the sand layers (reservoir), encountered by the Moulavibazar well No. 1 which suffered a blowout on June 15, 1997 (i.e., sands to the drill depth of 840 meters), then with respect to such Natural Gas, notwithstanding Article 8B.1, Petrobangla's allocation of Profit Natural Gas pursuant to Article 8B.1 shall be increased by five percentage points and the Contractor's allocation of Profit Natural Gas pursuant to Article 8B.1 shall be decreased by five percentage points."

If the blow-out sand reservoir is not present or development is not feasible, then Petrobangla's allocation of profit natural gas, pursuant to Article 8B.1 shall be increased by 5 percentage points from any other wells in the Moulavibazar ring-fenced area of Block 14.

['ঠিকাদার (অক্সিডেন্টাল) মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্রের যে স্তরে ১৫ জুন, ১৯৯৭ ব্লো-আউট সংঘটিত হয়েছিল, যদি সে স্তর থেকে গ্যাস উৎপাদন করে তাহলে চুক্তির ৮বি১ ধারায় যা-ই বলা হোক না কেন, পেট্রোবাংলার লভ্যাংশ ৫ শতাংশ বাড়বে এবং ঠিকাদারের লভ্যাংশের পরিমাণ ৫ শতাংশ কমবে। যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্যাসস্তরে কোনো গ্যাস অবশিষ্ট না থাকে অথবা ওই স্তরে কোনো উন্নয়নকাজ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মৌলভীবাজারের ১৪ নম্বর ব্লক এলাকার অন্য যেকোনো একটি কূপ থেকে পেট্রোবাংলার লভ্যাংশ পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে।']

দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার উদ্দেশ্যে খুব চালাকি করে উপরোল্লিখিত ধারার শব্দাবলি চয়ন করা হয়েছে। ধারাটি মনোযোগ ছাড়া পড়লে মনে হবে পেট্রোবাংলার লভ্যাংশ ৫ শতাংশ বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষতি পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ ধারার নিগূঢ়ার্থ ভিন্ন। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, পেট্রোবাংলার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মাগুরছড়া ব্লো-আউটের ফলে গ্যাসের ক্ষতি হয়েছে ২৪৫.৮৬ বিসিএফ। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে চুক্তির ৪.৬ নম্বর ধারায় গ্যাসের ক্ষতিপূরণের পরিমাণের কোনো উল্লেখ নেই। তার অর্থ হলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্তর থেকে অথবা ১৪ নম্বর ব্লকের যেকোনো একটি কূপ থেকে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ বাড়ানোর ফলে যতটুকু গ্যাস অতিরিক্ত পাওয়া যাবে তা নিয়েই বাংলাদেশের জনগণকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ক্ষতিপূরণের সেই পরিমাণ যদি অকিঞ্চিৎকরও হয় তবু প্রতিবাদের কোনো সুযোগ রাখেনি ১৯৯৭-৯৮ সালের দেশ পরিচালনাকারী সরকার। দেশের স্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের যোগসাজশে কী পন্থায় মাগুরছড়া ব্লো-আউটের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ রুদ্ধ

www.pathagar.com

করা হয়েছে সে কাহিনী জানলে দেশবাসী চমকিত হবেন। সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব সংবলিত মাগুরছড়ার ভাগ্য নির্ধারণকারী সারসংক্ষেপটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীরবিক্রম ২৬-৭-১৯৯৮ তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের কাছে পাঠান। প্রতিমন্ত্রী ১১-৮-১৯৯৮ সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন এবং রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী সম্পূরক চুক্তির প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রেরণ করেন। উপরিউক্ত সারসংক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১১-৯-১৯৯৮ নিম্নোল্লিখিত দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় :

ক. অগ্নিকান্ডে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কী সমঝোতা হয়েছে?

খ. কী পরিমাণ ক্ষতি পূরণ করা হয়েছে?

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলার তদানীন্তন চেয়ারম্যান মো: মোশারফ হোসেন সম্পূরক চুক্তির সমর্থনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে এক দীর্ঘ পত্র পাঠান। পত্রের ২ নম্বর অনুচ্ছেদ পড়লে সহজেই পেট্রোবাংলার স্বার্থ বিসর্জনের পন্থাটি অনুধাবন করা যাবে। পাঠকের জানার স্বার্থে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হলো।

"২। ব্লো-আউটের কারণে প্রজ্বলিত গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অক্সির মতামত যে অন্যান্য দেশের পিএসসি'র ন্যায় বাংলাদেশেও কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের বিধান পিএসসিতে নাই। উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে আলোচ্য গ্যাস মজুদ স্তরের গ্যাসের পরিমাণ ও প্রজ্বলিত গ্যাসের হিসাব নিরূপণ অনুমাননির্ভর। তথাপি পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে প্রজ্বলিত গ্যাসের ক্ষতিপূরণ ভবিষ্যতে একই স্তর হইতে গ্যাস উৎপাদন হইলে পেট্রোবাংলার শেয়ার ৫ শতাংশ বেশি এবং অক্সির শেয়ার সেই পরিমাণ কম প্রদানের বিধান পিএসসিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।"

দেশপ্রেমের কী চমৎকার উদাহরণ রেখেছেন পেট্রোবাংলার তৎকালীন চেয়ারম্যান। সত্যিই তো যেখানে পিএসসিতে ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান রাখা হয়নি সেখানে চেয়ারম্যানের কর্মদক্ষতায় যেটুকু দয়াদাক্ষিণ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতেই তো বাংলাদেশের জনগণের ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত।

মন্ত্রণালয় ১১-১০-১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের পত্রটি সংযুক্ত করে একটি সংক্ষিপ্ত জবাব পাঠায়। চিঠিটিতে বলা হয়, অক্সিডেন্টাল কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক মাগুরছড়া গ্যাস কূপ খননকাজ চলাকালে ব্লো-আউটজনিত অগ্নিকান্ডে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, পরিবার ও ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ক) অক্সিডেন্টাল কোম্পানি এ পর্যন্ত ১৪টি দাবি সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩৮ কোটি ৮ লাখ ৩৯ হাজার ৯৬৫ টাকা পরিশোধ করেছে (সংযুক্তি-ক)।

(খ) ওই কোম্পানি চারটি প্রতিষ্ঠানের দাবি এখনো নিষ্পন্ন করতে পারেনি তবে এ চারটি দাবি নিয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলোচনা চলছে (সংযুক্তি-খ)।

অক্সিডেন্টাল কোম্পানি বিশেষ করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং পরিবেশ ও বন

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ক্ষতিপূরণ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, এতে Supplementary Agreement স্বাক্ষর হলে ওই ক্ষতিপূরণ পরিশোধে প্রভাব ফেলবে না বলে স্পষ্টীকরণ (Clarification) করেছে (সংযুক্তি-গ)।

২। পেট্রোবাংলা থেকে এ বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনটিও এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (সংযুক্তি-ঘ)।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব।

পাঠক লক্ষ্য করুন যে, ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পেট্রোবাংলা এবং অক্সিডেন্টালের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে কি না এ বিষয়টি পত্রে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তদুপরি গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতি এবং সে ক্ষতিপূরণের বিষয়েও মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত জবাবে নীরব থেকেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, এতসব অসঙ্গতি সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সম্পূরক চুক্তির প্রস্তাবে ৫-১১-১৯৯৮ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে মাগুরছড়ার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন। সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এমন সন্দেহ পোষণ করা কি একবারেই অমূলক হবে যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা এই তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পত্র বিনিময় একটি aliby তৈরির প্রচেষ্টামাত্র। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার জন্য সর্বদা সরব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তটি অক্সিডেন্টালের পক্ষে সম্ভবত পূর্বনির্ধারিতই ছিল।

এবার টেংরাটিলার প্রসঙ্গে আসা যাক। নাইকোর সঙ্গে পেট্রোবাংলার চুক্তিপ্রক্রিয়ার দীর্ঘ উপাখ্যান এবং সে উপাখ্যানে প্রথমে আওয়ামী লীগ এবং পরে বিএনপি'র কুশীলবদের ভূমিকা নিয়ে ইতিপূর্বেই দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছি। কাজেই নাইকোর গল্পের পুনরাবৃত্তি না করে সরাসরি ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের (টেংরাটিলা) ব্লো-আউটের ঘটনা বর্ণনা করছি। এখানে প্রথম ব্লো-আউট ঘটে ৭ জানুয়ারি ২০০৫। অগ্নিনির্বাপণ এবং গ্যাস উদ্‌গিরণ বন্ধ করার জন্য নিয়ম অনুযায়ী খুব দ্রুত রিলিফ কূপ খনন করার কথা থাকলেও নাইকো ড্রিলিং রিগ সংগ্রহে প্রায় পাঁচ মাস বিলম্ব করে। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে রিগ সংগৃহীত হয় এবং দুঃখজনকভাবে রিলিফ কূপ খনন করার সময় একই গ্যাসক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ব্লো-আউট সংঘটিত হয় জুন মাসের ২৪ তারিখে। দ্বিতীয় ড্রিলিং রিগ অগ্নিকান্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে সাড়া দিয়ে শেভরন তাদের ভাড়া করা ড্রিলিং রিগ দিয়ে নাইকোকে সহায়তা প্রদান করে। দ্বিতীয় রিলিফ কূপ খননের মাধ্যমে টেংরাটিলায় গ্যাসকূপ বন্ধ এবং অগ্নিনির্বাপণ করা হয় শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে। দুই দফা ব্লো-আউটের ফলে গ্যাসক্ষেত্র এবং পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণের জন্য তৎকালীন জোট সরকার দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে যথাক্রমে ৮ জানুয়ারি ২০০৫ এবং ২৫ জুন, ২০০৫। দুটি কমিটিই সাত সদস্যবিশিষ্ট ছিল এবং কমিটিদ্বয়ের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব এহসানুল ফাতাহ এবং বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম। এ দুই তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ক্ষয়ক্ষতির নিজস্ব মূল্যায়নকে সমন্বয় করে পেট্রোবাংলা নাইকোর কাছে নিম্নোক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে : ০১. ব্লো-আউটের কারণে তাৎক্ষণিক গ্যাস ক্ষতির পরিমাণ ৮.৯০ বিসিএফ। ০২. প্রধান গ্যাসস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্যাস মজুদের সম্ভাব্য

www.pathagar.com

অতিরিক্ত ক্ষতির পরিমাণ ৪৫ বিসিএফ। এবং ০৩. বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরূপিত পরিবেশ এবং এলাকার জনগণের ক্ষতির পরিমাণ ৮৪ কোটি টাকা।

ছাতক গ্যাসক্ষেত্র ব্লো-আউট চলাকালীন চুক্তি অনুযায়ী নাইকো বাংলাদেশে তাদের অপর গ্যাসক্ষেত্র ফেনী থেকে দৈনিক প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করছিল। তৎকালীন সরকার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছাতক ব্লো-আউটের ক্ষতিপূরণের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফেনী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সরবরাহ করা গ্যাসের কোনো মূল্য নাইকোকে দেয়া হবে না এবং প্রয়োজনে এ অর্থ থেকে ক্ষতিপূরণ সমন্বয় করা হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ সে সময় দুর্নীতিমুক্ত থাকার কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো সরকার প্রথমবারের মতো একটি বিদেশী কোম্পানিকে সত্যিকার অর্থে বেকায়দায় ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। জুন, ২০০৫ থেকে শুরু করে অক্টোবর, ২০০৬-এ জোট সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করা পর্যন্ত নাইকোকে ফেনী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সরবরাহ করা গ্যাসের জন্য কোনো মূল্য দেয়া হয়নি। ফলে সরবরাহ করা গ্যাসের মূল্য বাবদ পেট্রোবাংলার কাছে বর্তমানে নাইকোর যে পরিমাণ অর্থ পাওনা রয়েছে তার মাধ্যমেই পেট্রোবাংলার দাবি করা ক্ষতিপূরণ সমন্বয় করা সম্ভব। মাগুরছড়ার সময় প্রায় অদৃশ্য আমাদের অতি দেশপ্রেমিক তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি টেংরাটিলার ক্ষেত্রে অবশ্য অতি মাত্রায় সক্রিয় ছিল। তারা লংমার্চ, মানববন্ধন, কুশপুত্তলিকা পোড়ানো ইত্যাকার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে অথচ সরকারের সৎ ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সমর্থনে কোনোরকম অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তাদের বিবিধ কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে, এদের কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমবিবর্জিত রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতামাত্র। কিছুদিন আগে টেলিভিশনে বর্তমান জ্বালানি উপদেষ্টাকে এ বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য প্রদান করতে দেখেছি। তিনি অবশ্য বলেছেন, নাইকোকে অন্তত কিছু অর্থ প্রদান করা উচিত ছিল। এটি কি তার ব্যক্তিগত মতামত নাকি বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতি এ সম্পর্কে আমি অবহিত নই। তবে আমার বিবেচনায় এ প্রথম বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে কোনোরকম অনৈতিক আপস না করার কারণে গ্যাসক্ষেত্রে ব্লো-আউটজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা গত জোট সরকার তৈরি করতে পেরেছে। বর্তমান সরকারের কাছে এ প্রত্যাশা থাকবে যে, বিদেশী সমর্থন লাভের চেষ্টায় তারা যেন টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্নে কোনো দুর্বলতার পরিচয় না দেন।

জ্বালানি খাত নিয়ে কোনো লেখাই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা ছাড়া সম্পন্ন হবে না। আমাদের দেশের মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা উপাখ্যানও এর ব্যতিক্রম নয়। এ দুই গ্যাসক্ষেত্রের ব্লো-আউটজনিত ক্ষতিপূরণ বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় যেকোনো পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আওয়ামী লীগ সরকার মাগুরছড়ার বিষয়ে অক্সিডেন্টালকে সম্পূর্ণ ছাড় দেয়ার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। এর বিপরীতে টেংরাটিলার ক্ষেত্রে গত জোট সরকার নাইকোর সঙ্গে কোনোরকম আপোস না করার ফলে জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। যদিও অভিযোগ রয়েছে, নাইকোর সঙ্গে পেট্রোবাংলার চুক্তি প্রক্রিয়ায় প্রধানত আওয়ামী লীগ এবং পরে বিএনপি উভয় দলের চিহ্নিত ব্যক্তিরাই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছিল।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণকারী পশ্চিমা দেশগুলো জোট সরকারের এ দুঃসাহসের জন্য দৃশ্যত বিরক্ত ও হতাশ হয়েছে। এসব রাষ্ট্রের কূটনীতিকরা প্রকাশ্যে যে জোট সরকারবিরোধী এবং আওয়ামী লীগের প্রতি নমনীয় অবস্থান নিয়েছে, তার প্রধান কারণ সচেতন পাঠকরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পশ্চিমা বিশ্বের বৈদেশিক নীতি এখন পরিচালিত হচ্ছে কেবল তাদের নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সরকার এবং জনগণকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। বিগত সরকারের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যাপক দুর্নীতি অবশ্য এসব কূটনীতিককে তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল স্বার্থান্বেষী ও নেতিবাচক মিডিয়ার অব্যাহত প্রচারণা। ফলে জ্বালানি খাতে সঠিক ও দৃঢ় অবস্থান নেয়া সত্ত্বেও জোট সরকার সামগ্রিকভাবে তাদের কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে আজকের বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রত্যাশা রইল, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সরকারগুলো এখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২৪.০৩.০৭

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসনের চিত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব্য রক্ষণশীল গোষ্ঠী বা 'নও কন' ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই তারা বিশ্বকে সরাসরি দু'ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা নেয়। প্রকাশ্যে তাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্লোগান হচ্ছে 'আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) পক্ষে অথবা বিপক্ষে'। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করলেই যেকোনো রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসী অ্যাখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের কোনো রকম তোয়াক্কা না করে সে দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর অধিকার তারা সংরক্ষণ করে। নয়-এগারোর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মর্মভেদী অভিজ্ঞতার ফলে মার্কিন জনগণসহ পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীকে এ নতুন সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বুশ প্রশাসনকে খুব একটা বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর নবরূপে খ্রিষ্টীয় ক্রুসেডের লক্ষ্যবস্তুও আগের মতোই এখনো মুসলিম বিশ্ব। নব্য রক্ষণশীলদের এ ক্রুসেডের আদর্শিক গুরুর ভূমিকায় সম্ভবত আছেন মি. স্যামুয়েল পি হান্টিংটন যিনি ১৯৯৩ সালেই তার গ্রন্থ The clash of civilization-এর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে পৃথিবী বিভাজনের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। হান্টিংটনের গ্রন্থ প্রকাশের সময়টিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফা বজায় রাখার জন্য একটি প্রকৃত কিংবা কল্পিত শত্রুর প্রয়োজন ছিল। হান্টিংটন The clash of civilization-এর মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং নব্য রক্ষণশীলদের এ চাহিদা পূরণ করলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম বিশ্ববিরোধী সব অভিযানই খ্রিষ্টীয় এবং ইহুদি মৌলবাদীদের সমন্বয়ে যৌথভাবে পরিচালিত হয়েছে। এবারের পরিকল্পনায় নব্য রক্ষণশীলরা মুসলিম বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ করার জন্য হিন্দু মৌলবাদীদেরও তাদের কার্যক্রমের অংশীদার বানিয়েছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার পরিকল্পনায় মার্কিন-ইন্দো-ইসরাইল একযোগে তাদের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা করবে এবং দুর্বল মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

উপরোল্লিখিত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাক। আয়তনের বিবেচনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার বিচারে আমরা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ শতাংশ মানুষ মুসলিম এবং সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অধিকন্তু, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্মভীরু এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদারমনা হলেও ধর্মীয় আচার পালনকারীর সংখ্যাও এ দেশে দিন দিন বাড়ছে। মাথাপিছু আয়ের বিচারে দেশটি গরিব হলেও সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত উন্নয়নশীল এবং জ্বালানি সম্পদের বিবেচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী। কাজেই মার্কিন-ইন্দো-ইসরাইল পরিকল্পনা যে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হতে পারে না এটি বোঝার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশ্বে যেকোনো

www.pathagar.com

আগ্রাসনই শুরু হয় প্রচারণার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অক্টোবর, ২০০১ সালের নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলেই নব্য রক্ষণশীলদের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান ক্রুসেডের অংশ হিসেবে বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হবে। পাঠকবৃন্দের স্মরণে আছে নিশ্চয়ই যে, ওই নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার বিপুলভাবে জয়লাভ করা মাত্রই একটি বিশেষ গোষ্ঠী সংখ্যালঘু নির্যাতনের অর্ধসত্য এবং কল্পিত কাহিনী দেশ-বিদেশে প্রচার করার মাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার সূত্রপাত করেছিল। এ প্রচারণার অংশ হিসেবে ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল অর্থাৎ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই মি. বারটিল লিন্টনার ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ের প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে A Cocoon of Terror প্রকাশ করে। পুরো নিবন্ধটি যে কতটা মিথ্যাচারে পূর্ণ এবং নগ্নভাবে বাংলাদেশবিরোধী ছিল সেটি বোঝার জন্য ওই লেখার দুটি অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি :

A revolution is taking place in Bangladesh that threatens trouble for the region and beyond if left unchallenged. Islamic fundamentalism, religious intolerance, militant Muslim groups with links to international terrorist groups, a powerful military with ties to the militants, the mushrooming of Islamic schools churning out radical students, middle-class apathy, poverty and lawlessness — all are combining to transform the nation.

(বাংলাদেশে এমন একটি বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, যা নিবৃত করতে না পারলে ওই অঞ্চল এবং বহির্বিশ্বের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। ইসলামি মৌলবাদিতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রে জড়িত বিদ্রোহী মুসলিম গোষ্ঠী, বিদ্রোহীদের সঙ্গে জড়িত শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ব্যাঙের ছাতার মতো দ্রুত বিকাশমান ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জঙ্গি ছাত্ররা, উদাসীন মধ্যবিত্ত সমাজ, দারিদ্র্য এবং অরাজকতা মিলে জাতির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে)।

"In the immediate term, Bangladesh's secular tradition is most at risk from the rise in fundamentalism. Attacks on Hindus, who generally support the staunchly secular Awami League, are increasing. "The intimidation of the minorities, which had begun before the election, became worse afterwards," said The Society for Environment and Human Development, a local non-governmental organization, in a report on the October poll. An Amnesty International report concurred and indicated that members of the BNP-led coalition were responsible. But neighbouring India and Burma- which both have Muslim minorities-are also at risk, while the Western world cannot afford to be complacent either, analysts say."

(মৌলবাদের উত্থানে স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে। ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের সাধারণ সমর্থক হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়ছে। একটি স্থানীয় এনজিও (The Society for Environment and Human Development) অক্টোবর নির্বাচনের ওপর তৈরি এক প্রতিবেদনে লিখেছে যে, 'নির্বাচনের আগে

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ভীতি প্রদর্শন শুরু হয়েছিল সেটি পরে আরো ভয়াবহ হয়েছে।' অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এ অভিমতের সমর্থন রয়েছে এবং ইঙ্গিত করেছে যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরা এ কর্মকান্ডে জড়িত। বিশ্লেষকরা বলছেন, সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্ব এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না।)

মি. লিন্টনার বর্ণিত এ বাংলাদেশকে কি পাঠকবৃন্দ আপনারা চেনেন? একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী এ ব্যক্তিকে কি আপনারা আদৌ একজন সাংবাদিকরূপে বিবেচনা করবেন? পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশেই মি. লিন্টনারের সহযোগীরা বহাল তবিয়তে আছেন এবং চোরের মার বড় গলার মতো তারা আবার নিজেদের দেশপ্রেমিক নাগরিক বলে দাবি করেন।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে অব্যাহতভাবে চলতে থাকা বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা ২০০৪ সালে আরো তীব্র এবং সমন্বিত রূপ গ্রহণ করে। ওই বছর ৫ এপ্রিল জনৈক অরবিন্দ আদিগা (Mr. Arabind Adiga) টাইম ম্যাগাজিনে লিখেন State of Disgrace, ১৫ এপ্রিল এশিয়া টাইমস বাংলাদেশ সম্পর্কে বলে 'the most dysfunctional country in Asia' এবং ১৮ জুন দি ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নিবন্ধটি লিখে তার শিরোনাম ছিল 'Bangladesh : State of Denial.'। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের পত্রপত্রিকা বিশেষত কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা সাংবাদিকতার কোনো রকম নীতি-নৈতিকতার বালাই না রেখে বাংলাদেশ এবং আমাদের দেশের সরকার সম্পর্কে অরুচিকর, নোংরা প্রচারণার তীব্রতা বাড়ায়। দেশের অভ্যন্তরের পত্রপত্রিকাও বহুলাংশে এ আন্তর্জাতিক প্রচারণায় সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। ১১ জুন ২০০৪ সালে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক তার 'ফেইল্ড স্টেট অ্যান্ড বাংলাদেশ' নিবন্ধে অবলীলাক্রমে লিখলেন,

'The way our country has been run in the last 13 years has not helped to strengthen our faith either in our state or in our future. On the contrary it has considerably eroded our faith in both.'

(যেভাবে আমাদের দেশ গত ১৩ বছর ধরে পরিচালিত হয়েছে, তাতে রাষ্ট্র কিংবা ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস শক্তিশালী হয়নি। বরং দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্বাস ক্ষয়িত হয়েছে)।

আশ্চর্য হতে হয় রাষ্ট্রের বিবেক বলে দাবিদার ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বহর দেখে। সরকারের প্রতি বিভিন্ন কারণে যেকোনো নাগরিকের আস্থা কমতেই পারে। কিন্তু কোনো নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা প্রদর্শন করেন, তাহলে সে নাগরিকের রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দেয়ার নৈতিক অধিকার থাকে কি না সে বিচারের ভার পাঠকবৃন্দের ওপরই রইল। মাহফুজ আনামের নিবন্ধ প্রকাশের আগে তার আরেক সহকর্মী মতিউর রহমান ২৭ মে ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় লিখে ফেলেছেন 'বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র?' অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা সমান তালে চলেছে দেশে ও বিদেশে। অথচ এই ২০০৪ সালে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের বিচারে বাংলাদেশ যখন অকার্যকর, সে অর্থবছরেই দেশে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল

www.pathagar.com

তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৬.৩০ শতাংশ। পরে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে অবশ্য আরো উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। একটি অকার্যকর রাষ্ট্রের এতটা অর্থনৈতিক উন্নতি হলে বিশ্বের অনেক নিম্ন আয়ের দেশই ওই ধরনের অকার্যকর রাষ্ট্র হতে চাইবে একথা বোধহয় হলফ করেই বলা যায়।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ অঘোষিত আগ্রাসনের সময় আমাদের দেশের সদাসোচ্চার সুশীল(?) সমাজ বিদেশী স্বার্থে তাদের তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে ঠিকই পরিচালিত করছিলেন। টিআই-এর বিচারে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে যথারীতি শীর্ষস্থান অধিকার করছিল এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ চ্যাপটারের কর্তাব্যক্তিরা ঢাকঢোল পিটিয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের এ অর্জনের কথা দিকে দিকে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টান্যাশনাল, আমার জানা মতে, এ ধরনের দুর্নীতিসূচক সর্বপ্রথম প্রকাশ করে ১৯৯৫ সালে। মি. হান্টিংটন তার সভ্যতার লড়াই লিখেছেন ১৯৯৩ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে ১৯৯১ সালে। প্রেসিডেন্ট বুশ তার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করলেন ২০০১ সালে। এদিকে আবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কিত সূচক প্রকাশও শুরু করেছে ২০০১ সাল থেকেই। সময়গুলো কি একটু বেশি মাত্রায় কাকতালীয় মনে হচ্ছে না? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং তাদের স্থানীয় সহযোগি প্রতিষ্ঠান সিপিডি ক্রমাগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করার জন্য। বিস্ময়ের কথা হলো, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে আর ওই সময়েই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমাগতভাবে অবনমিত হয়েছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক স্ববিরোধিতার তথ্য প্যারাডক্সের উদাহরণ বিশ্বে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সুশীল(?) সমাজ এবং সংবাদ মাধ্যমের যে অংশ গত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় স্থানীয় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বর্তমান সরকারের আমলে তারাই পাদপ্রদীপের একেবারে সম্মুখ কাতারে। বিষয়টি একই সঙ্গে বিস্ময়ের এবং আশংকার। কারণ, পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তারা প্রায়ই মুখ্য উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য এবং দুদকের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মূল্যবান উপদেশ প্রদান করছেন। বিশেষ শ্রেণীর এ বিশেষ ব্যক্তিদের উপদেশ বিতরণ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নাকি অন্য কোনো বিশেষ আন্তর্জাতিক মিশন সফল করার জন্য এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উত্থাপিত হতে পারে।

বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তাদের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা ছাড়া বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসনের স্বরূপটি পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। তবে এসব করিৎকর্মা বিদেশী কূটনীতিবিদদের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণের আগে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের ৪১.১ নম্বর ধারাটি জেনে রাখা প্রয়োজন।

'Vienna Convention of Diplomatic Relations and Optional Protocols Article : 41.1-Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of

www.pathagar.com

all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not interfere in the internal affairs of that State."

(তাদের বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তির অধিকারকে অক্ষুণ্ন রেখে, যেসব ব্যক্তি এ ধরণের বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তি ভোগ করছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অভ্যর্থনাকারী রাষ্ট্রের সব আইন-কানুন মান্য করা। তাদের আরো দায়িত্ব হচ্ছে ওই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা)।

উপরোল্লিখিত আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে চাপ প্রদান করার জন্য টুইস-ডে গ্রুপ নামক একটি সংঘ কি তৈরি করতে পারেন? কিংবা একটি রাষ্ট্রের নির্বাচন বন্ধ করার জন্য কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি কি ভিয়েনা কনভেনশন তাদের প্রদান করেছে? অথবা সে রাষ্ট্রে নির্বাচন হবে কি না, হলেও কখন হবে ইত্যাকার বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলার অধিকার বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা ভিয়েনা কনভেনশনের কোথায় পেলেন? আমাদের দেশে নিযুক্ত কিছু কিছু বিশেষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা ভিয়েনা কনভেশনকে মান্য করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। মুশকিল হচ্ছে বাংলাদেশের মিডিয়াও এসব রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যকে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বক্তব্যের চেয়েও অধিক মূল্য প্রদান করে। মিডিয়ার কর্তাব্যক্তিদের বোধহয় স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, এ রাষ্ট্রদূতদের অধিকাংশেরই পদমর্যাদা যুগ্ম সচিব স্তরের। যাহোক আমাদের এ দৃশ্যমান, দুঃখজনক হীনম্মন্যতা জাতি হিসেবে এক নিদারুণ ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এ পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, বাংলাদেশের নির্বাচন বন্ধ করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব এতটা উদগ্রীব কেন ছিল? বিশেষত, বুশ ডকট্রিন যেখানে মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের জন্য অতীব উৎসাহী। এ প্রশ্নের সঠিক জবাব হয়তো আমার অজানা। তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্যালেস্টাইনে হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহর বিজয় এবং ইরাকে শিয়ারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে বুশ প্রশাসনের ঘোষিত মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার উৎসাহে সম্প্রতি দৃশ্যতই ভাটা পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অপছন্দ হলেও বাংলাদেশ যে মুসলিম বিশ্বেরই একটি অংশ এ সত্যটি আমরা যেমন ভুলতে পারি না তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কখনো ভোলে না।

বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসনে আমাদের প্রতিবেশী এবং আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই এ নিবন্ধের ইতি টানব। প্রচারণার যুদ্ধে ভারতের মিডিয়ার অতিআক্রমণাত্মক রূপ আমরা ২০০১ সাল থেকেই প্রত্যক্ষ করছি। বিস্ময়ের ব্যাপার বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এ আক্রমণে এতটুকু ভাটা পড়েনি। আক্রমণের ধরণ পাল্টেছে মাত্র। ২১ মার্চ কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় অত্যন্ত আক্রমণাত্মক এবং আমাদের সার্বভৌমত্ব ও সেনাবাহিনীর প্রতি অতীব অবমাননাকর একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে "অস্ত্র কিনতে দাউদের সঙ্গে 'ডিল' করেন খালেদা-পুত্র"। আমাদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদের তিনটি অংশ উদ্ধৃত করলে পাঠকরা ওই সংবাদে বাংলাদেশের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি এবং অবজ্ঞা দুটোই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

১. শুধু তারেকের গ্রেফতারের ঘটনাই নয়, সার্বিকভাবে বাংলাদেশে তদারকি সরকারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর দুর্নীতি দমন অভিযানে খুশি সাউথ ব্লক। ওয়াকিবহাল শিবিরের বক্তব্য, ভারত যেটি চাইছিল প্রকারান্তরে সেটিই ঘটছে বাংলাদেশে।

২. কূটনৈতিক সূত্রের খবর, বাংলাদেশের সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ চাইছেন নয়াদিল্লি এসে ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে। কিন্তু সেনাপ্রধানকে বাড়তি গুরুত্ব দেয়া হবে কি না, সে বিষয়ে অবশ্য এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

৩. উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণনের সংগে ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছেন। অন্য কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনোভাবেই নাক গলাতে চায় না ভারত। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয় স্বতন্ত্র।

এ অপমানজনক সংবাদে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া হতাশাব্যঞ্জক। তীব্র প্রতিবাদের পরিবর্তে আমাদের এক উপদেষ্টাকে টেলিভিশনে বলতে শুনলাম, বর্তমান সরকার নাকি সংবাদে প্রদত্ত অভিযোগের তদন্ত করবে। দুঃখিত হলাম এ ভেবে, রাষ্ট্রের অতিসংবেদনশীল বিষয় নিয়ে তদন্ত করার জন্যও আমাদের এখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মতো একটি বিদ্বেষপূর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক পত্রিকার ওপর নির্ভর করতে হবে। দীর্ঘদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম, শেরে বাংলা ফজলুল হক একবার নাকি তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের বলেছিলেন 'যতদিন আনন্দবাজার পত্রিকা তার বিরুদ্ধে লিখবে ততদিন বুঝতে হবে যে, তিনি সঠিক পথে আছেন'। শেরে বাংলার এ মন্তব্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান নীতিনির্ধারকদের কাছে বিনীত আবেদন রাখব, তারা যেন দেশের সম্মান এবং সার্বভৌমত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি না করতে পারলে এক সময় জাতিকে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে এসব প্রচারণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করে এদেশে হস্তক্ষেপের একটি সুযোগ সৃষ্টি করা। সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরকারি বিজ্ঞাপনের কিছু অংশে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করছি। এতে সম্ভবত বলা হয়েছে যে, 'আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা অপরাধীদের অভয়ারণ্য হতে দিতে পারি না'। পাঠকরা একটু বিবেচনা করে দেখুন যে, বিজ্ঞাপনের এ আপত্তিজনক ভাষার মাধ্যমে প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক তথ্য-সন্ত্রাসের 'অকার্যকর রাষ্ট্র' বিষয়ক অভিযোগকেই আমরা সম্ভবত স্বীকৃতি দিচ্ছি। স্বাধীনতার মহান মাসে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং তাদের এদেশীয় এজেন্টদের সম্পর্কে সরকার এবং জনগণ উভয়কেই সতর্ক থাকার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেশরক্ষায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

৩১.০৩.০৭

www.pathagar.com

দেশে-বিদেশে জাতির পিতা

লেখার শিরোনাম দেখে পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই কঠিন সময়ে আমার অবিমৃশ্যকারিতার বহরে চমকিত হচ্ছেন। শুভানুধ্যায়ীরা কিছু দিন ধরেই আমার লেখালেখির পরিণতি নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যেই রয়েছেন। অহর্নিশ তারা চাপ প্রয়োগ করছেন আমার এ নব্যবুদ্ধিজীবী সাজার অক্ষম প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য। আর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য হলো, সময় কাটানোর জন্য একান্ত লিখতেই যদি হয় তাহলে বিতর্কিত তাবৎ বিষয় বাদ দিয়ে সাধুসন্তগোছের লেখা লিখতে হবে। কী করে তাদের বুঝাই যে অনিশ্চিত সময়ই তো সত্য প্রকাশের প্রকৃষ্ট সময় এবং দুর্বল ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দেয়া ব্যক্তির সংখ্যা কমই হয়ে থাকে। যদিও টের পাচ্ছি স্বার্থান্বেষী মহল অধিকতর ক্রিয়াশীল হচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ঈশানকোণে মেঘও বেশ কালো করেই জমতে শুরু করেছে। এর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আমি বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিখ্যাত পংক্তি 'দাঁড়ি মুখে শারি গান লা শারিক আল্লাহ্' থেকে সাহস নেয়ার চেষ্টা করছি। যা-ই হোক এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন উ আহমেদের জাতির পিতা সংক্রান্ত একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য দেশের সর্বমহলে চিত্তাকর্ষক আলোচনার সূত্রপাত করেছে। আজ পর্যন্ত কোনো দায়িত্বরত সেনাপ্রধান এ অতি স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল বিষয়ে মিডিয়ার সম্মুখে বক্তব্য প্রদানের সাহস প্রদর্শন করতে পারেননি। জেনারেল মইন এ বক্তব্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন চারিত্রিক দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছেন অন্যদিকে তার রাজনৈতিক দর্শনের চিত্রটি অত্যন্ত স্বচ্ছতার সংগে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। এ সাহসিকতাপূর্ণ এবং পরিষ্কার বক্তব্যের জন্য জনাব আহমেদ প্রায় প্রতিদিনই সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছেন। তবে দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিয়ে বিভাজনের জন্য শুধু রাজনীতিবিদদের এককভাবে দায়ী করা প্রসঙ্গে বরেণ্য সাংবাদিক জনাব আতাউস সামাদ বিবিসি'র কাছে আরো একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ২৭ মার্চ রাতে বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে জনাব সামাদ বলেছেন, 'আমি মনে করি বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উনি অত্যন্ত সাহস করে কথাটি বলেছেন। এর আগে যখন জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কী ভাবেন? তখন তিনি বলেন, দেখুন আমরা কে কী ভাবি তাতে কিছু আসে-যায় না। কারণ বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে যে স্থান করে নিয়েছেন সেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে পারবে না। তদসত্ত্বেও তিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এ স্বীকৃতি দিতে পারেননি। কারণ তখন দেশের সাধারণ লোকের চেয়ে সামরিক বাহিনী ছিল বিভক্ত। এখন যে জেনারেল মইন এ কথা বললেন, আমরা আশা করব যে, সামরিক বাহিনী এ প্রশ্নে এখন ঐক্যবদ্ধ আছে এবং এখন বেসামরিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে একটি ঐকমত্যে আসা উচিত।' অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের সংগ্রামে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার সদিচ্ছাপ্রসূত বক্তব্যের জন্য লে. জেনারেল মইন উ আহমেদ ও আতাউস সামাদ দুজনই দেশবাসীর কাছ থেকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ দুটোই দাবি করতে পারেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে – জাতির পিতা প্রসঙ্গটি নিয়ে দেশে বিভাজন ও বিতর্ক দুটোই রয়েছে এবং জেনারেল মইনের বক্তব্যেও এ বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে। এ বিতর্কের কেন্দ্রে যেতে হলে আমাদের জানতে হবে যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানসূচক 'জাতির পিতা' উপাধিটি কবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় আমাদের পবিত্র সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে কেমন করেই বা এর বিয়োজন ঘটল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে দলিলটি আমাদের দেখতে হবে তা হলো, মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নাম তিনবার উচ্চারিত হয়েছে এবং পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে ঘোষণাপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট তিনটি ধারা উদ্ধৃত করলাম :

১। যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

২। সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তৎদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতঃপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতার দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম এবং

৩। এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং ...

সুতরাং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কোথাও সম্মানসূচক 'জাতির পিতা' উপাধিটি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আইনজীবী নই তবু এ নিবন্ধের স্বার্থে বাংলাদেশের সংবিধান অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পড়ার চেষ্টা করেছি। সংবিধান নিয়ে সীমিত পর্যায়ে গবেষণায় 'জাতির জনক' উপাধিটি আমি সর্বপ্রথম এবং শুধু পাচ্ছি বহুল আলোচিত ও বহু নিন্দিত এবং জনগণের জন্য চরম নিপীড়নমূলক চতুর্থ সংশোধনীতে (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫)। সংবিধান বোঝার ক্ষেত্রে আমার ভুল হতে পারে এবং কোনো বিশিষ্ট আইন-বিশেষজ্ঞ যদি আমার ভুলটি ধরিয়ে দেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ হব। যা হোক আমার জানা মতে চতুর্থ সংশোধনী অর্থাৎ যার মাধ্যমে দেশে সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছিল, সেই সংশোধনীর ৩৪ নম্বর ধারা সাংবিধানিকভাবে প্রথমবারের মতো নিম্নলিখিতভাবে মরহুম শেখ মুজিবকে 'জাতির পিতা' উপাধিতে সম্বোধিত করেছিল :

৩৪। রাষ্ট্রপতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান। সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকিবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য

www.pathagar.com

হইবে :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রবর্তন হইতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকিবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

এবার সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে স্বাধীনতা ঘোষণার চার বছর পর এবং মরহুম শেখ মুজিবের পাকিস্তানি কারাগার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পর স্বাধীনতা সংগ্রামের এ অবিসংবাদিত নেতার আবার নতুন উপাধির প্রয়োজন হলো কেন? ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো নেতা কিংবা সরকারের জনসমর্থনে ভাটা পড়ে তখনই তাদের বিভিন্ন ধরণের চমকের প্রয়োজন হয়। ১৯৭৫-এর বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ '৭৪-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দুঃসহ যাতনা এবং তৎকালীন সরকারের গঠিত রক্ষীবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মরহুম শেখ মুজিবকে দেবতুল্য উচ্চতায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন নীতিনির্ধারক এবং স্তাবকবৃন্দ। এ তাৎক্ষণিক এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনারই ফসল ছিল এক নতুন উপাধির সাংবিধানিক স্বীকৃতি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এ স্বীকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ ঐতিহাসিক সিপাহি-জনতা বিপ্লবের পরের দিন ৮ নভেম্বর এক সামরিক ফরমানের (Proclamation) মাধ্যমে তৎকালীন সামরিক সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ষষ্ঠ-ক ভাগ (Part VI-A) বিলুপ্ত করে এবং সে সংগে সংবিধান থেকে 'জাতির পিতা' উপাধিরও সমাপ্তি ঘটে। ওই সামরিক ফরমানটি ইংরেজিতে লিখিত ছিল এবং ফরমানের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি :

'Now therefore, I, Mr. Justice Abusadat Mohammad Sayem, President of Bangladesh, do hereby assume the powers of Chief Martial Law Administrator and appoint the Chief of Army Staff, Major General Ziaur Rahaman, B.U.Psc, the Chief of Naval Staff, Commodore M.H. Khan, P.S.N.B.N and the Chief of Air staffs Vice-Marshal M.G.Tawab, S.J.,S.Bt.PSA. BAF. as Deputy Chief Martial Law Administrators and declare that .....

(g) Part VI A of the Constitution shall stand omitted;

সময়ের হিসেবে মরহুম শেখ মুজিব সাংবিধানিকভাবে দশ মাসেরও কম সময় মাত্র জাতির পিতা ছিলেন। ১৯৭৫ সালের সামরিক সরকার যেহেতু জাতির পিতা সংবলিত ধারাটি সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করেছিল, কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে জনাব আতাউস সামাদ বিবিসিকে প্রদত্ত তার সাক্ষাৎকারে ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রণীত সব ফরমান (Proclamation) এবং সামরিক আইন প্রবিধান ও আদেশকে (Martial Law

www.pathagar.com

Regulations and Orders) বৈধতা প্রদান করার পর মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে সাংবিধানিকভাবে জাতির পিতা নামে অভিহিত করার আর কোনো সুযোগ অবশিষ্ট রয়েছে বলে আমার মতো সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মনে হচ্ছে না। এমতাবস্থায় নবরূপে তাকে জাতির পিতার স্বীকৃতি দিতে হলে সম্ভবত একটি সামরিক ফরমান জারি করে পরবর্তী সংসদে আবার একটি সংশোধনী দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। আমাদের সংবিধান বহুবার কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। কাজেই সেখানে আর একবার হাত দিলে এমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে – মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কোন্ জাতির পিতা হবেন?

আমার প্রশ্নে পাঠকরা বিস্মিত কিংবা চমকিত হবেন না। আবেগবিবর্জিতভাবে বিচার করলে প্রকৃতপক্ষেই এটি একটি কঠিন সমস্যা। বাংলাদেশের রাজনীতিসহ সমাজের প্রতিটি অংশে সুস্পষ্টভাবে দুটি ধারা বহমান। বাঙালি এবং বাংলাদেশী। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং উত্তরাধিকারের দাবিদার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনো বাংলাদেশী জাতিসত্তাকে মেনে নেয়নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সব নেতাকর্মী, তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী মহল, সংস্কৃতি কর্মীসহ সবাই বাঙালিত্বে বিলীন হয়ে আছেন। তাদের চিন্তা-চেতনায় বাংলাদেশ সর্বদাই উপেক্ষিত, বলতে গেলে অস্তিত্বহীন। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাঙালিপ্রেমী টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ শুনলেই বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজেই সম্ভব হবে। এখানে এ রকম একটি সংবাদের উদাহরণ দেয়া বোধ হয় খুব বেশি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ক'দিন আগে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের গ্রুপ পর্বের খেলায় বারমুডার বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের বিবরণী দিচ্ছিলেন পার্থ তানভীর নাভেদ নামে একজন। প্রায় মিনিট পাঁচেকের বিবরণীতে তিনি বার দশেক বললেন বাঙালির গৌরবজনক বিজয়ের কথা। একটিবারের জন্যও বাংলাদেশ শব্দটি উচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। সংবাদের শেষে এক বিচিত্র নামে ডাকলেন নিজ মাতৃভূমিকে। তার ভাষায় বাংলাদেশ হয়ে গেল বাংলা নামের দেশ। এ ধরনের ব্যক্তিদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুললে আবার বর্তমান সরকারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সুশীল(?) সমাজের দিক্‌পালরা প্রশ্নকর্তাকে শূলে চড়ানোর জন্য ধেয়ে আসবেন। কাজেই যেকোনো মূল্যে এরা যে মরহুম শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতির পিতাই বানাতে চাইবেন – এ বিষয়ে তর্কের খুব একটি অবকাশ নেই। বিবিসি'র জরিপে শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হলেও তাকে একেবারে হাজার হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির পিতা বানানোর প্রচেষ্টা নিলে বিশুদ্ধবাদিরা অতিশয় বিরক্ত বোধ করবেন এতেও কোনো সন্দেহ নেই। তদুপরি বাঙালি জাতির একটি বৃহৎ অংশ আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের নাগরিক এবং পশ্চিম বাংলার অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের উন্নাসিক ব্রাহ্মণসমাজ একজন বিধর্মীকে পিতা মানতে চাইবেন কি না তাও নিশ্চিত নয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঢাকায় সফরে এসে তার বিভিন্ন বক্তৃতায় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করার সময় তার সম্পর্কে কখনো বাঙালি জাতির পিতাসুলভ কোনো সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এমন উদাহরণ স্মরণে আসছে না। এমতাবস্থায়, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে সর্বপ্রথমে ভারত সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে

www.pathagar.com

একটি রেফারেন্ডাম করা হলে, এবং সে রেফারেন্ডামে যদি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতির পিতা রূপে স্বীকার করেন তাহলে হয়তো এ সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে।

জাতির পিতা বিষয়ক সমস্যার আরেকটি সমাধান অবশ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই হতে পারে। আর তা হলো – মরহুম শেখ মুজিবকে বাংলাদেশী জাতির পিতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। কিন্তু পাঠকবৃন্দ আজ এ সমাধান গ্রহণ করলে আর একজন মহান ও মরহুম নেতার অবদানকে সম্ভবত অস্বীকার করা হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সততাপরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক, মহান মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন অকুতোভয় সেনাপতি মরহুম জিয়াউর রহমান। এ মহান নেতার পরিবার হয়তো তার সততার আদর্শের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি, তবে সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সদ্যস্বাধীন অতি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আয়তনের দেশের নাগরিকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে পেরেছিলেন। সেদিন থেকে অদ্যাবধি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বিদ্রূপ করে এসেছে। আজকে হঠাৎ করে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মরহুম শেখ মুজিবকে বাংলাদেশী জাতির পিতা ঘোষণা করা হলে নিঃসন্দেহে মরহুম জিয়ার আদর্শের অনুসারীরা ব্যথিত হবেন। তার পরও ধরে নিলাম দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক বিশাল জনগোষ্ঠী উদারতার পরিচয় দিয়ে সরকারের এ জাতীয় পদক্ষেপকে সমর্থন করলেন। এর বিনিময়ে শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ কি তাদের অতি বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃতি প্রদান করবেন? সততার প্রতিকৃতি মুক্তিযুদ্ধের এক অকুতোভয় সেনানি যাকে শেখ হাসিনা সর্বদা এক অখ্যাত মেজর বলে অবজ্ঞা করে এসেছেন সে শহীদ জিয়ার দর্শনকে তিনি গ্রহণ করতে পারলে অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজন দূরীভূত হবে। তবে এতখানি আশাবাদী হওয়া বাস্তবভিত্তিক হচ্ছে কি না সে প্রশ্ন থেকেই যাবে। অবশ্য মরহুম শেখ মুজিবের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সব রাজনৈতিক মহল একমত পোষণ করলে অন্য একটি সমাধান গ্রহণ করা যেতে পারে। আর তা হলো জাতির পিতার পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অবিসংবাদিত নেতাকে 'রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। যা-ই হোক, আমি আশা করছি, এত বছর পর এ বিতর্কিত অধ্যায় উত্থাপনের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সরকারের শীর্ষ মহল নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রাহ্য একটি সমাধানের রূপরেখা তৈরি করেই রেখেছেন। এখন সরকারের উচিত হবে রূপরেখাটি জনগণের কাছে প্রকাশ করে আর কালবিলম্ব ব্যতীত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করা। এ ধরনের একটি সংবেদনশীল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি রাজনৈতিক সরকারের কাছ থেকে আসাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন এ সংক্রান্ত গৃহীত কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকার বাতিল করে, সেটি কারো জন্যই কাম্য হতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা

www.pathagar.com

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য তো নয়ই।

এবার জাতির পিতা জাতীয় সম্মান পৃথিবীর আর কোন্ কোন্ দেশে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করলে আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে পাঠকবৃন্দের মনস্থির করতে সুবিধা হবে। আমার জানা মতে জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশে সরকারিভাবে জাতির পিতা স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে আবার দুটো দেশই এ উপমহাদেশে। উপমহাদেশের ভারত ও পাকিস্তানের জাতির পিতা হলেন যথাক্রমে মহাত্মা গান্ধী ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। তুরস্ক হচ্ছে উপমহাদেশের বাইরের একমাত্র দেশ যেখানে একজন জাতির পিতা আছেন। ১৯৩৪ সালের ২৪ নভেম্বর তুরস্কের জাতীয় সংসদে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মুস্তাফা কামালকে আতাতুর্ক উপাধি প্রদানের মাধ্যমে জাতির পিতার সম্মান প্রদান করা হয়। ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্ক – এ তিন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে সার্কের নতুন সদস্য আফগানিস্তান। ২০০৩ সালে প্রণীত এক খসড়া সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তির সামরিক অভিযানের মাধ্যমে গঠিত হামিদ কারজাই সরকার অনেকটা আকস্মিকভাবে বহু আগে ক্ষমতাচ্যুত এবং নির্বাসিত রাজা জহির শাহকে জাতির পিতার স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য বিদেশী দখলদারিত্বমুক্ত আফগানিস্তানের জনগণ এবং সরকার রাজা জহির শাহকে প্রদত্ত বর্তমান সম্মান বজায় রাখবে কি না সে বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সরকারের সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কখনোই স্থায়িত্ব পায়নি। আফগানিস্তানেও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কয়েকটি দেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত না হলেও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু মরহুম নেতাকে পিতৃতুল্য নেতার সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, মেক্সিকোর মিগুয়েল হিদালগো, বলিভিয়ার সিমন বলিভার এবং মিয়ানমারের উ আং সান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহান ব্যক্তিত্ব কখনো দক্ষিণ আফ্রিকার জাতির পিতা উপাধি গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেননি। অথচ দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয়তার নিরিখে নেলসন ম্যান্ডেলা সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়মাপের রাষ্ট্রনায়ক। কোনো রকম রাষ্ট্রীয় পদ-পদবি ব্যতীতই প্রয়োজনে এই ৮৯ বছর বয়সেও তিনি সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই ইতিহাসই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এক অবিভাজ্য সত্তা। সচেতন পাঠকের হয়তো নজর এড়ায়নি যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতির পিতাদের নিয়ে আলোচনায় আমি সাবেক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বকে বাইরে রেখেছি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের মূর্তির অবমাননা এবং চীনে প্রয়াত মাও জে দং ও তার পরিবারের পরিণতি দেখার পর এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা সম্ভবত নিস্প্রয়োজন।

অনেক পাঠকই এতক্ষণে পৃথিবীতে শুধু এ উপমহাদেশেই জাতির পিতার আধিক্য দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হচ্ছেন। এ বিষয়ে আমার মতো অতিকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির একটি বিশ্লেষণ আছে, যার সঙ্গে অনেকেই হয়তো দ্বিমত পোষণ করবেন। দীর্ঘ ২০০ বছরের

www.pathagar.com

পরাধীনতা উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে মানসিকভাবে একধরনের দাসশ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং সে কারণেই আমরা ব্যক্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। খেয়াল করলেই নজরে পড়বে যে, সম্মান প্রদর্শন এবং পূজার মধ্যে যে পার্থক্যটি রয়েছে সেটি উপলব্ধি করতে আমরা ব্যক্তিজীবনেও প্রায়ই ব্যর্থ হই। এ দাস-মানসিকতার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে উপমহাদেশের ঐতিহাসিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। উপমহাদেশের হিন্দুদের একজন জাতির পিতা থাকলে অতি অবশ্যই মুসলমানেরও জাতির পিতা লাগবে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জাতির পিতা থাকলে বাংলাদেশই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এ সবই হচ্ছে কূপমন্ডূক রাজনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও যদি আমরা এ কূপমন্ডুকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যৎপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি মিলবে কী করে? দাবি করা হচ্ছে, বর্তমান সরকার একটি সংস্কারবাদী সরকার। যদি তা-ই হয় তাহলে আজকের প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা-বিষয়ক বিতর্কের চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতি উচ্ছেদ বিষয়ক বিতর্কই কি অধিকতর কাম্য নয়? আমাদের সংবিধানের চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনী ইতিহাসের একটি অধ্যায় এবং এ অধ্যায়ের বিচারের ভার না হয় ইতিহাসের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

০৫.০৪.০৭

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সুশাসন ও মার্কিন পুরস্কার

বিগত বছর দশেক ধরে বাংলাদেশে সুশাসন শব্দটি খুব বেশি করে উচ্চারিত হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারির আগে পর্যন্ত সেমিনারজীবীগণ সুশাসনকে উপজীব্য করে প্রতি সপ্তাহে গড়ে অন্তত একটি করে অনুষ্ঠান করেছেন এবং এসব সেমিনারের বিবরণ টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা নিয়মিতভাবেই পেয়েছি। সুশাসনবিষয়ক সেমিনারের এত আধিক্যের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের সুশীল(?) সমাজের বিদেশী অন্ন-দাতারা সুশাসন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, গবেষণা, সেমিনার ইত্যাদিতে বেশ মুক্ত হস্তে দান-দক্ষিণা করে থাকেন। এত প্রচারণার পরও আমার কাছে মনে হয়েছে, সুশাসন এখন পর্যন্ত একটি স্লোগানেই আবদ্ধ হয়ে আছে। যে যার মতো করে সুশাসনকে দেখছেন ও বর্ণনা করছেন এবং এ সুশাসনের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যথেষ্ট বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। বিগত ১৫ বছর বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বাধীন সরকারই ক্ষমতায় ছিল এবং তারাও সুশাসন বিষয়ে জনগণকে সচেতন কিংবা সম্পৃক্ত করার কোনো উদ্যোগ নেননি। তাদের এ ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যর্থতার ফলে সুশাসনকে উপজীব্য করে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং বিদেশী শক্তি তাদের স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় উদ্দেশ্য পূরণে আপাতত সক্ষম হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনা প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি মিশ্রণ। বাস্তবতা হচ্ছে, সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার প্রধান অংশ হলেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীও রাষ্ট্র পরিচালনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, আমলা, সামরিক বাহিনী, এনজিও, সংবাদমাধ্যমভুক্ত প্রভাবশালী মহল, সুশীল সমাজ(?), বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ এবং সর্বোপরি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেছে। সুশাসন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাবকে পুঁজি করেই যে যার মতো করে জনগণকেও ব্যবহার করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দেশে নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ মহলে বির্তক থাকলেও এর লক্ষ্য সম্পর্কে সবাই মোটামুটি একমত। সাধারণভাবে একটি রাষ্ট্রে যথাযথ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করাই সুশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রথমেই আইনের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আইনের শাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। আমাদের দুর্ভাগ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দলবাজির নিকৃষ্ট রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের বিচারালয়সমূহে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন দল প্রধান বিচারপতির

www.pathagar.com

মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করেই দলীয় বিবেচনায় উচ্চ আদালতে নিম্নমানের বিচারক নিয়োগ করে আদালতের মানের অবনমন ঘটিয়েছেন। আবার অন্যদিকে বিরোধী দলের আইনজীবীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে গাড়ি ভাঙচুর করেই ক্ষান্ত হননি, এরা প্রধান বিচারপতির কক্ষে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছেন। বর্ষীয়ান আইনজীবী নেতৃবৃন্দের বর্বর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলকে পর্যন্ত প্রাণভয়ে আদালত ভবনে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে দীর্ঘক্ষণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল ক্ষেত্রটি এভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে আইনের শাসনের আর কিছু সম্ভবত অবশিষ্ট থাকে না। একটি দেশের আইনের সর্বোচ্চ উৎসস্থল সংবিধানকে যখন আইনজীবীরাই তুচ্ছজ্ঞান করে সংবিধান লংঘনের জন্য জনগণকে প্ররোচিত করেন, তখন সুশাসন নিয়ে যেকোনো আলোচনাই নিরর্থক হয়ে পড়ে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়েছে আইনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একজন পশ্চিমা কূটনীতিক আমাকে একবার বলেছিলেন, পৃথিবীতে নাকি সবচেয়ে innovative আইনজীবীরা বাংলাদেশেই বসবাস করেন। টেলিভিশনের বিভিন্ন টকশোতে বিশালকায় সব আইনজীবীদের সংবিধান ব্যবচ্ছেদের বহর দেখলে যে কেউ পশ্চিমা কূটনীতিকদের প্রশংসার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন।

এবার দুর্নীতি প্রসঙ্গ। বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রসার এক দিনে ঘটেনি। স্বাধীনতার পরবর্তী কম্বল চুরি এখন এসে ঠেকেছে টিন চুরিতে। মাঝখানে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ দুর্নীতিকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে গেছেন। জ্বালানি, বিদেশী বিনিয়োগ থেকে শুরু করে একেবারে তুচ্ছ চিনি আমদানির লাইসেন্স পর্যন্ত, কিছুই তার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের বাইরে ছিল না। স্বৈরশাসন পতনের পর নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রের নবযাত্রায় এ কালের রাজনীতিবিদদের ওপর দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণ যে আস্থা স্থাপন করেছিল, জাতীয় নেতৃবৃন্দ অবশ্যই সে আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি। এটা ঠিক, গত ১৫-১৬ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০০ ডলারের কাছাকাছি মাথাপিছু আয় আজ ৫০০ ডলার অতিক্রম করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই সময়পরিধিতে দুর্নীতির কারণে জাতীয় সম্পদের অপচয়ের পরিমাণও বহুলাংশে বেড়ে গেছে। গত ১৫ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যেমন জনগণের প্রশংসা দাবি করতে পারেন। আবার একইভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতার দায়ভারও নিতে হবে তাদেরকেই। বর্তমান আইন উপদেষ্টা ক'দিন আগে এক বক্তব্যে পরিষ্কার করেই বললেন, বর্তমান রাজনীতিশূন্য অবস্থার দায়দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে। তার মন্তব্যের সাথে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তবে বিস্ময় লাগে এটি লক্ষ্য করে যে, বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার নিন্দায় যত তৎপর থাকেন, রাজনীতিবিদদের সাফল্য স্বীকারে ততটাই কৃপণতা প্রদর্শন করেন। আমার স্মরণে আসছে না যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অথবা অর্থ উপদেষ্টা যারা বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময় যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং এসইসি'র চেয়ারম্যান ছিলেন, তারা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর কখনো বিগত সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে এ ধরণের আচরণ প্রত্যাশিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে তো একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন। তাদের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় জনগণ সত্য কথন প্রত্যাশা করে। কথা ও আচরণে সব রকম হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত থাকলে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে বৈ কমবে না। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ ক'দিন আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য দেয়ার সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বর্তমান শাসকদের অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জেনারেল মইন বর্ণিত সাফল্যের বেশিরভাগই অর্জিত হয়েছে বিগত ১৫ বছরের গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত শাসনামলে।

ক্ষমতার অপব্যবহারবিষয়ক আলোচনা ব্যতীত সুশাসনের প্রকৃত রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না। আমজনতার কাছে এ প্রশ্ন যদি করা যায় যে, ক্ষমতার অপব্যবহার কারা করেন; তবে তার উত্তরে নিশ্চয়ই ত্বরিত জবাব আসবে– সরকারে যারা থাকেন তারাই করেন। কিন্তু বিষয়টি অত সরল নয়। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ক্ষমতা যাদের আছে তারাই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং একটি দেশে সরকারের বাইরে যারা আছেন তাদেরও প্রচুর ক্ষমতা থাকে। বাংলাদেশের বিগত ছয় মাসের ঘটনা প্রবাহের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা সরকারবহির্ভূত ক্ষমতার অপব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাব। গত বছর ২৮ ও ২৯ অক্টোবর এ দুই দিন ঢাকার রাজপথে বর্বর কায়দায় লাঠি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহারের নির্মম উদাহরণ হয়ে রইবে বহুকাল। অবরোধের নামে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন বধ করার অপচেষ্টা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের আরেকটি ঘৃণ্য এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য উদাহরণ। সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে নাশকতামূলক কার্যকলাপ একটি পেশাজীবী সংগঠনের ক্ষমতার অপব্যবহারের নিদর্শন। বর্তমান বছরে এক-এগারোর পরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত, কল্পনাশ্রয়ী সংবাদ প্রকাশ করে যে অনৈতিক মিডিয়া ট্রায়াল করা হয়েছে-হচ্ছে, তা সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। নিষিদ্ধ ও উগ্র ধর্মীয় সংগঠন জেএমবি ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট একসাথে সারাদেশে বোমাবাজির মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের নিকৃষ্ট রূপ প্রদর্শন করে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে। কাজেই যখন আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার কথা বলব, তখন সরকার ও সরকারবহির্ভূত উভয় প্রকার ক্ষমতার অপব্যবহারকেই সেই আইনের আওতাভুক্ত করতে হবে। গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখার কোনো অর্থ হয় না। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলো ঐতিহাসিকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – ০১. রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, ০২. নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ০৩. সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল পরিচালনা, ০৪. আমলাতন্ত্রের অপেশাদারিত্ব, ০৫. আমলাতন্ত্রের দলীয়করণ এবং ০৬. নেতিবাচক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদমাধ্যম।

www.pathagar.com

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেকোনো সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এবং বিষয়গুলো আমলে না নিয়ে কেবল রাজনীতিবিদদের সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তাত্ত্বিক আলোচনা শেষে এবার কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যাক। প্রশ্নটি হলো ২০০৭ সালের এক-এগারোর পর বাংলাদেশে সুশাসন কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সংবাদমাধ্যমের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভয়ে অথবা নির্ভয়ে বলছেন হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহারে সব সময় অভ্যস্ত বাংলাদেশে অবস্থিত পশ্চিমা কূটনীতিকরাও বলছেন হয়েছে। সম্প্রতি এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশসংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে তাদের বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি হুয়া দু জোরের সাথেই বলেছেন, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা বেড়েছে। সরকার অবশ্য এ পর্যন্ত নিজ থেকে এ জাতীয় কোনো দাবি করেছেন এমন কোনো তথ্য অন্তত আমার নজরে আসেনি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, সুশাসন এখনো প্রতিষ্ঠা হয়নি। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার একটি সুযোগ অবশ্যই তৈরি হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, সুশাসনের প্রধান শর্তই হচ্ছে আইনের শাসন। আবার আইনের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবাধিকারের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা। বর্তমানে দেশে জরুরি অবস্থা চলছে এবং পাঠকরা অবগত আছেন, জরুরি অবস্থা চলার সময়ে সংবিধানের মৌলিক অধিকার ধারাগুলো স্থগিত থাকে। কাজেই আইনগতভাবেই সুশাসনের সাথে জরুরি অবস্থার দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার ফলে রাজনীতিবিদদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির একটি তাগিদ সৃষ্টি হবে বলে আমরা আশা করতে পারি। সাধারণ নাগরিকের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে, সরকার সামরিক বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাচ্ছে এবং এ সুযোগে যদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা যায়, তাহলে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি সহজ হবে। পরিশুদ্ধ রাজনীতিবিদ ও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন, দুর্নীতিমুক্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের ফলে আশা করা যায় পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাংলাদেশে বহু কাংখিত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। আর বর্তমান সরকারই যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়, তাহলে তাদেরকেও প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সুশাসনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

এবার সুশাসনের পুরস্কার প্রসঙ্গে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দসহ বহুজাতিক সংস্থাসমূহ যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে নিশ্চিত করেছে, আমাদের দেশে অবশেষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের একাধিপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিল। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইতোমধ্যে জানেন যে, নিম্ন আয়ের রাষ্ট্রসমূহকে তাদের সহস্রাব্দের লক্ষ্য পূরণের সহায়তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্ট নামে একটি তহবিল তৈরি করেছে। বিশ্বের প্রায় ২০টি নিম্ন আয়ের দেশ ইতোমধ্যে এ তহবিল থেকে সাহায্য পেলেও বাংলাদেশের সুশাসনে কথিত দুর্বলতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে এ তহবিল থেকে কোনো বরাদ্দ দেয়নি। আমাদের দেশের এক-এগারোর পরিবর্তনকে

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ উৎসাহের সাথে স্বাগত জানানো এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমা কূটনীতিকদের সুশাসনবিষয়ক সার্টিফিকেট দেয়ার ফলে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম, ২০০৭ সালে হয়তোবা মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশকে রবাদ্দ দেয়া হবে। বর্তমান সরকারের প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত বরাদ্দ পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং ইউএসএইড-এর বাংলাদেশস্থ প্রধান জিনি জর্জ বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের বাড়ানোর যে কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অনুল্লেখযোগ্য। ২০০৬ সালে ইউএসএইড'র মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্বিপক্ষীয় মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মি. জিনি জর্জের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে এ বরাদ্দ ৩ থেকে ৮ মিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, অন্তত বর্তমান পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মার্কিন পুরস্কার এ পর্যন্তই।

প্রকৃতপক্ষে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত আশার কথা, সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাংলাদেশ অনেকাংশে কমাতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প সাহায্য ও ঋণ হিসেবে আমরা বহির্বিশ্ব থেকে যে তহবিল সংগ্রহ করি, তার বেশিরভাগই আমরা নিচ্ছি বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো বহুজাতিক সংস্থা থেকে। দ্বিপক্ষীয় সাহায্য নেয়া যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই অবমাননাকর এবং অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরণের সরাসরি সাহায্য নেয়া দাতা রাষ্ট্রকে গ্রহীতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল, তাতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হয়তো দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের দুষ্টচক্র থেকে আমরা পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারতাম।

যা-ই হোক, বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার দায়িত্ব এখন বর্তমান সরকারের ওপর বর্তেছে। এখন তাদের চ্যালেঞ্জ সাহায্যনির্ভর অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্য পূরণে ২০০৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সিনেটে ট্রেড অ্যাক্ট নামে যে বিলটি উত্থাপিত হয়েছে, তা গৃহীত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়। এ বিলটি গৃহীত হলে এশিয়া মহাদেশের এলডিসিভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিনা শুল্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পণ্য রফতানি করতে পারবে। আফ্রিকা মহাদেশের এলডিসিভুক্ত দেশগুলো আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে ২০০০ সালের ১৮ মে থেকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পেয়ে আসছে। একই তারিখ থেকে ইউএস ক্যারিবিয়ান ব্যাসিন ট্রেড পার্টনারশিপ অ্যাক্ট ২০০০ (ক্যারিবিয়ান ব্যাসিন-ইনিশিয়েটিভ) - এর মাধ্যমে ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রসমূহও যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত পণ্য রফতানির সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নাফতা মেক্সিকোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এত দিন পর্যন্ত শুধু এশিয়ার এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল এবং এর ফলে বাংলাদেশের রফতানিকারকদের যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সরকারি দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দেখেছি, এ অসঙ্গতির বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাণিজ্য

www.pathagar.com

অধিকর্তাদের জবাব সর্বদাই থাকত যে, যেহেতু বাংলাদেশ এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিপুল পরিমাণ পণ্য রফতানি করছে, কাজেই তাদের অতিরিক্ত শুল্ক সুবিধার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিল্প পণ্য উৎপাদনে আমাদের তুলনামূলক সাফল্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য কর্মকর্তাদের কাছে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের পরিচালিত বিগত সরকারসমূহ অনেক প্রচেষ্টার পর আমাদের রফতানিকারকদের দীর্ঘদিনের সঙ্গত দাবিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট পর্যন্ত আনতে সক্ষম হয়েছে। এবার অরাজনৈতিক সরকারের দায়িত্ব হবে বাংলাদেশে এক-এগারোর পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমা বিশ্বে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সর্বোত্তম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় লবিংয়ের মাধ্যমে ট্রেড অ্যাক্ট-কে মার্কিন সিনেটে গ্রহণ করানো। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সরকার এটি করতে সমর্থ হলে বাংলাদেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি বর্তমানের ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশে পৌঁছাবে এবং নিশ্চিতভাবেই আমাদের দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের আর প্রয়োজন হবে না।

তবে আশংকার কথা হচ্ছে, সম্প্রতি আমেরিকান সিনেটে 'দ্য ডিসেন্ট ওয়ার্কিং কন্ডিশন অ্যান্ড ফেয়ার কমপিটিশন অ্যাক্ট' নামে আরো একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে, যা গৃহীত হলে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। এখন আমাদের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে কোনোরকম কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে এ বিলটি থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ দেয়ার জন্য সরাসরি ও বাংলাদেশ ককাস'র মাধ্যমে মার্কিন সিনেটের প্রভাবশালী সদস্যদের অনুরোধ জানানো। আমরা আশা করব, বর্তমান সরকার ইউএসএইড-এর যৎসামান্য দ্বিপক্ষীয় সাহায্য বাড়ানোর প্রচেষ্টার পরিবর্তে বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানোর প্রচেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করবে। এমন একটি দিনের স্বপ্ন কি আমরা দেখতে পারি না, যেদিন ইউএসএইড-এর ৩০ লাখ ডলার সাহায্য বাড়ানো প্রস্তাবের জবাবে আমাদের ভবিষ্যৎ সরকার ওই অর্থটি বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য কোনো গরিব দেশে বরাদ্দ দেয়ার জন্য বলতে পারবে? সে রকম একটি দিন ও নেতৃত্বের অপেক্ষায় রইলাম।

১৪.০৪.০৭

www.pathagar.com

বিলম্বে বোধোদয়

উদ্ধৃতি এক: তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬, স্থান : ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান, বক্তব্য : '৯০ দিনের কথা বলা হচ্ছে। জনগণের অধিকার বড় না সংবিধান বড়।'

উদ্ধৃতি দুই: তারিখ : ৭ এপ্রিল ২০০৭, স্থান : ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিবিসি বাংলা রেডিওতে সাক্ষাৎকার। বক্তব্য : 'এ ধরণের একটি অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক সরকার... কথাটা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন শপথ নেয়, সংবিধানের ৫৮(গ) অনুযায়ী শপথ নিয়েছিল, এ কথাও ভুললে চলবে না।' স্থান : সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ওয়াশিংটন। বক্তব্য : 'সংবিধান প্রদত্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করাসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের সমর্থন, সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।'

ওপরের দুটি উদ্ধৃতি পড়লে যেকোনো পাঠকের মনে হবে প্রথম বক্তা দেশে আইন কিংবা সংবিধান কোনো কিছু একেবারেই তোয়াক্কা করেন না এবং জনগণের দোহাই দিয়ে তার রাজনৈতিক দাবি পূরণের জন্য সংবিধানের যেকোনো ধরনের বিকৃতি তিনি করতে ও করাতে প্রস্তুত। আর দ্বিতীয় বক্তা রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনের প্রতি অতিশয় অনুগত থেকে বর্তমান জরুরি সরকারকে তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের দেশ, জাতি ও রাজনীতির জন্য অত্যন্ত পরিতাপ ও দুর্গতির বিষয় হচ্ছে, উভয় বক্তা প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি। উদ্ধৃতির বক্তা সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা বর্ণিত এক-এগারোর রাজনৈতিক ভূমিকম্পের আগে বাংলাদেশের সর্বাধিক দুই ক্ষমতাধর ব্যক্তির একজন। তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, আওয়ামী লীগ ও অধুনাসুপ্ত অথবা লুপ্ত মহাজোটের মহানেত্রী শেখ হাসিনা। আরো আশ্চর্যের বিষয়, শেখ হাসিনা তার উভয় বক্তব্যেই সংবিধানের অপব্যাখ্যা করেছেন। এ অতিশয় গর্হিত কাজটি তিনি কি অজ্ঞতাপ্রসূতভাবে করছেন নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য করছেন, এ তথ্যটি অবশ্য তার উপদেষ্টাকুল ব্যতীত দেশের নাগরিকদের অজানা। শেখ হাসিনার প্রদত্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে এবার আমরা সংবিধান বোঝার কিঞ্চিত প্রচেষ্টা চালাতে পারি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সীমা সম্বন্ধে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ১২৩(৩) এবং ১২৩(৪) ধারা বলছে,

অনুচ্ছেদ-১২৩ : নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।

(৩) 'মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।'

(৪) 'সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হইবে।' [তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈবদুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]

উল্লিখিত ধারাটি নিয়ে আমি দেশের বেশ ক'জন প্রথিতযশা আইনজীবীর সাথে কথা বলেছি এবং তারা বলেছেন, সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের অর্থ নিয়ে সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ভেংগে যাওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে অবশ্যই দেশে সংসদ নির্বাচন হতে হবে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট শাসকরা সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবেন। কেবল উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং শুধু দৈবদুর্বিপাকের কারণে ওই নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন সর্বোচ্চ আরো ৯০ দিন পেছানো যেতে পারে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ৯০ দিন গ্রহণের কোনো সুযোগ সংবিধানে রাখা হয়নি। কাজেই পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে, শেখ হাসিনা তার পেশিশক্তির বলে তৎকালীন সরকারকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করার মতো সংবিধানবহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত অথবা বাধ্য করেছেন। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় উদ্ধৃতির মর্মার্থ বুঝতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৫৮ খ(১) ধারা থেকে নির্দেশনা নিতে হবে ।

অনুচ্ছেদ-৫৮ খ : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(১) 'সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।'

ওপরের ধারা থেকে আমি অন্তত বুঝতে অক্ষম, বর্তমান জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ৯০ দিন অথবা ১৮০ দিন অথবা যেকোনো রকম সময়সীমার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা শেখ হাসিনা কোথায় পাচ্ছেন। সংবিধানের নির্যাস অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়সীমা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময়সীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরবর্তী সরকারের কাছেই কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, সংবিধানের এ নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সরকার আইনগতভাবেই ক্ষমতাসীন থাকবে। আর সংবিধান প্রদত্ত নির্বাচনের ৯০ দিনের বাধ্যবাধকতা যখন শেখ হাসিনার সফল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিক্রান্ত হয়েই গেছে, তখন আগামী সংসদ নির্বাচন ৯০০ দিন কিংবা ৯০০০ দিন পর অনুষ্ঠিত হলেও সংবিধান ভঙ্গের অপরাধের কোনো কম-বেশি হবে, এমন ইঙ্গিত সংবিধানে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংবিধান ভঙ্গের অপরাধ যা করার সেটি করেই ফেলেছে। নতুন করে সংবিধান ভঙ্গের প্রশ্ন এখন অবান্তর। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিবিসি বাংলা রেডিওতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা একই বক্তব্যে বর্তমান সরকারকে অসাংবিধানিক বলছেন আবার সে অসাংবিধানিক সরকারকেই সংবিধানের ৫৮(গ) ধারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। স্ববিরোধিতারও বোধহয় একটি সীমা থাকা উচিত। রাজনীতিবিদদের উপলব্ধি করতে

www.pathagar.com

হবে, তাদের অবিমৃষ্যকারিতায় যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সে সুযোগ নিয়ে এবং জনগণ ও উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ চাইলে বর্তমান জরুরি সরকার যাবজ্জীবন সরকারে পরিণত হলেও রাজনীতিবিদদের সে কাজে বৈধতা দেয়া ছাড়া সম্ভবত এ পর্যায়ে আর কিছু করার সুযোগ নেই। বর্তমান বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ২০০৮ সালের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন, সেটিকে তার মহানুভবতাই বলতে হবে।

তবে শেখ হাসিনার বক্তব্যে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। কারণ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের বক্তব্য সচরাচর স্ববিরোধিতাপূর্ণই হয়ে থাকে। 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই' – এ চরম সুবিধাবাদী আপ্তবাক্যকে ব্যবহার করে রাজনীতিবিদরা তাদের মিথ্যা কথনকে 'জায়েজ' করে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধুনা দেখা যাচ্ছে যে, মহাজ্ঞানী সব সম্পাদকের লেখনী এবং এমনকি সরকারের বক্তব্যও স্ববিরোধিতার দোষে দুষ্ট। প্রথমে শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগী রাজনীতিবিদদের স্ববিরোধী বক্তব্যের আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ মার্চ আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে জিয়া বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'তার দল ক্ষমতায় গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কাজের বৈধতা দেবে। দুর্নীতিবাজ ও মহাচোরদের ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তাদের কার্যক্রম 'রেটিফাই' করে দেবে।' বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনার কাছ থেকে এ জাতীয় সাহসিকতাপূর্ণ বক্তব্য চেয়েছে কি না, সে বিতর্কে না জড়িয়ে তার রাষ্ট্রনায়কোচিত বক্তব্যের প্রশংসা করা উচিত। অথচ এখন তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হওয়ার পর সে শেখ হাসিনাই ওয়াশিংটনে বলছেন, 'এ সবই ষড়যন্ত্র। ওরা যা পারে করুক, আরো মামলা দিক। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এর আগেও এটি হয়েছে, তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এ সবই হচ্ছে হয়রানির উদ্দেশ্যে।' এর আগে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান গ্রেফতার হলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী জাফরউল্লাহ সন্তোষের সাথে বাংলা দৈনিক প্রথম আলোকে বলেছিলেন, 'দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেয়া পদক্ষেপ আমরা সমর্থন করি। তারেকের গ্রেফতারকে আমরা অভিনন্দন জানাই।' যে সরকার তারেককে গ্রেফতার করে অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছে, সে সরকার এখন পর্যন্ত কিন্তু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। শুধু একজন ব্যবসায়ী চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেছেন এবং এটুকুতেই আওয়ামী লীগের বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

গত বছর ২৮ অক্টোবর রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে ঢাকার রাস্তায় লগি-বৈঠা বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ৪৩ জন মহাজোট নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দিলে অভিযুক্তরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা অধিকতর স্ববিরোধী। বিবিসি রেডিওতে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছি। কাজেই এরা আর কী... এসব মিথ্যা মামলা যে ইচ্ছা করে দেয়া হচ্ছে, সেটা বাংলাদেশের মানুষ যেমন বুঝতে পারে, তেমনি আমিও বুঝি। ...ওরা (জামায়াত) ওদের কর্মীদের বৃষ্টির মতো

www.pathagar.com

গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিল। বলেছিল, মরলে শহীদ আর বাঁচলে গাজী। তাদের এহেন উগ্রতায় জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে গিয়েছিল। চোখের সামনে এভাবে গুলি করে হত্যা করলে মানুষ কি তখন চুপ করে বসে থাকবে?' অর্থাৎ একদিকে শেখ হাসিনা মামলাটিকে মিথ্যা বলছেন, আবার একই বক্তব্যে তার কর্মী-সমর্থকদের পৈশাচিকতাকে সমর্থন করছেন। লাঠি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, এ বিষয়ে আমরা জ্ঞাত নই, তবে তার বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহে তিনি মোটেই মর্মাহত বা অনুতপ্ত নন। আওয়ামী লীগের আরেক শীর্ষস্থানীয় নেতা মি. সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তব্যও তার নেত্রীর বক্তব্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে তিনি অবলীলাক্রমে বললেন, 'আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য মহাজোট নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পুলিশের চার্জশিট মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট ঠিকই আছে।' এসব রাজনীতিবিদের স্ববিরোধী বক্তব্যই প্রমাণ করে, এত দুর্গতির পরও তাদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সম্ভবত এদের আরো অনেক দুর্গতি বাকি আছে।

এবার জাতির বিবেকের দাবিদার বাংলাদেশের অতি স্বাধীন এবং কোনো রকম জবাবদিহিতাবিহীন সংবাদমাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ববিরোধিতার চিত্র দেখা যেতে পারে। ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার' সম্পাদক মাহফুজ আনাম প্রায়ই তার সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় সারগর্ভ মন্তব্য কমেন্টারি লিখে আমাদের মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানবিশিষ্ট নাগরিকদের তার অগাধ জ্ঞানের কিয়দংশ দান করে থাকেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের জাতির পিতা-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রশংসা করে মাহফুজ আনাম ৩০ মার্চ তার Commentary-তে লিখেছেন,

The Army Chief, Lt. General Moeen U Ahmed hit a significant chord in the nation's psyche when he said that after 36 years of independence we still have not been able to honour the Father of the Nation. We commend him for his courageous statement and urge the caretaker government to bury our murdered history forever and give our leaders their due places in our national history...

(স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও আমরা আমাদের জাতির পিতাকে স্বীকৃতি দিতে পারিনি– সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন উ আহমেদ এ বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্তার মর্মে আঘাত করেছেন। আমরা তার সাহসী বক্তব্যের প্রশংসা করি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি মৃত ইতিহাসকে কবর দিয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ইতিহাসের যথাক্রমে স্থান দেয়ার জন্য আহ্বান জানাই) জাতির পিতার স্বীকৃতি বিষয়ে ইতঃপূর্বেই বিস্তারিত লেখার কারণে এবং আজকের নিবন্ধের বিষয়বস্তুর ভিন্নতা হেতু ওই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত রইলাম। যা-ই হোক, মাহফুজ আনাম দায়িত্বরত সেনাপ্রধানের জাতির পিতা-বিষয়ক রাজনৈতিক বক্তব্যে কোনো আপত্তি খুঁজে পাননি, বরং তার বক্তব্যের আলোকে এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, একই সম্পাদক মাত্র সাত দিনের মাথায় সেনাপ্রধানের অন্য একটি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রাজনৈতিক বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করলেন। ৬ এপ্রিল 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকায় লিখিত তার কমেন্টারির বক্তব্য নিম্নরূপ–

To start with, should a sitting Chief of Army Staff (CAS) speak in public and in presence of the President on the political future of a country? Such speech making will naturally raise questions as to whether or not the army chief or his institution plans to get involved in the country's politics?...

As to the timing, we feel that such a policy speech on the future direction of the country, its politics, its government, its political parties and several vital related issues should have come, as a part of the reform agenda, from the head of the caretaker government which is being ably backed by the armed forces. Coming from the head of the army, it has given rise to the question as to whether there are differences of views between the government and its most important backer. The situation is further complicated by the fact that the Chief Adviser was away attending his first summit as the head of the government when the speech was made. Imagine his discomfiture when such a fundamental policy speech is made about the future structure of the government without him being anywhere near the picture. How much credibility is he likely to enjoy under these circumstances? How seriously will the world leaders and global media take him from now on?...

(শুরুতে, একজন কর্মরত সেনাপ্রধানের কি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জনসমক্ষে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মুখে বক্তব্য দেয়া উচিত? এ ধরণের বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দেশের রাজনীতিতে সেনাপ্রধান অথবা সেনাবাহিনীর জড়িত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। ...সময়ের বিবেচনায়, আমরা মনে করি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ, দেশের রাজনীতি, সরকার এবং অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত এ ধরণের নীতিনির্ধারণী বক্তব্য সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছ থেকেই আসা উচিত। সেনাপ্রধানের কাছ থেকে এ জাতীয় বক্তব্য এলে সরকার এবং তার সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা শীর্ষ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বিদেশে অবস্থানকালে এ বক্তব্য দেয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কাঠামোসংক্রান্ত একটি মৌলিক নীতিনির্ধারণী ভাষণ তার অবর্তমানে প্রদান করায়, প্রধান উপদেষ্টার বিব্রতকর অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি। এমতাবস্থায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকতে পারে? এখন থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদমাধ্যমই বা আর তাকে কতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে?)

মাহফুজ আনাম যে কী পরিমাণ মর্মাহত হয়েছেন সেটি তার লেখা থেকে বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জাতির পিতাসংক্রান্ত রাজনৈতিক বক্তব্যে জনাব আনামের কোনো আপত্তি না থাকলে রাষ্ট্রের কাঠামোসংক্রান্ত বক্তব্যে

www.pathagar.com

তিনি এত ক্ষেপে উঠলেন কেন? সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং সহযোগিতায় সরকার দেশ চালাবে, অথচ জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাহিনীপ্রধান তার মতামত দেশবাসীকে জানাতে পারবেন না, এ ধরণের দ্বিমুখী আবদার কেন? প্রকৃতপক্ষে একশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের মতো সুশীল সমাজ(?) সমর্থনকারী সংবাদমাধ্যমের একশ্রেণীর বিবেকদেরও ভন্ডামির সব ধরণের মাত্রাজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে। দেশের সাধারণ নাগরিকরা ভন্ডামি বাদ দিয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সহজ ও সরলভাবে বুঝতে চায় এবং সে কারণেই প্রধান উপদেষ্টার পরিবর্তে বরং প্রকৃত শাসকদের বক্তব্যই সরাসরি শুনতে অধিকতর আগ্রহী। এ বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যে অগ্রজ নিবন্ধকার ফরহাদ মজহার বিশদভাবে লিখেছেন। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, এ দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং সে কারণেই বাংলাদেশের ১৫ কোটি জনগোষ্ঠী কখনো তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীকে বিদেশী স্বার্থের তল্পিবাহক কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার হতে দিতে পারে না।

এবার সরকারের বোধোদয় প্রসঙ্গে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবার সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। আইন উপদেষ্টা বলেছেন, বর্তমান আইনে যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। এ আইনে এফআইআর'র পর পুলিশকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেন, কোনো ব্যক্তিরই আত্মরক্ষার সুযোগ নেই। আইন উপদেষ্টার বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনী আইনে এবার সংশোধন করা হবে। আমরা জানি, দেশে জরুরি আইন চলার সময়ে সংবিধানের মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত ধারাসমূহ স্থগিত থাকে। দেশে যেখানে সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার থেকেই মানুষ বঞ্চিত রয়েছে, এমন অবস্থায় প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ একটি ধারায় মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার উৎসাহ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। বর্তমান সরকার ক্রমাগতভাবে তার সব কর্মকান্ডে নির্মোহ নিরপেক্ষতার দাবি করে চলেছেন। কিন্তু তাদের এ সর্বশেষ উদ্যোগ সরকারের নিরপেক্ষতার দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। নিন্দুকেরা বলতেও পারেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা দেয়ার জন্যই সরকার এ আইন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তদুপরি যারা ইতোমধ্যে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে গ্রেফতার হয়েছেন, তারা যদি এখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের অভিযোগ উত্থাপন করেন, তাহলে দেশবাসীকে সদুত্তর দেয়া সরকারের পক্ষে কঠিন হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। উপদেষ্টারা সঙ্গত কারণেই শেখ হাসিনাকে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার সে সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্য শেখ হাসিনা অথবা তার দলীয় নেতাদের সাথে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন। একটি সভ্য, আইন মান্যকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে এটিই প্রত্যাশিত ব্যবহার। তবে এখানে উলে-খ করা যেতে পারে, বর্তমানে গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দেশের একজন

www.pathagar.com

প্রতিথযশা আইনজীবী, সাবেক মন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক উপরাষ্ট্রপতি এবং সাবেক ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। ১৯৯০ সালে সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। রাষ্ট্রাচার অনুযায়ী ব্যারিস্টার মওদুদের স্থান অনেক উপরে হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের বিবেচনায় তিনি যে শেখ হাসিনার মতো সম্মানিত নন, এটি জনাব মওদুদের দুর্ভাগ্য। আর বিলম্বে বোধোদয়ের ভাইরাস যে অনেকটা বার্ড ফ্লু ভাইরাসের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে, সেটি দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য। বর্তমান শাসকদের বিরক্তি উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়ে বিনয়ের সাথে তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, বার্ড ফ্লু পোলট্রি শিল্পের ধ্বংস ছাড়াও মূল্যবান মানবপ্রাণ সংহারকারী ভাইরাস, কিন্তু বিলম্বে বোধোদয়ের ভাইরাস আমাদের মহামূল্যবান রাষ্ট্রসংহারকারী ভাইরাসে রূপান্তরিত হতে পারে।

২০.০৪.০৭

www.pathagar.com

নার্সিসাস সিনড্রোম

গ্রিক কিংবদন্তীতে বর্ণিত আছে, নদীর দেবতা সেফিসাসের নার্সিসাস নামে এক পরম রূপবান পুত্র ছিল। সে অনিন্দ্য সুন্দর সেফিসাস পুত্রের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রেমোন্মাদ তো ছিলই, এমনকি গ্রিক প্রেমের দেবতা অ্যাপোলোও তার প্রতি দুর্বলতা পোষণ করত। নার্সিসাস একদিন পিপাসার্ত হয়ে জলাশয়ে পানি পান করার সময় জলাশয়ের পানিতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের প্রেমেই পতিত হয়। আপন সৌন্দর্যে সে এতই বিমোহিত হয়ে পড়ে যে পানাহার পরিত্যাগ করে সারাক্ষণ নার্সিসাস ওই প্রতিবিম্বের দিকেই চেয়ে থাকত। অবশেষে ওই স্থানে ওই অবস্থাতেই নার্সিসাস মারা যায়। তার প্রিয়জনরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নিষ্প্রাণ দেহ চিতায় উঠানোর আগেই নার্সিসাসের দেহ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সবাই দেখতে পায় যে, তার প্রাণহীন দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেস্থানে অতি চমৎকার একটি ফুল ফুটে আছে। সংক্ষেপে এ হলো নার্সিসাস ফুলের নামকরণের চিত্তাকর্ষক ও বিয়োগান্তক কাহিনী।

ক'দিন আগে বিবিসি সংলাপ অনুষ্ঠানে বর্তমান জরুরি সরকারের একজন অতিশয় ক্ষমতাবান উপদেষ্টার একটি বক্তব্যের সূত্র ধরেই উপরোল্লিখিত গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি দাবি করলেন, তারা যে দয়া করে ক্ষমতায় বসেছেন, শুধু এ কারণেই নাকি বাংলাদেশের জনগণের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এক-এগারোর পট পরিবর্তনের পর থেকেই নিন্দিত এবং নিগৃহীত রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকার সময় তাদের মধ্যে কেউ যদি জনগণের প্রতি এমন অবজ্ঞাসূচক বক্তব্য দিতেন, তাহলে আমাদের সংবাদমাধ্যম সমালোচনার চোটে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমতা ছাড়তে যে বাধ্য করত, তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি? বর্তমান উপদেষ্টারা অতিশয় ভাগ্যবান যে, তারা একদিকে যেমন অতি রাজনীতিতে ত্যক্ত-বিরক্ত জনগণের সমর্থন পাচ্ছেন, অন্যদিকে জরুরি আইনের বর্ম দিয়েও নিজেদেরকে সুরক্ষিত রেখেছেন। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদমাধ্যম বেশ স্তাবকের ভূমিকাই পালন করছে অথবা করতে বাধ্য হচ্ছে।

সেদিনের অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা মহোদয় আরো একটি নতুন এবং কৌতূহল-উদ্দীপক রাষ্ট্র পরিচালনার তত্ত্ব হাজির করেছেন। তার মতে, বর্তমান জরুরি সরকারের মতো বিশেষ ব্যবস্থার সরকারই নাকি জনগণের প্রতি সর্বাধিক দায়বদ্ধ থাকে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে যেসব সরকার নির্বাচিত হয়, তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কারণেই জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজনীতা অনুভব করে না। হ্যারল্ড লাস্কিসহ দেশ-বিদেশের নামকরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই এ নতুন তত্ত্বে চমকে উঠবেন। এখন দেখার বিষয়, বিশ্বের ক'টি দেশ বাংলাদেশে প্রবর্তিত জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এ

www.pathagar.com

নতুন ধরণের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করে। যাই হোক, বিশ্বাস করতে চাই যে নার্সিসাস মানসিকতাপ্রসূত এ জাতীয় বক্তব্য ওই উপদেষ্টার ব্যক্তিগত আত্ম-অহমিকার প্রকাশ মাত্র এবং সরকার সমবেতভাবে নিশ্চয়ই এখনো নার্সিসাস সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হয়নি।

সরকারের কার্যক্রম বিষয়ে এবার একটু তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন। প্রশ্ন করা যাক, বাংলাদেশের মতো একটি গরিব এবং অতি ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের প্রধান লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? সফল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই হয়তো চটজলদি জবাব দেবে সুশাসন ও দুর্নীতি দমন। আমরা অনেকেই বোধ হয় উপলব্ধি করি না, সুশাসন ও দুর্নীতি দমন কিন্তু কোনো লক্ষ্যের সমাপ্তি নয়। এটি শুধুই লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় মাত্র। বিগত এক দশক দারিদ্র্য বিমোচনের অতি জরুরি বিষয়কে উহ্য রেখে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই সুশাসন, দুর্নীতি ও ধর্মীয় সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছে। আমার ধারণা, বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদের বিবেচনায় বাংলাদেশের জরুরি অথবা গণতান্ত্রিক যেকোনো সরকারেরই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য নির্ধারণে আমরা যদি একমত পোষণ করি তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলবিষয়ক পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। কেউ হয়তো কৃষিকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলবেন, আবার কেউ শিল্প বা সেবা খাতের কথা বলবেন। ক্ষুদ্রঋণ, অতি দরিদ্রের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং তথাকথিত দারিদ্র্যবান্ধব প্রবৃদ্ধি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনারও সুযোগ রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সম্ভবত সব অর্থনীতিবিদই একমত হবেন, দ্রুত হারে দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী এবং টেকসই কৌশল হচ্ছে কর্মসংস্থান। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে ৯ শতাংশ। বছরে গড়ে প্রায় ১.৮ শতাংশ দারিদ্র্য কমে যাওয়ার এ হার সার্কভুক্ত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক হারে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছে বিগত পাঁচ বছরে শিল্প ও বিনিয়োগে উচ্চপ্রবৃদ্ধির কারণে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জন্য ৬.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করেছে, তার ভিত্তিই হচ্ছে বর্তমান অর্থবছরের শিল্প খাতে উচ্চপ্রবৃদ্ধি। আমরা সবাই অবগত আছি, শ্রমঘন পোশাক শিল্পই বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প খাত। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উচ্চপ্রবৃদ্ধির ফলে বিগত কয়েক বছরে পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শ্রমঘন খাতে আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান হয়েছে। যেকোনো নতুন কর্মসংস্থানই অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ায়, অর্থনীতির এ স্বাভাবিক নিয়মের ফলে আত্মকর্মসংস্থানেও সম্প্রতি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের অর্থনীতিবিদ প্রধান উপদেষ্টা এবং অর্থ উপদেষ্টা উভয়ই যেহেতু বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কাজেই অর্থনীতির এ গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা যে সম্যকভাবে অবহিত আছেন, সে বিষয়েও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

উপরে উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ অবশ্যই একটি নিম্ন আয়ের গরিব মানুষের দেশ। খাদ্যশক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মাথা গণনা হার অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে এ দেশের দারিদ্র্য প্রবণতা এখনো ৪২ শতাংশ। একই বছরে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪১ শতাংশ। চরম দারিদ্র্যের হার ক্রমাগত কমে গেলেও ২০০৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের ১৮.৭ শতাংশ মানুষ এখনো চরম দারিদ্র্যসীমার নিচেই বাস করে। কাজেই যেকোনো শাসক শ্রেণীর কর্তব্যই হচ্ছে আমাদের দেশের এ দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র প্রায় ৬ কোটি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। সরকারের সব কার্যক্রম এ লক্ষ্যকে আবর্তিত করে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সরকারকে সব সময় মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্তরা তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাংলাদেশের গরিব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন না-ও চাইতে পারেন এবং সে কারণেই এরা বিভিন্ন কর্মসূচির নামে সরকারকে লক্ষ্যচ্যুত করারও চেষ্টা চালাবে। বর্তমান সরকারের প্রথম ১০০ দিনের বিশে-ষণে প্রতীয়মান হচ্ছে, সরকারের ভেতরে অর্থনীতিবিষয়ক কাজকর্মে বিস্ময়করভাবে এক ধরনের উদাসীনতা বিরাজ করছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কার্যক্রম এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যাক।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সরকার এ পর্যন্ত দুর্নীতি উদঘাটন, দমন এবং রাজনৈতিক সংস্কার ও পরিশোধন ধরনের কর্মকাণ্ডকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছে। এ কারণেই হয়তোবা সরকার পরিচালনায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম এখন পর্যন্ত উপেক্ষিত থেকেছে। অধিকন্তু চলমান দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের ফলে বেসরকারি খাত সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে। দুর্নীতি দমনে সরকারের সদিচ্ছা অথবা কার্যক্রমের ন্যায্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করে আমি শুধু অর্থনীতিতে স্বল্প মেয়াদে এ জাতীয় কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া নির্মোহভাবে বিশে-ষণের চেষ্টা করেছি। বর্তমান শাসকদের এ বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বেসরকারি খাতনির্ভর এবং পরিচালিত। অর্থনীতিতে সরকারের অবদান প্রধানত নীতিনির্ধারণ, জন-উপযোগমূলক কার্যাদি এবং বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কিত কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত। আমাদের প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয়ের বেশিরভাগেরই জোগান দিচ্ছে বেসরকারি খাত। এ জোগানদাতার মধ্যে যেমন পোশাক শিল্প ব্যবসায়ীরা আছেন, তেমনি গ্রামের একজন ক্ষুদ্র দোকান মালিকও রয়েছেন। এমনকি শহরাঞ্চলে সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের ফলে কর্মচ্যুত অসহায় হকারদের হিস্সাও কিন্তু এ জাতীয় আয়ের মধ্যে রয়েছে। কৃষক, জেলে, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বড় ব্যবসায়ী– এদের সবার সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের একটি বেগবান বেসরকারি খাত। এ বেসরকারি খাতের সম্মিলিত কর্মদ্যোগ এবং বিগত সরকারসমূহের উৎসাহ ও সমর্থন দেয়ার ফলেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহু প্রত্যাশিত গতি অবশেষে পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল এবং আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয়ও ৫০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করতে পেরেছে। অর্থনীতির এ উচ্চ প্রবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য' ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের সম্ভাবনার কথাও বেশ আস্থার সাথেই বলতে শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব এবং বৈরী রাজনীতির কুপ্রভাব থাকলেও বাংলাদেশের জনগণের উদ্যম সব বাধাকে অতিক্রম করেই সাম্প্রতিক সময়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের কিছু কিছু কাজ যে সে উদ্যমকেই অনভিপ্রেতভাবে থমকে দিয়েছে, তা এখন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে আমদানি, রফতানি ও বিনিয়োগের গতিধারার সরাসরি সংযোগ থাকে। ২০০১ থেকে ২০০৬ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানি অব্যাহতভাবে বছরে গড়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংঘাত সত্ত্বেও আমদানি বেড়েছে অব্যাহতভাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর এ দুই ত্রৈমাসিক অংশে আমদানি ঋণপত্র খোলার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ হাজার ২৩৫ এবং ৪ হাজার ৫৯৯ মার্কিন ডলার। এ হিসাব অনুযায়ী অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আমদানি ঋণপত্র বাড়ানোর পরিমাণ ছিল শতকরা ২২ ভাগ। এর বিপরীতে জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৭ সময়কালে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার ৯২৫ মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী পঞ্জিকাবর্ষের একই সময়কালের তুলনায় দুই শতাংশ কম। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমদানি কমার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে আরো বেড়েছে। বর্তমান বছরের এ সময়ে ঋণপত্র খোলা হয়েছে ২৭৩ মার্কিন ডলারের, যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ৯ শতাংশ কম। দেশে আমদানি কম হলে দেশের অর্থনীতিতে চার ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রথমত, আমদানিনির্ভর ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ে। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব আয় কমে যায়। তৃতীয়ত, বিনিয়োগ কমতে শুরু করে এবং চতুর্থত, আমদানির ওপর নির্ভরশীল রফতানি কমে যায়। সম্প্রতি ভোগ্যপণ্যের যে দাম বেড়েছে, তা নিয়ে বির্তকের সম্ভবত কিছু নেই। বর্তমান সরকারের ঘোরতর সমর্থক আইএমএফ'র পরিচালক মি. রামবাগ তার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, সরকারের মজুদদারবিরোধী কার্যক্রম পণ্য সরবরাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সে কারণেই মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থায় যেকোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে গ্রহণ করা আবশ্যক। রাজস্ব আয়ের নিম্নমুখী প্রবণতা সম্পর্কে পত্রপত্রিকার লেখালেখির মাধ্যমে জনগণ ইতোমধ্যে অবহিত হয়েছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধনের হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত শুধু স্থানীয় বিনিয়োগ কমে যাওয়ার পরিমাণই ২৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, আগের পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগতভাবে স্থানীয় বিনিয়োগ বেড়েছিল প্রতি বছর গড়ে ৩০ শতাংশ। বিদেশী বিনিয়োগের সাম্প্রতিক গতি দেখে প্রতীয়মান হচ্ছে, ২০০১ সাল-পরবর্তী দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ২০০৭ পঞ্জিকাবর্ষেই সম্ভবত আবার ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। রফতানি খাতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির পর কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। পোশাক শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের প্রতিযোগীরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছেন। চিংড়ি শিল্পও নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬ শতাংশ রফতানি বেড়ে যাওয়ার বিপরীতে জানুয়ারি মাসেই রফতানি কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে এবং মার্চ মাসে ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা বিগত পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতিতে মন্দার লক্ষণ আশংকাজনকভাবে বেড়েই চলেছে।

www.pathagar.com

এবার মাইক্রো অর্থনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে গ্রামগঞ্জের হাটবাজার পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে সরকার অবিবেচনাপ্রসূতভাবে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগকে সংকুচিত করেছে। শহরাঞ্চলেও পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ কার্যক্রম একইভাবে অতি ক্ষুদ্র অথচ উদ্যমী উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থানকে বাধাগ্রস্ত করেছে। জরুরি অবস্থায় বেশ কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকলেও সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদ অর্থাৎ সংবিধানের পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতাবিষয়ক ধারা স্থগিত করা হয়েছে – এমন কোনো সরকারি ঘোষণা সম্পর্কে আমি অন্তত অবহিত নই। দেশের ব্যাঙ্কিং খাতেও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ব্যাঙ্কারদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি বলেছেন, আমানতকারীরা ব্যাংকে টাকা রাখতে ভয় পাচ্ছেন। এতে ব্যাংকগুলোতে আমানত সংগ্রহের হার কমে যাচ্ছে এবং এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দীর্ঘমেয়াদি তারল্য সঙ্কটের আশংকা করা হচ্ছে। ব্যাংকাররা সাধারণ আমানতকারীদের আশ্বস্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুস্পষ্ট সরকারি নীতি সম্বন্ধীয় প্রচারণা চালানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্তমান সরকারের একজন অত্যন্ত জোরালো সমর্থক ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীও সম্প্রতি অর্থ উপদেষ্টার সামনে বক্তব্য রাখার সময় সরকারের দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিই যাতে আবার বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থনীতির গতিধারা রুদ্ধকারী কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, নীতিনির্ধারকরা তাদের ঘোষিত লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রসূত এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশ্যে তার সাম্প্রতিক ভাষণে অর্থনীতি প্রসংগে আলোচনার সময় বিগত নয় মাসের অর্থনীতি টেনে এনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাকে বিনয়ের সাথে মনে করিয়ে দিতে চাই, এক-এগারোর আগের সরকারের কোনো দুষ্কর্মের দায় যেমন তার সরকারের ওপর বর্তায় না, একইভাবে সে সরকারের কোনো সফলতার কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পারেন না। তার ভাষণে অর্থনীতির বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো এবং তা উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত দিকনির্দেশনার অনুপস্থিতি আমাদের বিস্মিত করেছে।

বর্তমান সরকারের দৃশ্যত প্রধান বিশ্বব্যাংকের একজন সাবেক অর্থনীতিবিদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন আরো একজন অর্থনীতিবিদ। অধিকন্তু জনশ্রুতি রয়েছে, বিশেষ মিডিয়ার আনুকূল্যপ্রাপ্ত এবং বিদেশী কূটনীতিবিদদের অত্যন্ত আপন একজন অর্থনীতিবিদও নিয়মিতভাবে শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছেন। এত অর্থনীতিবিদ চারদিকে থাকা সত্ত্বেও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এক-এগারোর সরকার এখন পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক দর্শন ও লক্ষ্যের কোনো রূপরেখা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণেও এ বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। তিন মাসের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো দর্শন ব্যতীত ৯০ দিন কোনো রকম দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে, তারা অন্তত দুই বছর ক্ষমতায় থাকতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় শুধু বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ'র নির্দেশে দীর্ঘ দুই বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচালিত হলে আমাদের জন্য যে চরম দুর্গতি

www.pathagar.com

অপেক্ষমাণ, এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইতঃপূর্বে লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধে আমি সতর্ক করার চেষ্টা করেছি, উপদেষ্টামন্ডলীর প্রত্যেকেই রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়লে মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম দারুণভাবে ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক সংস্কারের বাইরেও যে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য বহুবিধ সংস্কার প্রয়োজন, এ বিষয়টি দ্রুত উপলব্ধি করা বর্তমান সরকারের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। ইংরেজিতে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, যার সহজ বাংলা অর্থ হলো – 'পুডিংয়ের স্বাদ খাওয়ার পরই বোঝা যায়।' বাংলাদেশেও যেকোনো রকম সংস্কারের স্বাদ কিন্তু নির্ধারিত হবে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরীক্ষার মাধ্যমেই, অন্য কোনো পন্থায় নয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ অতি উচ্চ মেধাসম্পন্ন। কাজেই অর্থনীতির সংবেদনশীলতার বিষয়টি তাদের উপলব্ধি না করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

তবুও পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, এ বিষয়ে সরকারের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়করভাবে নির্লিপ্ত এবং তারা সম্ভবত এক ধরনের আত্মতুষ্টির মধ্যে আছেন। সন্দেহ হয় বাংলাদেশের অঘটন ঘটন পটীয়সী, বিদেশী অর্থে লালিত ও পালিত সুশীল(?) সমাজ নানা ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরামর্শ দিয়ে সরকারকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন না তো? এদের স্তাবকতার ফলেই হয়তো কোনো কোনো উপদেষ্টা মহোদয় আপাতদৃষ্টিতে নার্সিসাস সিনড্রোমে আক্রান্ত হচ্ছেন। তারা ভুলে যাচ্ছেন, মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ উঠলে কোনো প্রচারণা ব্যতিরেকেই তা সবার দৃষ্টিগোচর হয়। সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকাশ মেঘমুক্ত রেখে সার্বিক উন্নয়নের চন্দ্রোদয়ের পরিবেশ তৈরি করা। মহান আল্লাহ তায়ালার রহমতে বাকি কাজটুকু এ দেশের অসুশীল, উদ্যমী ও লড়াকু মানুষেরাই করে ফেলার ক্ষমতা রাখেন।

২৭.০৪.০৭

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত নির্বাচন ২০০৮

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রায় সব ক'টি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং সে প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মরত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে আমাদের রাজনীতিবিদ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদমাধ্যম এবং বিদেশী অর্থে লালিত সুশীল(?) সমাজ সাফল্যের সাথে বিতর্কিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিচারপতি কে এম হাসান, বিচারপতি এম এ আজিজ, বিচারপতি সুলতান হোসেন খান, ড. মনিরুজ্জামান মিঞা, ড. জিন্নাতুননেছা তাহমিনা বেগম, বিচারপতি জে আর মোদাচ্ছের হোসেন, অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী এমনকি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ কেউই বাদ যাননি এ অনৈতিক, অগ্রহণযোগ্য ও ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে। সংশ্লিষ্টদের দৌরাত্ম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এক অখ্যাত দোকান মালিক নেতাও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের বাসায় সব রকম খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করার হুমকি প্রদানের ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন। একই প্রকার নিম্নরুচির অধিকারী সুশীল(?) সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী আর এক ব্যারিস্টারকন্যা ব্যারিস্টার টেলিভিশনের টকশোতে বিচারপতি আজিজের গৃহে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ বন্ধ করার দাবি তুলেছিলেন। সুশীল(?) সমাজের দিকপাল ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে অধুনালুপ্ত মহাজোট সমর্থনকারী আইনজীবীরা বহিরাগত রাজনৈতিক ক্যাডারদের সমন্বয়ে সুপ্রিমকোর্ট আক্রমণ করেছেন, প্রধান বিচারপতির কক্ষে তান্ডবলীলা চালিয়েছেন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে দীর্ঘ সময় প্রাণভয়ে অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছেন। পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জানলাম, ক'দিন আগে ড. কামাল হোসেনের ৭০তম জন্মদিন সারাদিন ধরে খুব ঘটা করে পালিত হয়েছে। সেখানে প্রদত্ত বক্তৃতায় ড. কামাল হোসেন বলেছেন, তিনি নাকি সারাজীবন সম্মানী ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান দেখিয়েছেন এবং সে কারণেই জীবন সায়াহ্নে অন্যদের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন। বিস্মিত হওয়ার মতোই বক্তব্য। আমজনতার জানা মতে, সাংবিধানিকভাবে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর যাবতীয় কর্মসূচির নেতৃত্ব সচরাচর ড. কামাল হোসেনই দিয়ে থাকেন। তিনি বোধ হয় আরো বিস্মৃত হয়েছেন যে, বাংলাদেশের জনগণ তাকে ধারাবাহিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে এসেছে এবং ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানমন্ডি থেকে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তার একদা নেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকর্মী কর্তৃক তিনি বহুবার অপমানিত হয়েছেন। যা হোক, গিনেজ বিশ্ব রেকর্ডে স্থান করে নেয়ার মতো দুর্বিনীত ব্যবহারের উদাহরণ দেখিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জরুরি অবস্থাপূর্ব ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সময় বঙ্গভবনের

www.pathagar.com

অক্সিজেন পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, জনাব ওবায়দুল কাদের এখন কারান্তরালে রয়েছেন এবং সেখানে অক্সিজেন প্রয়োজনমতোই পাচ্ছেন। প্রকৃতি সচরাচর সব দুষ্কর্মেরই প্রতিশোধ নেয় এবং সে একই নিয়মে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরাও তাদের হঠকারী রাজনীতির ভালোই প্রতিফল পাচ্ছেন। দেশের স্বার্থবিরোধী সংবাদমাধ্যম এবং বিদেশী তল্পিবাহক তথাকথিত সুশীল(?) সমাজের মুখচেনা নেতাদের পরিণতি দেখার জন্যই এবার বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রতীক্ষা।

ভূমিকান্তে এবার মূল প্রসঙ্গ। ধ্বংসাত্মক, দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্বৃত্তায়িত ও পরনির্ভর রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দেশবাসী এখন মৌলিক অধিকার রহিত জরুরি অবস্থায় পতিত হয়েছে। জনগণেরও এখানে কিছু ব্যর্থতা আছে। তবে সে আলোচনার জন্য এ নিবন্ধ নয়। জনগণের আকাংখা অনুযায়ী বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে, এ কাজে নিঃসন্দেহে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সীমাবদ্ধতা, এ প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা এবং ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত কর্মপরিকল্পনা আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ কথা অনস্বীকার্য, সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ প্রত্যাশা করে। এ প্রত্যাশাটি যেহেতু অনৈতিক, কাজেই তারা আবার একই সাথে এ আশংকাও পোষণ করে যে, এ বুঝি নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতিপক্ষকে অনৈতিক সুবিধা প্রদান করল। আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলোর এ পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকেই। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত, তিনটি নির্বাচনেই পরাজিত দল অবধারিতভাবে নির্বাচন কমিশনকেই দায়ী করেছে তাদের পরাজয়ের জন্য। বিশেষত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সূক্ষ্ম ও স্থূল কারচুপির তত্ত্ব তো দেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নির্বাচন কমিশনের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি প্রশাসনিকভাবে অদ্যাবধি প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন এবং এ পরাধীনতার মধ্য থেকেই তাদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ সংস্থায় দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতায় জেনেছি, ওই বিশেষ কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন পরিচালকও (উপসচিব) নিজেকে অতি ক্ষমতাধর বিবেচনা করেন এবং তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে সংস্থার কাজকর্ম সম্পাদন করা অতিশয় কঠিন হয়ে পড়ে। জানি না, বর্তমান বিশেষ সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে কর্মরত আমলাদের উন্নাসিক মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কি না। এ ছাড়া কমিশনের কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান অর্থ মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতাও যথেষ্ট সীমিত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার সাথে আবার রয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদমাধ্যমের অনৈতিক খবরদারি। জবাবদিহির এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের সর্ববিষয়ে মুরুব্বিয়ানার জন্য সর্বদা উদগ্রীব বিদেশীরা তো এখনো বাকি। এনডিআই, আইআরআই,

www.pathagar.com

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সবাই নির্বাচন কমিশনের একপ্রকার অঘোষিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এদের ধৃষ্টতা এতখানি যে, একবার ইউরোপিয়ান নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল আবদার ধরেছিল, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব প্রশাসনিক সভায়ও তাদের উপস্থিত থাকতে দিতে হবে। প্রত্যুত্তরে জানতে চাওয়া হয়েছিল, পৃথিবীর ক'টি দেশে বিদেশীদের এ ধরনের ক্ষমতা দেয়া হয়। বলাই বাহুল্য, এ প্রশ্নের জবাবে আবদারকারীরা নিরুত্তর ছিলেন। যা হোক, এ বিষয়টি আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, এত সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে বাংলাদেশে তিনটি পক্ষপাতহীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়েছিল।

২০০৭ সালে এসে আমরা বিগত তিনটি নির্বাচনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে শুধু ব্যর্থই হইনি, তার সাথে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করতেও নির্বাচন কমিশন বাধ্য হয়েছে। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ জানামতে একজন সৎ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বহীন রাজনীতিবিদ, দলীয় আইনজীবী, স্বার্থান্বেষী সুশীল(?) সমাজ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদমাধ্যমের অশোভন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। পাঠকরা অবগত আছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। বিচারপতি আজিজ এবং তার নির্দোষ পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি থাকলেও এ বিষয়টি মেনে নিতে হবে যে, সাবেক নির্বাচন কমিশনার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে দক্ষতার প্রমাণ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে একটি গ্রহণযোগ্য ভোটার লিস্ট তৈরি করতে না পারার ব্যর্থতা অবিশ্বাস্য ও অমার্জনীয়। দেশের এক বিপর্যস্ত ও জটিল পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য তিন নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং দেশের স্বার্থেই দল-মত নির্বিশেষে সব নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তিন মাস অতিবাহিত হলেও নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে এখনো প্রত্যাশিত গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং কমিশনারদের বক্তব্য-বিবৃতিতে প্রায়ই অসামঞ্জস্য ও সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক-এগারোর পরবর্তী দুই মাস নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও উপদেষ্টামন্ডলী একে অপরের কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে পার করেছেন। তারপর ৫ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৮ মাসের নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য সময়সীমাসহ কিছু লক্ষ্যের কথা জানালেন, যার মধ্যে ছবিসহ ভোটার লিস্ট, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, নির্বাচনী আইন সংস্কার ইত্যাদি রয়েছে। এর সাত দিন পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ২০০৮ সালের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ এ ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে প্রশংসা করায় প্রতীয়মান হচ্ছে, এ সময়সীমা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। এখন প্রশ্ন হলো, সরকার কি প্রকৃতপক্ষেই এ সময়সীমার মধ্যে সব সংস্কার সম্পন্ন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে?

নির্বাচন কমিশনকে সর্বপ্রথমেই বেশ বড় অংকের অর্থের সংস্থান করতে হবে। ছবিসহ ভোটার লিস্ট প্রণয়নের জন্য নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৪৫০ কোটি টাকা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। এ অর্থ সংস্থানের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নসহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থাকে অনুরোধ জানিয়েছে। সরকারে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা, উন্নয়ন সহযোগীরা এ অর্থ সাহায্য করতে রাজি হলেও এতদসংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শেষ করতে কমপক্ষে এক বছর প্রয়োজন হবে। কাজেই ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে নির্বাচন কমিশনের ভোটার লিস্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ৪৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা না হলে যে ২০০৮ সালে সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সংশ্লিষ্টদের অনুধাবন করতে হবে, বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে যেখানে প্রায় ৬ কোটি নাগরিক দারিদ্র্যসীমা এবং চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে কোনো স্থায়ী আবাসস্থল ব্যতিরেকে বসবাস করে, সে দেশে ছবিসহ ভোটার লিস্ট তৈরি করা অত্যন্ত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। সমস্যা হচ্ছে, কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, এ সহজ সত্যটি অনেকেই উপলব্ধি করেন না। নইলে বর্তমান সরকারের একজন উপদেষ্টা ক্ষমতায় আরোহণের আতিশয্যে বলতেন না, ছয় মাসের মধ্যেই ১৫ কোটি নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা সম্ভব। দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী বাধা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের দাবিকৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সংগ্রহ করা। বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের অপরিহার্যতা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিদেশী মুরুব্বি এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীদের নব আবিষ্কার। পৃথিবীর ক'টি দেশে এ বস্তুটি ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে জানার তেমন কোনো চেষ্টা না করেই এবং এটি ছাড়াই বাংলাদেশে এতগুলো সফল নির্বাচন হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়েই কোন্ উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিদেশ ভ্রমণরত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত বানালেন, তা তিনিই ভালো জানেন। কিন্তু কী আর করা যাবে, শেখ হাসিনার দাবি বলে কথা। দাবি পূরণ ছাড়া তো আর নির্বাচন সম্ভব নয়। নিজের ফাঁদে নিজে পড়ার এমন চমৎকার উদাহরণ রাজনীতিতে বোধ হয় খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

আমাদের অনেক স্বঘোষিত মুরুব্বির মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র মুরুব্বি ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত বহুল আলোচিত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের একটি নমুনা সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনকে দেখিয়েছেন। টেলিভিশনের পর্দায় ব্যালট বাক্সের চেহারা দেখে সেটিকে বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য মনে হয়নি। সংবাদ ভাষ্যের মাধ্যমে জেনে আরো চমকিত হলাম যে, এ ব্যালট বাক্সগুলো নাকি নেপাল, ভুটান, জাম্বিয়া ও আফগানিস্তানে প্রস্তুত অথবা ব্যবহৃত হয়। এ চারটি দেশের সর্বমোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৭ কোটি এবং রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই অল্প-বিস্তর জানি। কী কারণে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের কাছে মনে হলো যে, বাংলাদেশ এ চারটি রাষ্ট্রের সাথে তুলনীয়, তা অবশ্য তিনিই ভালো জানেন। তবে অধিকাংশ পাঠকই অবগত আছেন, ডেনমার্কে একটি চরম দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতায় এবং তারা চরমভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশন মানা আমাদের জন্য অবমাননাকর বলেই আমার বিশ্বাস। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ এদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে যথার্থ ও ঈমানদারের কাজই করেছিলেন। যাহোক, ছবিসহ ভোটার লিস্ট তৈরি ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সংগ্রহ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে

www.pathagar.com

আলোচনাক্রমে নির্বাচনী আইন সংস্কারসহ রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের কাজগুলো সেরে ফেলতে পারে। শেষোক্ত কাজ সম্পাদনের এখন পর্যন্ত বাধা হচ্ছে, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর সরকারি বিধিনিষেধ। নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন ইতোমধ্যে বলেছেন, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ৮ মে'র পর প্রত্যাহার করা হবে এবং তারপর নির্বাচন কমিশন রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনা শুরু করবে। এদিকে অপর নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসেন এ বিষয়ে বলেছেন, ৮ মে'র মধ্যে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে কি না, এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কিছু জানে না। বর্তমান সরকারের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, তারা সবাই সব বিষয়ে সব কথা বলছেন এবং পরিণামে তাদের অনেকেই বিভিন্ন কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রকাশ্যে বিব্রত হচ্ছেন। এ সমন্বয়হীনতা একটি সরকারের অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্বতার লক্ষণ। এ রকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সঠিক ও বাস্তবসম্মত মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা। তিনি বলেছেন, সরকারের নেয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এতে করার কিছু নেই।

নির্বাচন কমিশন তাদের নিজস্ব বিবেচনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নির্বাচন আইন সংস্কার নিয়ে প্রথম মতবিনিময় সভাটি দিন সাতেক আগে সম্পন্ন করেছে। সেখানে উপস্থিত বিশিষ্টজনরা বেশ কিছু পরামর্শ, সুপারিশ ও প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই সভায় সুশীল(?) সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী এক অর্থনীতিবিদের ইউ টার্নটি দর্শনীয় ছিল। তিনি এখন বলছেন, এনজিওগুলোর ক্ষেত্রে পদত্যাগের তিন বছর পর নির্বাচন করার বিধিটি গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিধিটি ঠিকই আছে। সুশীল(?) সমাজের দাবিদার এ ধরনের উৎপাদনবিমুখ, পরজীবী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ জাতীয় স্ববিরোধিতাপূর্ণ বক্তব্যে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, যারা বিদেশী অর্থে এনজিও চালান, তাদের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে রহিত করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে যে, বিদেশের এ জাতীয় অর্থ বিনা উদ্দেশ্যে এ দেশে আসে না এবং বিদেশী অর্থে পুষ্ট ব্যক্তিদের মস্তক নানা কারণে ইতোমধ্যে স্ব স্ব প্রভুর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। এনজিও নেতারা বলছেন, সরকারি কর্মকর্তাদের অনেক ক্ষমতা বিধায় তারা চাকরি থেকে অবসরের পরও নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এনজিও কর্মকর্তারা নাকি এ ধরনের কোনো ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে, বিদেশী সমর্থনপুষ্ট বেশ কিছু এনজিও দেশে প্রায় সমান্তরাল একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে এবং এ কারণেই তাদের ক্ষমতাও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতার সাথেই তুলনীয়। আসল কথা হচ্ছে, নির্বাচনবিষয়ক কর্মকান্ডের মুখ্য চরিত্র রাজনীতিবিদরা এবং নির্বাচন কমিশন যত দ্রুত তাদের সাথে আলোচনা শুরু করতে পারবেন, তত দ্রুত আমরা ঘোষিত নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হতে পারব। জনশ্রুতি অনুযায়ী এক-এগারোর রাজনৈতিক ভূকিকম্পের প্রধান দুই অনুঘটক যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আগামী নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিস্ময়করভাবে সম্প্রতি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট নিকোলাস বার্নস বলেছেন, 'এক বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন সম্পন্ন করা। কিন্তু সে বিষয়ে তাদের কোনো প্রস্তুতি বা উদ্যোগ মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বরং অহেতুক বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।' আর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনার মি. আনোয়ার চৌধুরী ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে বলেছেন, 'সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ইসি কঠোর পরিশ্রম করছে। এ জন্য তাদের আমরা সমর্থন করি। সরকার ২০০৮ সালের মধ্যে যে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছে, তা এমন একটি নির্বাচন হবে, যা এ দেশের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।' এখন পাঠকরাই বলুন – বেচারা সরকার যাবে কোথায়? অবস্থাদৃষ্টে আশঙ্কা জাগে, বর্তমান বিশ্বের একমাত্র মুরুব্বি এবং তার বশংবদ ইউরোপীয় দোসর বাংলাদেশকে পরীক্ষাগার বানিয়ে কোনো সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছে কি না। তাদের যৌথ প্রকল্পের তিক্ত ফসল আমরা আফগানিস্তানে দেখেছি, ইরাকে দেখেছি, নিকট ভবিষ্যতে হয়তো ইরানেও দেখতে যাচ্ছি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী ও সরকারের সজাগ থাকা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই একান্ত আবশ্যক। মনে রাখা দরকার, ইরাকে সিআইএ এজেন্ট আহমেদ ছালাবি এবং তার ষড়যন্ত্রকারী সঙ্গীরা যেমন করে সারা বিশ্বে ইরাকের কথিত মানবপ্রাণ ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ইরাকে বিদেশী আগ্রাসনের ভিত্তি রচনা করেছিল, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশেও একটি চিহ্নিত বিশেষ সমাজ ও তাদের সহযোগী সংবাদমাধ্যম বিশেষ উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরেই দেশে-বিদেশে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছে। আমাদের সরকারগুলোর ধারাবাহিক ব্যর্থতা হচ্ছে, দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডের অসংখ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

যা হোক, দেশের বর্তমান জটিল অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে একটি পক্ষপাতহীন, সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নীতিনির্ধারকদের অনুধাবন করতে হবে, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং কোনো সংস্কারই রাতারাতি সম্পন্ন করা যায় না। সংশ্লিষ্টদের আরো উপলব্ধি করা প্রয়োজন, জনগণের সম্পৃক্ততাবিহীন সংস্কার কাঙ্ক্ষিত ফলও আনতে পারে না। কাজেই সরকারের এখন নির্বাচন সম্পর্কিত সংস্কারকেই প্রাধান্য দিয়ে ২০০৮ সালের মধ্যেই ঘোষিত আগামী সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিদেশীদের দ্বারস্থ হওয়ার পরিবর্তে নিজের সম্পদ ব্যবহার করাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বোধ হয় সমীচীন হবে। এ তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের আশায় আমাদের সার্বভৌমত্বকে দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকদের দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত তোষণ করা হয়েছে। আমাদের দুর্বলতার এ সুযোগ গ্রহণ করেই সম্প্রতি ওয়াশিংটনে এক সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, এ দেশে সামরিক শাসন হলে জাতিসংঘ শান্তি বাহিনীতে বাংলাদেশী সেনা নিয়োগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এক-এগারোর আগে

www.pathagar.com

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য করানোর জন্যও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একই জুজুর ভয় দেখিয়েছিল। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জিম্মি করার এ প্রচেষ্টা আর চলতে দেয়া যায় কি না, তা দেশবাসীকে এবার বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন আমাদের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং বর্তমান সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, বিদেশীদের এই খবরদারিকে উপেক্ষা করে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আস্থায় নিয়ে কোনোরূপ বিলম্ব ব্যতীত ইতোমধ্যে ঘোষিত ২০০৮ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে এবং দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে পরিচালিত হলে আমি নিশ্চিত, মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারী ব্যতীত দল-মত নির্বিশেষে এ দেশের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠী সরকারের পাশে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান নেবে। অন্যথায় নয়।

০৩.০৫.০৭

www.pathagar.com

কাঠগড়ায় রাজনীতিবিদ

আমাদের দেশের রাজনীতিতে সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির কখনো অভাব হয়নি। মণিকাঞ্চন নগদে প্রাপ্তি কিংবা প্রাপ্তির আশা থেকে এ দেশের বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বহুবার স্তাবকের ভূমিকায় দেখেছে এ দেশের আমজনতা। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য কত বড় বড় বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। আবার তারাই ১৫ আগস্টের মর্মন্তুদ পট পরিবর্তনের পর বাকশাল ও শেখ মুজিবের নিন্দায় মুখর হয়েছেন। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া ও স্বৈর সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের দল গঠনের সময়ও মধুলোভী, সুযোগসন্ধানীদের অভাব হয়নি। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের নবরূপে যাত্রাকালে দেশের সাধারণ নাগরিক এ ধারার অবসান প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথাকথিত ঐকমত্যের সরকারে বিএনপি'র দুই সংসদ সদস্য যোগ দিয়ে মন্ত্রী পদ বাগিয়ে নিয়ে প্রমাণ করেছিলেন আদর্শবিহীন রাজনীতি থেকে আমাদের শিগগিরই মুক্তি মিলবে না। আগের ধারাবাহিকতায় দেশের বর্তমান রাজনীতিশূন্য পরিস্থিতিরও সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছে নব্য স্তাবকবৃন্দ। রাজনীতিবিদদের অনৈতিক পন্থায়, স্বল্প সময়ে বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হওয়ার উদগ্র বাসনা এবং একটি বিশেষ চিহ্নিত মহল পরিচালিত দেশে-বিদেশে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার মিলিত ফসল আজকের এ জরুরি অবস্থা। বর্তমান সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার উদ্দেশ্যে এ বিশেষ শ্রেণীর সদস্যরা এবার সত্য-অসত্য মিলিয়ে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এদেরই এক নেতা যিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিডিয়ার কল্যাণে দেশের তাবৎ অর্থনীতিবিদকে পেছনে ফেলে দেশের সেরা অর্থনীতিবিদ বনে গেছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'দেশে দলীয় রাজনীতির নামে দলীয়করণ করে এতদিন মেধাহীনতার চর্চা করা হয়েছে। দেশে যে গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা হয়েছে, তা এগিয়ে নেয়ার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এগিয়ে নেয়া।' চমকিত হওয়ার মতো বক্তব্য। প্রথমত, আমার সীমিত জ্ঞানে এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এখন যারা প্রকাশ্যে অথবা নেপথ্য থেকে দেশ পরিচালনা করছেন, তাদেরকেই মেধাহীন বলে গালি দেয়া হয়েছে। কারণ আমার জানা মতে, সরকারের বর্তমান নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশকেই তাদের স্ব স্ব অবস্থানে বিগত চারদলীয় জোট সরকারই বসিয়েছিলেন। এ বিষয়ে 'কেমন ছিল চারদলীয় জোট সরকারের প্রশাসন?' শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর জরুরি অবস্থা যে গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করে, এ নতুন তথ্যটি জেনেও দেশবাসী যে অত্যন্ত প্রীত হবেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রলোক তার স্তাবকতাপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে ফেলেছেন এবং তার অপরিসীম মেধারও প্রমাণ রেখেছেন। আমরা বিশ্বাস করতে চাই,

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শাসন ব্যবস্থার একটি অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। তবে এ পরিবর্তন আনতে চাইলে বিগত ৩৬ বছরের বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করে তাদের কর্মকান্ডের নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে হবে। আর অতি অবশ্য সুযোগসন্ধানী, স্তাবকবৃন্দের কাছ থেকে যে শত হস্ত দূরে থাকতে হবে, সে বিষয়ে আমার আগের নিবন্ধগুলোতেই সাহস করে একাধিকবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছি। তবে ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, কোনো সরকারই এ জাতীয় সাবধানবাণীতে সচরাচর কর্ণপাত করে না। কারণ ক্ষমতাবানরা সর্বদাই স্তাবক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে পছন্দ করেন।

যা-ই হোক, আজকের বাস্তবতা হচ্ছে রাজনীতিবিদরা প্রতিনিয়ত চরম আক্রমণের মুখে রয়েছেন। নিজেদের অস্তিত্বের খাতিরেও যে আপস করার প্রয়োজন হয়, এ সত্যটি বিগত ১৫ বছরে তারা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের বর্বর প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাতারাতি বিপুল সম্পদশালী হওয়ার কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা। এসব অবিবেচনা প্রসূত আচরণের প্রতিফল আজ অবশ্য তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। স্ত্রী-সন্তানসহ এতটা অসম্মানের সম্মুখীন রাজনীতিবিদরা এই উপমহাদেশে সম্ভবত আগে কখনো হননি। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখলের পর দেশের বৃহৎ দুটি দলের দুই প্রধান নওয়াজ শরিফ ও বেনজির ভুট্টোকে সপরিবারে দেশ ত্যাগে বাধ্য করালেও অন্য রাজনীতিবিদদের বাংলাদেশের মতো এতটা হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়নি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, নেতৃবৃন্দের এ শাস্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আপাত দৃষ্টিতে খুশিই হয়েছেন। জনগণের সাথে তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের যে কতটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা সাধারণ জনগোষ্ঠীর এ উদাসীনতা থেকেই প্রতীয়মান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মফলের সাজা ভোগ করে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ হবেন অথবা পরিশুদ্ধ হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন, এতে দেশবাসীর আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। তবে যখন স্তাবকবৃন্দ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হেয় করার নামে বাংলাদেশের ৩৬ বছরের অর্জনকে অস্বীকার করছেন, তখন আপত্তি না করলেই বরং আমরা মাতৃভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হব। সুযোগসন্ধানী স্তাবকবৃন্দের এ জাতীয় বক্তব্য অনিচ্ছাকৃত ভুল নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্তের অংশ, এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা আমাদের স্বার্থেই প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্জনগুলো এবার দেখা যাক।

১৯৯১ সালে নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রথম সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় শূন্য ভাঁড়ার নিয়ে। আশির দশকের অধিকাংশ সময় ধরে ক্ষমতায় আসীন সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের দুর্নীতি ও চরম অর্থনৈতিক অবব্যস্থাপনার ফলে দেশের অবস্থা এমনই করুণ হয়েছিল যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ আশির দশককে আমাদের দেশের জন্য একটি হারিয়ে যাওয়া দশক হিসেবেই বিবেচনা করেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার যে সঞ্চয় বর্তমানে চার বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে, তার পরিমাণ ১৯৯০ সালে মাত্র ৭০০ মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ছিল।

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এ যৎসামান্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের কারণে সে সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমদানি ঋণপত্র খুলতেও নিরুৎসাহিত বোধ করত। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে বাংলাদেশের জিডিপি'র পরিমাণ, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু জাতীয় আয়, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ, রফতানি আয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণ এবং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হার সূচক ছিল যথাক্রমে ১২ হাজার কোটি টাকা, ৫.০০, ২১৮ মার্কিন ডলার, ১১.৫০, ১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা এবং ১০৭। এর ১৫ বছর পর অর্থাৎ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে একই অর্থনৈতিক সূচকগুলোর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, ৬.৭০, ৪৮২ মার্কিন ডলার, ১৮.৭০, ১০.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২২ হাজার কোটি টাকা এবং ১৪৯। যেকোনো মানদন্ডেই একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে এ এক উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য। এর ফলে বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ৯ শতাংশ অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ১.৮০ শতাংশ কমেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ হার সার্কভুক্ত ও এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। আমাদের প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের পক্ষেও কিন্তু এ হারে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়নি। দেশে ও বিদেশে অব্যাহত বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আঙ্কটাড এবং মার্কিন বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান সাকস্-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির নব উত্থানের কথা বেশ প্রশংসা সহকারে বলা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব, একটি দেশে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং সে রাষ্ট্রের সম্পদ বন্টনে যদি বিশাল কোনো অসামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে অন্যান্য খাতও এ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিগত ১৫ বছরে এ দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে, প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের ভর্তি বেড়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা বেড়েছে। বিগত তিনটি সরকারই নারীর ক্ষমতায়নকে প্রাধান্য দেয়ায় বাংলাদেশে নারী-পুরুষ বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) নারী-পুরুষ বৈষম্যসংক্রান্ত ২০০৬ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসের মানদণ্ডে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্ব এবং সার্ক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। এমনকি সমগ্র এশিয়ার মধ্যেও আমাদের স্থান চতুর্থ। বিগত পাঁচ বছরে আমাদের দেশকে 'তালেবানি রাষ্ট্র' হিসেবে প্রচার করার প্রচেষ্টা বিদেশী শক্তি এবং তাদের এ দেশীয় সুশীল(?) বন্ধুরা কম করেননি। দেশী-বিদেশী প্রচারযন্ত্র সর্বদাই সার্ক অঞ্চলে ভারতকে একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে আমাদেরকে ভারতের অনুগামী হতে পরামর্শ দিয়েছে। অথচ নারী-পুরুষ বৈষম্যের মানদন্ডে সুশীল(?) সমাজ কর্তৃক নিন্দিত আধা তালেবানি রাষ্ট্র বাংলাদেশের অবস্থান ৩৮ এবং ভারতের অবস্থান ৫৩। এবার আসি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে। গত ১৫ বছরে অধুনা বহু নিন্দিত রাজনীতিবিদ কর্তৃক পরিচালিত তিনটি সরকারের সময়কালে বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলায় প্রশংসনীয় উন্নতি করে টেস্ট খেলার

www.pathagar.com

যোগ্যতা লাভ করেছে। এ ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত বর্তমান বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ক্রিকেটে মহা শক্তিধর ভারতকে পরাজিত করে দ্বিতীয় পর্বে উন্নীত হয়েছে এবং ১০০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিশ্বের এক নম্বর দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে সারা বিশ্বের ক্রিকেট বোদ্ধাদের পুনর্বার অবাক করেছে। এ সময়ের মধ্যেই গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস নোবেল পুরস্কার জয় করে বাংলাদেশকে গর্বিত করেছেন। এত অর্জনের পরও কি আমাদের মাতৃভূমির ললাট থেকে ৩৬ বছরে কিছু না হওয়ার কলংক মুছবে না?

আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম ও সুশীল(?) সমাজ এ দেশের তাবৎ সমস্যা এবং অনগ্রসরতার জন্য রাজনীতিবিদদের এককভাবে দায়ী করে চলেছেন। তাহলে দেশের তাবৎ সাফল্য এবং অর্জনের জন্য রাজনীতিবিদদের ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে? বাস্তবতা হলো সমাজের আর সব অংশের মতোই ব্যর্থতা ও সফলতা এবং ভালো ও মন্দ মিলিয়েই রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে বাংলাদেশ এখনো প্রধানত একটি গ্রামীণ রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রে স্থানীয় গণপ্রতিনিধিরা এলাকার উন্নয়নে সচরাচর যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও এলাকার মানুষ সর্বপ্রথম যাদেরকে কাছে পায়, তারা কিন্তু স্থানীয় রাজনীতিকরাই। এ সত্যটি উপলব্ধি করেই বর্তমান সরকারকে স্বার্থান্বেষী স্তাবকশ্রেণীর প্রচারণাকে মূল্যায়ন করতে হবে। নীতিনির্ধারকদের একই সাথে তাদের চ্যালেঞ্জের বিশালত্বও অনুধাবন করা প্রয়োজন। একটি দুর্বল অর্থনীতিকে সবল করা যত কঠিন, তার চেয়ে অধিকতর কঠিন একটি সবল অর্থনীতিকে সবলতর করা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০০৬-০৭ সালের অর্থনৈতিক সূচকের প্রাক্কলিত হিসাব পর্যালোচনা করলেই আমার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পূর্বাভাস অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৬.০০ এবং ৬.৫০, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল বিগত তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬.৭০। এটি অনস্বীকার্য যে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি যেকোনো মানদন্ডেই উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কিন্তু একই সাথে এও স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। বর্তমান নীতিনির্ধারকদের আরো মনে রাখতে হবে, বর্তমান বছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ধারাবাহিকতা মাত্র। তাদের উপলব্ধি করতে হবে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সূচকের সূত্রপাত হবে বর্তমান অর্থবছরের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং এ বছরের তিন-চতুর্থাংশ সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিবিধ পণ্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্রের হিসাব পর্যালোচনা করলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মন্দার আভাস ভালোভাবেই পরিলক্ষিত হয়। জানুয়ারি-০৭ থেকে মার্চ-০৭ এ তিন মাসে মোট ঋণপত্র খোলা হয়েছে ৩ হাজার ৯২৫ মার্কিন ডলারের। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে একই সময়কালে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ২০ মার্কিন ডলার। জুলাই-০৬ থেকে সেপ্টেম্বর-০৬ এবং অক্টোবর-০৬ থেকে ডিসেম্বর-০৬ এ দুই ত্রৈমাসিক সময়কালে ঋণপত্র খোলার

www.pathagar.com

পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ হাজার ২৬৫ এবং ৪ হাজার ৫৯৯ মার্কিন ডলার। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেও ঋণপত্র খোলার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের প্রথম সপ্তাহের তুলনায় ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিগত পাঁচ বছরে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানিতে অব্যাহতভাবে বছরে গড়ে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা গেছে। তার অর্থ এ সময়কালে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেগবান ছিল। ঋণপত্রসংক্রান্ত এ তথ্য অর্থ উপদেষ্টাকে উদ্বিগ্ন করার জন্য যথেষ্ট বলেই আমি মনে করি। ঋণপত্র খোলার নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী অর্থবছরে যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বর্তমান বছরের চেয়ে হ্রাস পাবে – এ আশঙ্কার কথা জোরের সাথেই বলা যায়। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আয়তনের ঘনবসতিপূর্ণ নিম্ন আয়ের একটি দেশ পরিচালনা মোটেই সহজসাধ্য নয়। দরিদ্র এ দেশে জনগণ ওই সরকারই কামনা করে, যারা তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হবে। আশংকার বিষয় হচ্ছে যে, আপাতদৃষ্টিতে জনগণের সাথে সম্পর্কহীন, শিকড়বিহীন সুশীল(?) সমাজ ইতোমধ্যে সরকারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে এবং এ শ্রেণীর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য অর্জিত নাও হতে পারে।

০৫.০৫.০৭

www.pathagar.com

কী কথা তাহার সনে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তার লন্ডনে নাটকীয় নির্বাসনকালীন সময়ে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সাথে যোগাযোগের কথা স্বীকার করে তার এবং ভারত সরকারের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের বিষয়টি বেশ সাহস ও স্বচ্ছতার সাথেই পুনর্বার জনসমক্ষে এনেছেন। শেখ হাসিনা ভারতীয় সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি আমার সাথে কথা বলেছেন এবং ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনার কমলেশ শর্মা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।' ভারতের প্রশংসা করে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট নেত্রী ওই সাক্ষাৎকারে আরো বলেন, 'আওয়ামী লীগ সবসময় ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে মূল্যবান মনে করে এসেছে। আমার শাসনামলেই গঙ্গা নদীর পানির ভাগ নিয়ে ভারতের সাথে ৩০ বছরের চুক্তি সম্পাদিত হয়। যখন আমরা ক্ষমতায় আসি, তখন ৬৪ হাজার বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ভারতে বসবাস করছিল, কিন্তু আমি ক্ষমতায় থাকার সময় এ উদ্বাস্তুদের প্রত্যেককে ফেরত নিয়ে আসি।' এ সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার বক্তব্যের মধ্য থেকে চারটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ভারত সরকারের সাথে তার বিশেষ সখ্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তার সরাসরি কথা প্রসংগে, যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দেশবাসী অদ্যাবধি অন্ধকারে। তৃতীয়ত, ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গার পানি চুক্তি এবং চতুর্থত, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শান্তি বাহিনীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি। শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে শেষোল্লিখিত দুটি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারটিকে একদিকে যেমন ভারতের সাথে তার মধুর সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, অন্যদিকে ঘটনাটিকে তার সরকারের সাফল্যরূপেও জাহির করেছেন।

প্রথমেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সাথে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নৈকট্যের কারণে আমাদের দেশের একশ্রেণীর আবেগতাড়িত রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীকুল ভারতকে পরম মিত্র দেশরূপে বিবেচনা করতে পছন্দ করে। বেশিরভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই হয়তো একমত হবেন, বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে বন্ধুরাষ্ট্র বলে কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই, যা আছে তা হলো প্রতিযোগী রাষ্ট্র, আশ্রিত রাষ্ট্র এবং কৌশলগত মিত্র সরকার। পাঠকদের নিশ্চয়ই নজর এড়ায়নি যে, শেষোল্লিখিত ক্ষেত্রে আমি রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকার বলেছি। কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র স্থায়ী হলেও সরকার একটি পরিবর্তনশীল সত্তা এবং সরকার পরিবর্তনের সাথে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কেরও পরিবর্তন হতে পারে। এমনকি কৌশলগত কারণে মিত্র সরকার শত্রু সরকারে পরিণত হওয়ারও বহু নজির আমাদের জানা আছে। পাঠকরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি, আশির দশকে সাদ্দাম

www.pathagar.com

হোসেন এবং তার সরকার মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কৌশলগত মিত্র ছিল। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাক শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক অস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্র ও গোয়েন্দা তথ্যের জোরেই। একদা পরম মিত্র সেই সাদ্দাম হোসেনকেই পবিত্র ঈদের দিনে যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল সরকার প্রভুর মৌন সম্মতিতে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করতে কোনোরকম দ্বিধা করেনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিধাতাদেরও স্মরণে রাখা উচিত, সাময়িক কৌশলগত মিত্রের পরিণতি সবসময় খুব সুখকর হয় না।

আশ্রিত রাষ্ট্রের সবচেয়ে সফল উদাহরণ ইসরাইল। মাত্র ৭০ লাখ জনসংখ্যার দেশ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে আবারো সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নহীন সমর্থনের কারণে। অবশ্য সঙ্গত কারণেই অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র এবং এই ক্ষুদ্র কট্টর সাম্প্রদায়িক ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আশ্রিত রাষ্ট্র কোনটি? যা-ই হোক, আমার অতি সীমিত জ্ঞানে নির্মোহভাবে বিচার করলে ভারত আমাদের বন্ধুও নয়, শত্রুও নয়। এরা আমাদের একটি কঠিন প্রতিযোগী রাষ্ট্র। সীমানা নিয়ে কোন্ রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সমস্যা? ভারত। পানির ভাগ নিয়ে কাদের সাথে আমাদের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব? ভারত। বাংলাদেশ একদা সোনালি আঁশের দেশ নামে পরিচিত ছিল। সে সোনালি আঁশ অর্থাৎ পাটের ব্যবসা কোথায় চলে গেছে? ভারতে। আমাদের বর্তমান রফতানি ১২৫০ কোটি মার্কিন ডলারের ৭৫ ভাগ যে খাত থেকে আসে, সে বস্ত্র খাতের প্রধান প্রতিযোগী কে? আবারো সেই ভারত। কোন্ দেশের সাথে আইনসিদ্ধ এবং আইনবহির্ভূত সীমান্ত বাণিজ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন? সেটিও ভারতের সাথেই। সীমান্তে আমাদের অসহায় জনগণ প্রতিদিন কোন্ দেশের সীমান্তরক্ষীর গুলিতে নির্মমভাবে মারা যাচ্ছে? কেন, ভারতের। তবে এ দেশটির সাথে এত তীব্র প্রতিযোগিতার পরও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণের একটি অংশ যে ভারতপ্রেমে অন্ধ, এটিও কঠিন বাস্তবতা। ক'দিন আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বাসায় চুরি হয়েছে। এ ধরনের চুরির ঘটনা ঢাকায় অহরহ ঘটছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এ জাতীয় অপরাধ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের গৃহে চৌর্যকর্ম বলে কথা। সাথে সাথে শোকে কাতর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ইসমত কাদির গামা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে চুরির ঘটনায় দুঃখ ও নিন্দা প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার পেছনে তারা ষড়যন্ত্রের গন্ধও পেয়ে গেলেন। এক সাধারণ চুরিতে এদের এত মর্মবেদনা অথচ বাংলাদেশের অতি দরিদ্র নাগরিকরা অহরহ যখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়, তখন আমরা আজাদ সাহেবদের টিকির সন্ধানও পাই না। সুতরাং ভারতের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের স্বরূপটি জনগণের পাশাপাশি বর্তমান শাসকদেরও উপলব্ধি করতে হবে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই শেখ হাসিনার সাথে প্রণব মুখার্জির আলাপচারিতার বিষয়বস্তুটিও জনগণের জানা উচিত।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সাথে ভারত এবং বিশেষত ভারতীয় কংগ্রেস দলের যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এটি কোনো গোপন সংবাদ নয়। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পর সে সময় ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে সপরিবারে দিল্লিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া কংগ্রেস সরকারের বদান্যতায় ভারতীয় পরমাণু কেন্দ্রে একটি চাকরিও পেয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল শেখ হাসিনাকে দিল্লি থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের আতিথ্যেই ছিলেন। তার প্রত্যাবর্তনের এক মাসের মধ্যে তৎকালীন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন এবং এক বছরের মধ্যে সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এগুলো সবই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার অব্যাহত সংগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট অতি তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। মোদ্দা কথা হলো, মানবিক কারণেই শেখ হাসিনা যে ভারত সরকার বিশেষত ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবেন এটিই বাস্তবতা। যেহেতু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি, কাজেই ধারণা করা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতির পট পরিক্রমায় শেখ হাসিনার ভারতীয় যোগাযোগ সর্বাবস্থায় বিশেষ ভূমিকায় আবির্ভূত হতেই থাকবে। উপরোল্লিখিত সত্যটি বিবেচনায় রাখলে আমাদের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হবে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরেকটি সাম্প্রতিক সংবাদ বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে ব্যর্থ নোবেলজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনূস কিছুদিন আগে কলকাতার এক পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তার প্রথম এবং প্রধান কাজই হবে ভারতের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে ড. ইউনূস সম্ভবত ভারত সরকারের কাছে একটি বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন। বার্তাটি এ রকম হতে পারে – তিনি ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে শেখ হাসিনার চেয়েও অধিক কার্যকর হবেন এবং ভারতের বর্তমান শাসকদের সুদৃষ্টি এখন তার দিকে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। দেখা যাক, ভারত সরকার বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ীর টোপ গেলে কি না। এদিকে দেশের একটি অতি সংবেদনশীল সময়ে আমাদের রাজনীতির আরেক রহস্য পুরুষ ড. কামাল হোসেনকে ভারত সরকারের তরফ থেকে নেহরু পুরস্কার দেয়া কোনো গভীরতর তাৎপর্য বহন করে কি না, তাও ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে। এমতাবস্থায় আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে অনুধাবন করতে হবে, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি অস্থিতিশীল সময় অতিক্রম করছে এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী যেকোনো পদক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের একতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে।

এবার ভারতের সাথে পানিচুক্তি এবং ভারত সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয়দের সংগঠন তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি, শেখ হাসিনা সরকারের এ দ্বিবিধ সাফল্য প্রসঙ্গে আলোচনা। বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী আঞ্চলিক পরাশক্তি

www.pathagar.com

ভারতের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে একটি পুরনো সমস্যা হলো দুই উজান-ভাটির দেশের মধ্যে গঙ্গা নদীর পানির ন্যায়সঙ্গত বণ্টন। ভারত ১৯৫১ সালে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথমত, উজানের পানি সরিয়ে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, ভাটির দেশ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং আজকের বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তার প্রাপ্য ন্যায্য পানির হিস্সা থেকে বঞ্চিত করে তার ওপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টি। ১৯৫১ সালে ভারতের এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রতিবাদ জানায় এবং বিষয়টিকে জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রেরণ করার প্রস্তাব করে। বলা বাহুল্য, সে সময় ভারত সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে বাঁধ তৈরির প্রাথমিক সমীক্ষা শুরু করে দেয়। ১৯৬১ সালে ভারত ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর ঘোষণা দেয় এবং পাকিস্তান সরকারের নির্লিপ্ততার সুযোগে ১৯৭০ সালে বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত করে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মহান মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এ কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাজের কাজ কিছু তো হয়ইনি, উপরন্তু তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের জন্য ন্যায্য পানির হিস্সা নিশ্চিত করা ব্যতিরেকেই ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, তৎকালীন একদলীয় বাকশাল সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালুর প্রতিবাদ না করে বরং সম্মতি দান করেন এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য একপ্রকার সর্বনাশ ডেকে আনেন। বলা বাহুল্য, ভারতের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধ আর পরীক্ষামূলক না থেকে অল্প দিনের মধ্যেই স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে।

এ অঘোষিত পানি যুদ্ধে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন সামরিক সরকার বিরোধটিকে জাতিসঙ্ঘে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ওই চুক্তিতে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পানি প্রাপ্যতার একটি গ্যারান্টি ক্লজ সংযুক্ত করা হয় । পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৮৫ সালে চুক্তির পরিবর্তে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং অবশেষে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের পক্ষে গ্যারান্টি ক্লজ অবলুপ্ত করে ৩০ বছর মেয়াদি একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ হলো যথাসম্ভব সংক্ষেপে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য চরম ক্ষতিকারক ফারাক্কা বাঁধের উপাখ্যান। শেখ হাসিনা তার ব্যক্তিগত অথবা দলীয় বিবেচনায় এ চুক্তিস্বাক্ষরকে তার সরকারের সাফল্য হিসেবে দাবি করতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফারাক্কা একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আগ্রাসনের প্রতীক এবং একদা প্রমত্তা পদ্মা পাড়ের মানুষের কাছে তাদের জীবন-জীবিকা বিনাশকারী এক অভিশাপের নাম। বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবারের হৃদয় নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে এ ফারাক্কা বাঁধের সাথে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার দীর্ঘ ২১ বছর পর সম্পাদিত চুক্তি বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য আজ আর কতটা অর্থ বহন করে সেটি বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমজনতার কাছে শেখ

www.pathagar.com

হাসিনার সাফল্যের এ দাবি ফাঁপা বলেই সর্বদা প্রতীয়মান হবে। বিভিন্ন বক্তৃতা মঞ্চে আবেগতাড়িত, অশ্রুসজল ও কণ্ঠরুদ্ধ শেখ হাসিনাকে দেখলে একজন কোমলহৃদয় রাজনীতিবিদ বলেই মনে হয়। অবাক লাগে স্বদেশের সর্বস্ব হারানো এ মানুষগুলোর বেদনা এ কোমল হৃদয় জননেত্রীকে স্পর্শ করে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতীয়দের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী, জঙ্গি সংগঠন শান্তি বাহিনীর সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সম্পাদিত শান্তিচুক্তি মূল্যায়নের আগে এ সংগঠনটির উৎপত্তির ইতিহাস জানা আবশ্যক। শান্তিবাহিনীর প্রথম সংগঠক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ মুজিব তাকে চাকমা, মারমা পরিচয় ভুলে গিয়ে বাঙালি হতে পরামর্শ দান করেন। কিছুটা মর্যাদাহানিকর এবং অকূটনৈতিক এ পরামর্শে মানবেন্দ্র লারমা বিক্ষুব্ধ হন, যা পরে তাকে শান্তি বাহিনী গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমদিকে এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে তেমন কোনো সমর্থন না দিলেও জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করার জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভারত সরকার শান্তি বাহিনীকে সব রকম সহায়তা দিতে শুরু করে। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে ভারতের আগ্রাসী ও অনৈতিক সামরিক সহায়তায় শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারত সীমান্তবর্তী অংশে রীতিমতো সশস্ত্র ও সর্বাত্মক যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এ দীর্ঘমেয়াদি বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যসহ পাহাড়ি ও সমতলের অধিবাসী মিলিয়ে অসংখ্য সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করার পরই কেবল ভারত সরকার বাংলাদেশবিরোধী এ কার্যক্রম বন্ধে সম্মত হয় এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শান্তি বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তিতে সম্মত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে ভারতের রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম ভারতের বন্ধু সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই শুধু সমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু এটি ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, এ ২০ বছরে একটি ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশকে তার বৃহৎ প্রতিবেশীর বৈরিতার কারণে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। যা-ই হোক, একটি রক্তক্ষয়ী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অব্যাহত ক্ষত থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য শেখ হাসিনা সঙ্গত কারণেই সাফল্য দাবি করতে পারেন।

বিগত ৩৬ বছরের অনেক সংগ্রাম, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা শেষে বাংলাদেশ আজ আবার একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে ভারতের গান্ধী পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম এবং নেহেরু পরিবারের পঞ্চম প্রজন্ম রাহুল গান্ধীর মন্তব্য আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি দাবি করেছেন, তার পরিবারই পাকিস্তানকে বিভক্ত এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার বিষয়ে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। তার এ অতি সংবেদনশীল বক্তব্য সঙ্গত কারণেই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অসম্মান করেছে। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের সুযোগ গ্রহণ করতে পাকিস্তান কোনো কালবিলম্ব করেনি। সে দেশের

www.pathagar.com

শাসকদল অর্থাৎ জেনারেল পারভেজ মোশারফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লীগের মহাসচিব ও সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুশাহিদ হোসেন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন–

"Mr. Rahul Gandhis statement citing the breakup of Pakistan in 1971 as an achievement of the Gandhi family show that the Indian strategy was clear from day one, namely, to partition its neighbor through sponsorship of state terrorism. India created and armed the Mukti Bahini just as it created and armed the Tamil Tigers in Sri Lanka. It is an irony of history that Frankenstein monster of terrorism and extremism that Gandhi created ultimately devoured her in the form of Khalistan movement through its leader Sant Jarnail Singh Bhindrawala."

(১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্ত করা সম্পর্কিত রাহুল গান্ধীর বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বিভক্ত করাই ভারতের কৌশল ছিল। ভারত শ্রীলঙ্কায় যেভাবে তামিল টাইগার তৈরি এবং সশস্ত্র করেছিল ঠিক সে একই কায়দায় সশস্ত্র মুক্তি বাহিনীকে সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের নির্মমতায় শ্রীমতি গান্ধী সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ জরনেল সিং ভিন্দ্রাওয়ালার রূপ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত তাকেই গিলে ফেলে) যে লাখ লাখ মহান শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, তাদের আত্মা নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এ নতুন বিবরণে কষ্ট পাবে। আশ্চর্য হচ্ছি সবর্দা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদারদের নীরবতা দেখে। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সম্মান রক্ষার চেয়ে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বাড়ির চৌর্যকর্মের বিষয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের আত্মা সর্বাংশে বিক্রি করার এমন উদাহরণ যেকোনো দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীকেই ব্যথিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে ভারতের সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী (India Establishment) কী ধরনের আত্মঅহমিকায় ভোগে তার প্রমাণ দিয়েছে 'আনন্দলোক' নামে কলকাতার এক বহুল প্রচারিত বিনোদন পত্রিকা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে এ বছর ২৭ মার্চ সংখ্যায় তারা লিখেছে, '১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, যাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলে জানি।' বাংলাদেশের যেকোনো আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক এই দাম্ভিকতায় বিরক্ত হবেন। ভারতের আরেক বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা, উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক অমর সিংহ গত বছর আবুধাবিতে এ নিবন্ধকারের সাথে আলোচনার সময় বাংলাদেশের প্রতি একই ধরনের উন্নাসিকতাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। আরো সম্প্রতি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের ১ মে তারিখের সংখ্যায় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের সম্ভাব্য ভারত সফর সম্পর্কে খবর পরিবেশনের সময় সেনাপ্রধান এবং আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছে। জনশ্রুতি আছে, আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে ভারত সরকারের অতি শক্তিশালী অংশ সাউথ ব্লকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই আনন্দবাজারের অবমাননাকর সংবাদকে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের শুধু প্রচারণা মনে করার সুযোগ আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

www.pathagar.com

এ জটিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বর্তমানে একটি অরাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং এ সরকার কমপক্ষে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে কিছুটা অস্থিরতা ও অনভিজ্ঞতার চিহ্ন দৃশ্যমান হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার জন্য একজন সাবেক সচিবকে বিশেষ দূত নিয়োগ একধরনের সিদ্ধান্ত হীনতার প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশে একজন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং একটি কর্তব্যরত পূর্ণাঙ্গ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ দেশের জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগ নিঃসন্দেহে বহুবিধ প্রশ্নের উদ্রেক করবে। এ সরকার যেহেতু জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয় এবং বর্তমানে দেশে কোনো জবাবদিহিমূলক সংসদও নেই কাজেই বিশেষ উদ্দেশ্যে দূত নিয়োগ পর্বটি আরো স্বচ্ছতার সাথে সবাইকে অবহিত করেই সম্পন্ন করা বোধ হয় উচিত ছিল। এর আগে কয়েকটি নিবন্ধে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি ক্রীড়াক্ষেত্র বানানোর অপপ্রয়াস সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছি। হঠাৎ করে নামগোত্রহীন তথাকথিত 'জাদিদ আল কায়েদার' সাম্প্রতিক আত্মপ্রকাশ দেশবাসীর সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করেছে। বাংলাদেশে বিশেষ সমাজ নামধারী একটি পঞ্চম বাহিনী বহুদিন ধরে ক্রিয়াশীল রয়েছে। বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারে তারা দুর্নীতি ও মৌলবাদ – এ দুই অস্ত্রকেই সহযোগী সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় কুশলতার সাথে ব্যবহার করে চলেছে। দুর্নীতিকে ব্যবহার করে আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বেশ ভালোভাবে লাইনচ্যুত করা গেছে। এবার সম্ভবত মৌলবাদকে ব্যবহার করে সার্বভৌমত্বকে সরাসরি আক্রমণের পালা। কাজেই সরকারের সর্বপ্রকার আত্মপ্রসাদমুক্ত হওয়া এবং জনগণকে সাথে নিয়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করার কোনো বিকল্প নেই।

১১.০৫.০৭

www.pathagar.com

সংস্কার এবং প্রস্থান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনীতির সংস্কার সাধনকে তাদের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। সংস্কারের রূপটি জনগণের কাছে পরিষ্কার করে উপস্থাপন না করলেও রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের এ পর্যন্ত অনুচ্চারিত অথচ জাতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিতর্কটি সরকার বেশ সাফল্যের সাথেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ সরকারের প্রধান মুখপাত্র ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রায়ই বলছেন যে, একই ব্যক্তির বার বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিংবা দীর্ঘদিন ধরে একাধিক পদে থাকা তার মতে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য খুবই লজ্জার বিষয়। তার বক্তব্যের নিশানা স্পষ্ট হলেও রাজনীতিকে পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মাইনাস টু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সরকার বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। অনেক রকম পরিকল্পনা করেও এক নেত্রীকে নির্বাসনে পাঠানো যায়নি এবং অন্যজনের প্রত্যাবর্তন রোধ করা যায়নি। সংশ্লিষ্টদের অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, সদা পরিবর্তনশীল বিশ্বে একই কৌশলের হুবহু অনুকরণ কঠিন কাজ। তাই বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্নে পড়শী মুল্লুকে যা সম্ভব হয়েছিল এ শতাব্দীর বাংলাদেশে সে একই কাজ করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। আমাদের রাজনীতিতে অবশ্যই সংস্কার প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা এক-এগারোর আগেও ছিল এবং মইনুল হোসেন বর্ণিত রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পর সম্ভবত কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সংস্কার এড়িয়ে রাজনীতি করা আর হয়ে উঠবে না। তবে সংস্কার যদি শুধু প্রধান নেতা বা নেত্রী অপসারণে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সে সংস্কারে মহল বিশেষের উদ্দেশ্য সাধিত হলেও তাতে দেশের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো উন্নয়ন হবে না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলাদেশে শতাধিক রাজনৈতিক দল থাকলেও এ দেশের রাজনীতি সর্বতোভাবেই প্রধান দুটি দলের ওপরই অদ্যাবধি নির্ভরশীল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জিয়াউর রহমান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ মরহুম শেখ মুজিব, উভয়ই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার এবং অনেকটা ঈশ্বর প্রদত্ত সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বিধায় তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ছাড়া এ দেশে কোনো ফলপ্রসূ রাজনীতি করা এখনো এক প্রকার কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা বর্তমান থাকতে দুই প্রধান দলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারে অন্য কারো ভাগ বসানোর প্রচেষ্টাও সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং এখানেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে উত্তরাধিকারতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা। সুতরাং এ কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সরকারকে রাজনৈতিক দল সংস্কার প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই নেত্রীর প্রবেশের ইতিহাস বিস্মৃত হলে নীতিনির্ধারকদের অমার্জনীয় ভুল করার আশংকা রয়েছে। ইতিহাসটি এমন নয় যে, বিএনপি

www.pathagar.com

ও আওয়ামী লীগ বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনা ব্যতিরেকে দল পরিচালনায় সুযোগ পায়নি। ১৯৭৫ সালে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ফলে একদলীয় এবং বিতর্কিত বাকশাল অবলুপ্ত হওয়ার পর নবগঠিত আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনাকে সভাপতি করা হয়নি। ১৯৮১ সালে বিপথগামী সেনা সদস্যদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে বিপুলভাবে জনপ্রিয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হলে বেগম জিয়া নন, উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারই বিএনপি'র চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছিলেন। উভয় দলেরই প্রভাবশালী নেতারা সেদিন তথাকথিত পরিবারতন্ত্র ছাড়াই দল পরিচালনার সুযোগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েই দলের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে দুই নেত্রীকে পরম আগ্রহে দলে বরণ করে নিয়েছিলেন। আজকের টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা পত্রিকার পাতায় বড় গলায় যারা তথাকথিত মাইনাস টু সংস্কারের ইঙ্গিত করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি সৃষ্টিতে অতি আগ্রহী ভূমিকা পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ তখনকার তুলনামূলকভাবে নবীন নেতৃত্বের অভিষেকে রীতিমত নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। দুই নেত্রীর রাজনীতিতে প্রাথমিক সময়ের সে পদচারণা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া নিবন্ধের স্বার্থে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্বৈর সামরিক শাসক এরশাদের ক্ষমতা দখলের এক বছর পর সামরিক শাসন চলাকালে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে বিচারপতি সাত্তার ৩৮ বছর বয়সের বেগম খালেদা জিয়াকে বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। তার রাজনীতিতে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিচারপতি সাত্তার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলে বেগম খালেদা জিয়া দলের চেয়ারপারসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ সাত বছর এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে অত্যন্ত সাহসিকতা এবং আপোষহীনতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে সফল গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে তার নেতৃত্বে বিএনপি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করলে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং খালেদা জিয়ার গৃহবধূ থেকে প্রধানমন্ত্রীত্বে রূপান্তর যে রাতারাতি কিংবা রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া ঘটেনি এ সত্যটি সর্বদা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। তারপরের বিএনপির ইতিহাস তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক হওয়ায় পুনরাবৃত্তি করে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। ১৯৭৫ সালে অপেক্ষকৃত তরুণ সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার সময় শেখ হাসিনা জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশে প্রত্যার্বতন সঙ্গত কারণেই নিরাপদ বিবেচনা না করে তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর একদলীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত অংশটিকে বাতিল করা হলে বাকশাল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে মিজান এবং মালেক উকিল নামক দুটি ব্র্যাকেটবন্দী নব আওয়ামী লীগের উদ্ভব ঘটে। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে মরহুম মালেক উকিল নিজে পরাজিত হলেও তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে (৩৯) জয়লাভ করে এবং সে দলের মরহুম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের কোন্দলে ক্ষত-বিক্ষত আওয়ামী লীগ পুনর্বার ভাঙনের সম্মুখীন হলে দলের ঐক্য বজায় রাখার জন্য আজকের জাতীয় সরকারের মুখ্য প্রবক্তা ও সম্ভবত মাইনাস টু কৌশলেরও প্রণেতা, ড. কামাল হোসেন নিজ উদ্যোগে মাত্র ৩৪ বছর বয়সী শেখ হাসিনাকে ১৯৮১ সালের মে মাসে দিল্লি থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং তিনি দলীয় সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এরপরও অবশ্য আওয়ামী লীগের সাময়িক ভাঙন রোধ করা যায়নি। আবদুর রাজ্জাক কিছুদিনের জন্য আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে আবার বাকশাল গঠন করেন এবং সুবিধা করতে না পেরে এক সময় আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮৬ সালে সারাদেশের মানুষের সাথে অনেকটা প্রতারণা করেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এরশাদের পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং হাসিনা সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর পদে নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে তিনি দলীয় সভানেত্রীর পদ ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দাবির মুখে এবং বাংলাদেশের স্বনামধন্য কবি মরহুম সুফিয়া কামালের অনুরোধে শেখ হাসিনা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনায় দলে তার অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয় এবং ড. কামাল হোসেন নিগৃহীত হয়ে দল থেকে বিতাড়িত হন। রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের দীর্ঘ ১৫ বছর পর অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করলে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কাজেই শেখ হাসিনাও যে খালেদা জিয়ার মতোই দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমেই জাতীয় নেত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন তা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। চেয়ারপারসন অথবা সভাপতি পদের জন্য কাউন্সিলারদের দ্বারা নির্বাচন হলেও যে এখনো এ দুই নেত্রীই জয়লাভ করবেন তাও বোধহয় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

এতক্ষণ ধরে দুই নেত্রীর রাজনৈতিক জীবনের পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে উত্তরাধিকারের রাজনীতি এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির পার্থক্যটি পাঠকসম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার বিবেচনায় খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার রাজনীতি পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি নয়, এটি একটি আদর্শিক উত্তরাধিকারের রাজনীতি। এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে তাহলে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি কোনটি? আমার জবাব হলো, যেকোনো নেতা বা নেত্রীর একাধিক সংসদ আসনে নির্বাচন করে বিজিত আসনটি অরাজনৈতিক স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নিকে উপনির্বাচনে উপহার দিয়ে তাকে সংসদ সদস্য বানানোর নাম হলো পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি। সে হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার ভ্রাতা সাঈদ ইস্কান্দার, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পুত্র মাহী বি. চৌধুরী, সাইফুর রহমানের পুত্র নাসের রহমান এগুলো হলো পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে আত্মীয় তোষণ ছাড়া মৌলিক কোনো আদর্শের বিষয় নেই। আলোচনার সুবিধার্থে এবার দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন আর তা হলো আমরা রাজনৈতিক সংস্কার চাই কি না এবং চাইলে তার স্বরূপটি কি হবে? যেহেতু প্রধান দুটি দলসহ সব রাজনৈতিক নেতাই এখন বলছেন যে, তারা অবশ্যই সংস্কার চান। কাজেই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর যে ইতিবাচক হবে তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে নিন্দুকেরা রাজনীতিবিদদের বিলম্বে বোধোদয়ের কারণে তাদের ঐকান্তিকতা নিয়ে হয়তো সন্দেহ

www.pathagar.com

প্রকাশ করবেন। এ দেশের সাধারণ নাগরিকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে। তাদের কাছে সংস্কারের অর্থ হচ্ছে ১. রাজনৈতিক দল এবং সরকার থেকে প্রচারণার দুর্নীতি নয় সত্যিকার দুর্নীতি দূরীকরণ ২. শেখ হেলাল এবং সাঈদ ইস্কান্দারের মতো রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের উত্থানের সুযোগ রহিতকরণ ৩. রাজনৈতিক দলগুলোয় দুর্নীতিবিরোধী শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা ৪. রাজনৈতিক দল পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনয়ন ৫. সহিংস রাজনীতি বিশেষত হরতাল, অবরোধ জাতীয় কর্মসূচির অবসান এবং ৬. সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোয় অধিকতর গণতন্ত্রায়ন। আমি বিশ্বাস করি দলের ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হলে সংস্কারের প্রথম চারটি লক্ষ্য সহজেই অর্জন করা সম্ভব। দলে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বিএনপির গঠনতন্ত্রের ৬(ঞ) ধারা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে।

"(ঞ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি

জাতীয় নির্বাহী কমিটি অনূর্ধ্ব ১৮৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং প্রতি জেলা থেকে কমপক্ষে একজন করে সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে থাকতে হবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মহিলা হতে হবে। কমিটিতে শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, উপজাতি ও সমাজের অন্যান্য স্তরের প্রতিনিধিদেরও থাকতে হবে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত কর্মকর্তাসহ দলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবে, তবে এ কমিটির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় কাউন্সিল থেকে নিতে হবে।'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের গঠনতন্ত্রের উদ্ধৃত ধারাটি নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক। দলের গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি এককেন্দ্রিক না করে গণতান্ত্রিক করা হলে চেয়ারপারসন কর্তৃক আকস্মিকভাবে সাইদ এস্কান্দারকে কথিত ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগজনিত বিতর্কের সুযোগ রহিত হয়ে দল আরো স্বচ্ছ ও শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রে সভানেত্রীকে এমন অসীম ক্ষমতা প্রদান না করা হলেও আমরা অতীতে দেখেছি, অধিকাংশ নির্বাহী পদে নির্বাচন বা মনোনয়ন দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার একক নির্দেশেই হয়ে থাকে। দলে পদ নিয়ে নেতাদের বিভাজন ঠেকানোর জন্য সব সিদ্ধান্তের ভার সভানেত্রীর কাঁধে দিয়েই সব নেতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এটিও অসুস্থ ও মেরুদণ্ডহীন রাজনীতির এক মন্দ উদাহরণ। আশ্চর্যজনকভাবে সামরিক বাহিনী সমর্থিত জরুরি সরকারও পরিবারতন্ত্রের দোষে আরো দৃষ্টিকটূভাবে দুষ্ট। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, দুদক ও নির্বাচন কমিশন মিলিয়ে প্রায় জনা দশেক আত্মীয়পরিজন বর্তমানে আমাদের শাসন করছেন। এ আত্মীয়বর্গের অধিকাংশের উৎসস্থল হলেন আবার মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা। আশা করি আইন উপদেষ্টা জনাব মইনুল হোসেন ভবিষ্যতে আমাদের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র নিয়ে আক্ষেপ করবার সময় তার সহকর্মীদের বিষয়েও জাতিকে অবহিত করবেন। একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ, 'আপনি আচরি ধর্মশিক্ষা' এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের জরুরি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে বলে আসছে, তারা প্রয়োজনের(?) অতিরিক্ত এক দিনও ক্ষমতায় থাকবেন না। জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তার সাম্প্রতিক ভাষণে ২০০৮ সালের মধ্যে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি আশ্বাসবাণীও দেশবাসী শুনতে পেয়েছে। এদিকে আবার আইন উপদেষ্টা অহর্নিশ বলে

www.pathagar.com

যাচ্ছেন, তারা এমন নির্বাচন দেবেন না, যাতে তাদের বিবেচনায় চোর-ডাকাতরাই আবার সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসবে। তিনি আইনের মানুষ হয়েও বলছেন, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা যাবে না। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তর করার মতো কোনো সংসদ এখন দেশে নেই। সংবিধান পড়ে অন্তত আমার বোধগম্য হয়নি যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে জরুরি অবস্থার সংযোগটা কোথায়? আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, যারাই ক্ষমতায় যান, তারাই নিজেদের ব্যতীত দেশের আর সবাইকে নির্বোধ ও অজ্ঞ মনে করেন। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, সরকার জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে প্রশাসন চালানোর মতো মনোবল অর্জন করতে পারেনি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ, বিনিয়োগের জন্য অত্যাবশকীয় স্বস্তিদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, 'মাইনাস টু থিওরি' বাস্তবায়ন ইত্যাকার লক্ষ্য অর্জনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সরকার যে একপ্রকার সিদ্ধান্তহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়েছে, তা ক্রমশই জনগণের কাছে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। দেশের স্বার্থেই এ অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণ সরকার, জনগণ ও রাজনীতিবিদ সবারই কাম্য হওয়া উচিত। এখন জরুরি সরকারের দৃশ্যপট থেকে প্রস্থান পর্বটি কোন পদ্ধতিতে করলে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য গ্রহণযোগ্য ও বেদনাহীন হবে, সেটি উদ্ভাবন করা আবারো দেশের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। প্রথমেই জনগণকে মেনে নিতে হবে, ঘড়ির কাঁটা আর উল্টো দিকে ঘোরানো যাবে না। অর্থাৎ চাইলেই আমরা প্রাক এক-এগারো পরিস্থিতিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি না। হয়তো প্রত্যাবর্তন করতে চাইও না। প্রস্থান পর্বের বিতর্কটি সরকারের করণীয় দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হচ্ছে, সরকার রাজনীতিতে একটি তৃতীয় ধারা তৈরির কৌশল অবলম্বন করেছে। এ উদ্দেশ্যে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা 'প্রফেসর ইউনূস প্রকল্প' জনসমর্থনের অভাবে পরিত্যক্ত করতে হয়েছে। এ ব্যর্থতার মাধ্যমে এবার কুশীলবদের অনুধাবন করা উচিত, বাংলাদেশে বিদেশী অর্থে পালিত বিশেষ সমাজ একটি কাগুজে বাঘ ব্যতীত আর কিছু নয়। এদের দৌড় বড়জোর সংবাদমাধ্যম ও বিদেশী দূতাবাসের ককটেল পার্টি পর্যন্ত। সরকারপন্থী দল সৃষ্টির জন্য এরপর সম্ভবত আদর্শহীন, দলত্যাগকারী ও শিকড়বিহীন রাজনীতিবিদদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানেও অসংখ্য বাধার প্রাচীর। প্রথমত এ ধরনের দল তৈরিতে প্রচুর সময় এবং অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সরকারি আনুকূল্যে তৃতীয় ধারার দল তৈরি হলেই যে তারা অর্থবহ জনসমর্থন প্রাপ্ত হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হাতের কাছের উদাহরণ, জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি দীর্ঘ ২৫ বছরেও একটি জেলাভিত্তিক দলের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তৃতীয়ত, দুর্নীতি দমনের জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে রাজনৈতিক দল তৈরি করার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হলে দুর্নীতি তো দূর হবেই না, বরং এক নতুন দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠী আবির্ভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জনগণের কাছে দুর্নীতিপরায়ণরূপে পরিচিত রাজনীতিকদের পিঠ বাঁচানোর জন্য সাম্প্রতিক ভোল পাল্টানোর চেষ্টা দেখে এ শংকাটি ঘনীভূত হচ্ছে। চতুর্থত, জনধিকৃত ও বিদেশনির্ভর সুশীল(?) সমাজ এবং তাদের আমদানিকৃত ইউটোপীয় ভাবাদর্শে আবদ্ধ থেকে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক দল গঠনের সরকারি প্রচেষ্টা অর্থহীন। পঞ্চমত, দল গঠন করা গেলেও এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা যে একটি অবাধ নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক শক্তির সাথে সফল প্রতিযোগিতা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনে

www.pathagar.com

সমর্থ হয়ে বর্তমান সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈধতা প্রদানে সক্ষম হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই 'দিল্লি হনুজ দুর অস্ত'। তাহলে বিকল্প কী? বিকল্প হচ্ছে অনতিবিলম্বে রাজনীতিবিদদের সাথে আন্তরিকভাবে আলোচনা শুরু করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করা এবং সরকার যে সত্যিই যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী, সে ব্যাপারে আস্থাশীল করা। এর পাশাপাশি জনগণের উপার্জন কিংবা কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয় এমন কর্মকাণ্ড অনতিবিলম্বে বন্ধ করে এক-এগারোর পরবর্তী পরিস্থিতিতে অতি উৎসাহীদের কারণে জনগণের দুর্ভোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা সরকারের নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। যে সংস্কার সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে সে সংস্কার বিতর্কিত হতে বাধ্য।

সরকারের উপরোক্ত সৎ উদ্যোগের বিনিময়ে রাজনীতিবিদদের আশ্বাস প্রদান করতে হবে যে, এক-এগারোর পরিবর্তনের অপরিহার্যতা ও বাস্তবতা তারা মেনে নিয়েছেন এবং রাজনীতিতে বহুদিনের সৃষ্ট দুর্বৃত্তায়নের অচলায়তন এবার তারা সত্যিই ভাঙবেন। দলে যে সংস্কারের একটি রূপরেখা এ নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সে ধরনের একটি কর্মসূচি প্রধান দুই দল স্ব-উদ্যোগে শুরু করলে রাজনীতিবিদরা আবার জনগণের আস্থাও ফিরে পাবেন। এরপরও এক-এগারো থেকে আগামী সংসদ অধিবেশন পর্যন্ত বহুবিধ আইন ও সংবিধান সম্পর্কিত ফাঁক থেকে যাবে। এসব প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকাণ্ডকে কিভাবে আইনসিদ্ধ করে আমাদের পবিত্র সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে সে বিষয়েও সরকার, রাজনীতিবিদ ও প্রকৃত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা এখনই শুরু করা উচিত। এ প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলো তৎকালীন সামরিক সরকার প্রণীত বিধিমালা (Legal Framework Order)-এর আওতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়েই। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী অবশ্য এলএফও'র অধীনে নির্বাচন করতে রাজি হননি। এজাতীয় একটি আগাম চুক্তি প্রণয়ন করা হলে তা বর্তমান শাসকদের স্ব-স্ব স্থানে সম্মানজনক প্রস্থানকে নিশ্চিত করতে পারে এবং তাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সরকারি আনুকূল্যে রাজনৈতিক দল গঠনের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পরও তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তার প্রধান বিচারপতির পদে সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ও রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি জনগণেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক-এগারোর সরকারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ পরিবর্তনটি যে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ যে একটি সমৃদ্ধশালী ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে সক্ষম, এটি আমি সর্বদাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছি। তবে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই দুর্নীতি ও বিদেশী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমরা কি ঐক্যবদ্ধভাবে এখনই সে সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে পারি না?

১৬.০৫.০৭

www.pathagar.com

বায়বীয় সিন্ডিকেটের সন্ধানে

অবশেষে জরুরি সরকার দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় ও লাগামহীন বৃদ্ধিতে সরকারিভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কোনো ভোগ্যপণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, বরং কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধির পরিবর্তে মূল্য বিস্ফোরণ হয়েছে বলা চলে। অর্থনীতিকে তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে না দিয়ে অপরিণামদর্শী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলে এমন বিপর্যয়ই ঘটবে, এটিই বাস্তবতা। 'সরকারের দৃষ্টি এবার প্রসারিত করার পালা' নামক অর্থনীতির গতিধারা বিষয়ক একটি নিবন্ধে এরকম অবস্থার আশংকার প্রেক্ষিতে সাহস করে শাসকশ্রেণীর প্রতি কিছু সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। সম্ভবত তারা তখন উদ্দেশ্য প্রণোদিত সুশীল(?) সমাজভুক্ত অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণে এতই বিভোর ছিলেন যে, আমাদের মতো অকিঞ্চিৎকরদের মতামত সেখানে পাত্তা পায়নি। সে সময় দু-একজন ভিন্ন মতাবলম্বীর পরামর্শ গ্রহণ করলে সম্ভবত সরকার ও জনগণ উভয়ই উপকৃত হতো। ইতিহাস থেকেই যেহেতু শিক্ষা নিতে হয়, কাজেই একটুখানি পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

আমাদের সবারই মনে আছে, জোট সরকারের শেষার্ধ থেকে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে জনগণ অসন্তুষ্ট হতে শুরু করে। জনগণের ক্ষোভকে পুঁজি করে সে সময়ে আমাদের দেশের অতি স্বাধীন ও জবাবদিহিতাবিহীন সংবাদমাধ্যম কোনো এক প্রত্যুষে বোধিলাভের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির গুপ্ত কারণ বের করে ফেলল। তাদের মতে কারণ আর কিছুই নয়, তৎকালীন সময়ে কথিত সমান্তরাল সরকারের প্রধান কার্যালয় হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দ্বারা সংগঠিত সিন্ডিকেটের কারসাজিতেই দ্রব্যমূল্যের এ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। সংবাদপত্রের পাতায় এবং টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিন অব্যাহতভাবে চলল এ প্রচারণা। আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রচারণার পেছনে কোনো দায়িত্বশীল ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নেই, নেই কোনো সিন্ডিকেটের পরিচয় কিংবা নাম-ঠিকানা, শুধুই দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। এমনকি যেসব চ্যানেল কিংবা সংবাদপত্র বিগত সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের দুর্নীতিলব্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব সংবাদমাধ্যমও সোৎসাহে প্রচারণার গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিল। তারা বোধ হয় ভেবেছিল, সরকারের যদি পরিবর্তন হয়েই যায়, তাহলে অন্তত এ কৌশল গ্রহণ করে নিজ নিজ সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ছিল রহস্যজনক। তারা সিন্ডিকেটজনিত অভিযোগের কোনো বিশ্বাসযোগ্য জবাব জনগণের কাছে দিতে তো ব্যর্থ হয়েছিলই, উপরন্তু তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী সিন্ডিকেটের অস্তিত্বের কথা নিজ মুখেই স্বীকার করে নিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করলেন। বিগত সরকারের বাকি সময়কালে

www.pathagar.com

কোনো সিন্ডিকেটও খুঁজে পাওয়া গেল না এবং কারো বিরুদ্ধে আর ব্যবস্থা গ্রহণও হয়ে উঠল না। এ নির্বুদ্ধিতার মাধ্যমে সিন্ডিকেট তত্ত্বের একটি সরকারি ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তৎকালীন সরকার জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খোলাবাজারে চাল বিক্রি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং অধুনা আলোচিত বাংলাদেশ রাইফেলসের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কর্মসূচি। বলা বাহুল্য, সরকারের এসব পদক্ষেপ জনগণকে খুব একটা সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি বরং দক্ষ প্রচারের কল্যাণে জনগণ সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়ার ফলে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ঘন ঘন মন্ত্রী পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে খণ্ডকালীন মন্ত্রী নিয়োগ, নীতিনির্ধারকদের এ জাতীয় অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার অভাবও দৃশ্যমান ছিল।

কোনো বিরোধী দলই সরকারবিরোধী জনমত সৃষ্টির এমন সুযোগ হেলায় হারাতে চাইবে না এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও সে রকম কোনো ভুল করেনি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির রাশিয়ান ডক্টরেট সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে খ্যাত জনাব আবুল বারাকাত কোনো রকম বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই হিসাব কষে দেখালেন, চারদলীয় জোট সরকার নাকি শুধু সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বাড়িয়েই জনগণের ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বিবেচনায় এ বিশাল অংক তাবৎ দেশবাসীর একসাথে হৃদরোগে আক্রান্ত করার মতো হলেও দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একজনও এ দাবির ভিত্তি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না। আমরা সর্বদাই দেখেছি, আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা প্রকৃত অর্থেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী এবং সচরাচর কোনো তথ্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজ পেশাভুক্ত কাউকে বিব্রত করতে চান না। আর সংবাদমাধ্যম যেন এ ধরনের বায়বীয় অথচ পিলে চমকানো পরিসংখ্যানের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারপর আর কী? গ্রামে গ্রামে সে বার্তা রটে গেল ক্রমে। দেশের সংবাদমাধ্যম তো বটেই, এমনকি বিদেশী সংবাদমাধ্যমেও এ বারাকাতীয় আবিষ্কার বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা শুরু হয়ে গেল। প্রচারের মহা শোরগোলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সরকারের ম্রিয়মাণ, অনুচ্চ কণ্ঠ খুঁজেই পাওয়া গেল না।

কিছু তুলনীয় পরিসংখ্যান থেকে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার বিশালত্ব এবার অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটসহ বাংলাদেশের মোট বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ ৬১ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ৩৫ বছরে মোট উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ২ লাখ ৬৯ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকারের নতুন যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের মোট রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ ২ লাখ ৮০ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আবুল বারাকাত কী পরিমাণ আষাঢ়ে গল্প তৈরি করেছিলেন। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ

www.pathagar.com

কথিত লুণ্ঠনকারীরা রেখেছে কোথায়, এও নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬-এর মনিটরি সার্ভে অনুযায়ী ২০০৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে বৈদেশিক মুদ্রার আমানতসহ মোট মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। যদি ধরেও নেয়া যায় আমানতের সবটাই লুণ্ঠনকারীদের অর্থ, তার পরও অতিরিক্ত ১ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকা অন্যত্র সংরক্ষণ করতে হয়। মাটির নিচে বিশেষ কোষাগার ছাড়া তো আর এ বিপুল অর্থ রাখার উপায় দেখা যাচ্ছে না। বারাকাতীয় মতবাদে বিশ্বাসীরা দাবি করতে পারেন, এ সমুদয় অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। মার্কিন ডলার ও টাকার মধ্যকার বিনিময় হারের ভিত্তিতে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকার বিনিময় মূল্য হচ্ছে ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চলাকালীন এ পরিমাণ অর্থ নাম-গোত্রহীন উৎস থেকে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় যোগ হবে, আর বিশ্বের একমাত্র মুরুব্বি মি. জর্জ বুশ চোখ বুজে থাকবেন, এটিও কি এখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? নাকি 'প্রখ্যাত' অর্থনীতিবিদ বারাকাত সাহেবের শূন্য নিয়ে কোনো সমস্যা আছে? মুশকিল হলো, যুক্তির ধার কে ধারে? রব যখন উঠেছেই যে, চিলে কান নিয়ে গেছে; কষ্ট করে আর কানে হাত দিয়ে দেখার প্রয়োজন কী? অর্থনীতিবিদদের এ এক বিশাল সুবিধা। লক্ষ-কোটি টাকার গল্পও অনায়াসে ফাঁদা যেতে পারে। অংক মিলিয়ে প্রমাণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হিসাবরক্ষক (Accountant) বেচারাদের আবার পাই পয়সা পর্যন্ত মিলিয়ে তারপর হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়। নইলে ডেবিট-ক্রেডিট মিলে না।

যা-ই হোক, পরিতাপের বিষয় হলো ওপরে উল্লিখিত ভিত্তিহীন প্রচারণায় আমজনতা তো বিভ্রান্ত হয়েছিলই, এক-এগারোর পর দেখা গেল, বর্তমান শাসকরাও যথেষ্ট বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কর্মতৎপরতা প্রদর্শনের মহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করেই দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করার পাশাপাশি তারা অদেখা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করে ফেললেন। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই সারাদেশের বাজার ব্যবস্থা আক্রান্ত হলো। অপমানিত, আতংকিত ব্যবসায়ীরা ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল দৃশ্যত সরকারের চৈতন্য ফিরল। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক সিলগালাকৃত গুদাম খোলার নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, ব্যবসায়ীদের আর হয়রানি করা হবে না। সরকারের ঝটিকা অভিযানে সিন্ডিকেটের কোনো হদিস পাওয়া না গেলেও অর্থনীতির ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েই গেল। আমদানিনির্ভর পণ্যের যোগান কমে যাওয়ার কারণে অর্থনীতির চিরায়ত চাহিদা-যোগানের সূত্র অনুযায়ী বাজারে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাত্রা শুরু করল। দিশেহারা সরকারের মুখপাত্র জনাব মইনুল হোসেন অর্থনীতিবিদ ড. বারাকাতের কাছাকাছি আরেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তিনি বললেন, এবার আর আমদানিকারক কিংবা পাইকারি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট নয়, খুচরা ব্যবসায়ীরাই সরকারকে বিব্রত করার জন্য সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার হিসাব অনুযায়ী দেশে কমপক্ষে ১০ লাখ খুচরা বিক্রেতা রয়েছে। এ ১০ লাখ বিক্রেতা সম্মিলিত হয়ে যদি সার্থকভাবে সিন্ডিকেট গড়ে তুলে থাকে, তাহলে অতি অবশ্য বাজারবিষয়ক অর্থনীতির তত্ত্ব নতুন করে লিখতে হবে। আসল কথা হলো, সিন্ডিকেট

www.pathagar.com

তত্ত্ব এমনভাবেই আমাদের মাথায় গেঁথে গেছে যে, মূল্যবৃদ্ধির অন্যান্য যৌক্তিক কারণগুলোর দিকে আমরা সম্ভবত দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছি।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যমূল্য কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য, দেশীয় উৎপাদন পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ পরিবহন খরচ, সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনা, সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র, দেশের শুল্কনীতি এবং ব্যবসায়ীদের পর্যায়ক্রমিক মুনাফা। বাস্তবতা হলো সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে কয়েকটি আমদানিনির্ভর পণ্য যেমন সয়াবিন তেল, শিশু খাদ্য, ডাল ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বৃদ্ধি গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ। পাশাপাশি বর্তমান বছরে বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় নতুন ধানের মৌসুমেও চালের মূল্য উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ওপর এ বছর দেশে আলুর উৎপাদনও আশানুরূপ হয়নি। উপরন্তু বিশ্বব্যাংকের চাপের মুখে কিছুটা অবিবেচনাপ্রসূতভাবেই সরকার ডিজেলের মূল্য এক লাফে লিটার প্রতি সাত টাকা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো জ্বালানি তেলের এ পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি করা হয়নি। তার ওপর সরকারের সাম্প্রতিক কড়াকড়ির কারণে প্রতি ট্রাকে এখন আগের ৯-১০ টনের পরিবর্তে ৫-৬ টন পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে। বিগত এক মাসে জ্বালানি তেলের ২১ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি এবং ট্রাকপ্রতি আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক পণ্য পরিবহন এ দ্বিবিধ কারণে খরচ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি দরিদ্র দেশে পদ্ধতিগত দুর্বলতার ফলে সৎ উদ্দেশ্যে গৃহীত সব সংস্কারই সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য যে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না, এ সত্যটি ক্রমেই প্রমাণিত হচ্ছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অতি প্রিয় সুশীল(?) সমাজভুক্ত সংগঠন সিপিডিও এখন বলছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ। আর যা-ই হোক, এ বিশেষ ও বিতর্কিত সংগঠনকে সরকার শত্রুপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে এমন প্রমাণ এখনো মিলেনি।

বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ জন উপদেষ্টা মিলে প্রকাশ্য সরকার পরিচালনা করছে। প্রতিজন উপদেষ্টাকে কমপক্ষে চারটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ অতিরিক্ত কাজের ভারে বাজার ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক ব্যর্থতা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সাধারণ জনগণের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যেন তাদের দায়দায়িত্ব বিডিআর'র ওপর দিয়েই খালাস। একটি অতি প্রয়োজনীয় মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অভিভাবকহীন অবস্থায় চলতে পারে কি না, তা নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখার এবার সময় এসেছে। এ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় চারদলীয় জোট সরকারের ব্যর্থতা থেকেও বর্তমান সরকার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দেশের শুল্কনীতি ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ উভয় বিষয়ই সরকারের সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত। মোট কথা হলো, একটি রাষ্ট্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য কোন পর্যায়ে থাকবে, সেটি নির্ধারিত হবে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম এবং সরকারের এতদসংক্রান্ত গৃহীত নীতির সমন্বয়ে। বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রে যেখানে ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী ৪২ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাস করে, সে দেশে অন্তত

www.pathagar.com

প্রধান খাদ্যসামগ্রীকে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সরকারের বিশেষ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমান শাসকদের মনে রাখতে হবে, দুর্নীতির অভিযোগে জোট সরকার বর্তমানে নিন্দিত এবং আক্রান্ত হলেও সরকার পরিচালনাকালীন সময়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাই জনগণের অসন্তোষের প্রধান কারণ। বর্তমান সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যই এক-এগারোর তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে সাধারণ জনগণ ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। আমার বিভিন্ন নিবন্ধে পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও একটি বিষয় নিয়মিত উল্লেখ করেছি – সংস্কার তখনই প্রকৃত অর্থে ফলপ্রসূ হবে, যখন দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে। জনগণ অবশ্যই অনুধাবন করে, একটি সরকারের জন্য চার মাস মোটেই দীর্ঘ সময় নয় এবং সংস্কার একটি চলমান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বর্তমান শাসকরা এবং তাদের সমর্থক বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই বলেছেন, সংস্কারের সুফল পেতে হলে সরকারকে আরো সময় দিতে হবে। জনগণ হয়তো সময় দিতেও প্রস্তুত, যদি তারা নিশ্চিত হন যে সরকার সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

সাম্প্রতিক কিছু কার্যক্রমে মনে হচ্ছে, বিলম্বে হলেও নীতিনির্ধারকরা তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ভুলগুলো অনুধাবন করতে শুরু করেছেন এবং অগ্রাধিকার তালিকায় অবশেষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকে শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধিদ্বয়ও লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করা শুরু করেছেন। মাত্র এক মাস আগেও এদের কাছ থেকেই ভিন্ন সুরে বক্তব্য শুনেছি। সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে আমাদের সন্দেহ না থাকলেও তাদের কার্যক্রমে এখনো সমন্বয়হীনতা প্রবল, অনভিজ্ঞতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এ বিষয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা ক'দিন আগে ঘোষণা করেছেন, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি নিয়মিত ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করবেন। বাজার ব্যবস্থাপনায় একদিকে বিডিআর, এখন আবার অন্যদিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ। আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান ও সরকারি দায়িত্ব পালনের স্বল্প অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি না, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে এ দুই সংস্থার কোথা থেকে আগমন ঘটল? সরকারের Rules of business কি আমাদের অজান্তে পরিবর্তিত হয়েছে? বিনীতভাবে শাসকদের বলতে চাই, অর্থনীতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এবার কৃপা করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল তত্ত্বে প্রত্যাবর্তন করুন (Back to basics)। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য অন্তত পক্ষে এক-এগারোর পর্যায়ে হ্রাস করতে ব্যর্থ হলে জনগণের কাছে যে সরকারের সব উচ্চাভিলাষী সংস্কারই মিছে মনে হবে – এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এক অরাজক পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণে একপ্রকার বাধ্য হওয়ায় শাসকদের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অতি উচ্চ ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যাশা যেখানে উচ্চ, আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সেখানে তীব্র হওয়ারই আশংকা থাকে – এ পরম সত্যটি সংশি-ষ্টরা উপেক্ষা না করলেই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

দেশ ও সরকারের বৃহত্তর স্বার্থেই সমাপ্তির আগে সিন্ডিকেট বিষয়ক প্রচারণার প্রসঙ্গটি পুনর্বার উত্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বর্তমান সরকার বিগত চার মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির বেশ কিছু সিন্ডিকেটের সন্ধান বের করতে পারলেও বহুল

www.pathagar.com

আলোচিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারী সিন্ডিকেটের কোনো সন্ধান অনেক ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও জানা মতে অদ্যাবধি পায়নি। এ প্রচেষ্টায় সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে কেউ নিশ্চয়ই প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না। এখন মনে হচ্ছে, এমন কী হতে পারে যে এ জাতীয় সিন্ডিকেট প্রকৃতপক্ষে ছিলই না? আর থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব হয়তো বা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। সমাজের সর্বত্র স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করাই বর্তমান সরকারের বর্ণিত প্রধান এজেন্ডা। স্বচ্ছতার স্বার্থেই এবার কথিত সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার করে জনগণকে অবশ্যই সরকারিভাবে অবহিত করতে হবে। যদি সিন্ডিকেট বলে কিছু না থাকে, তাহলে সংবাদমাধ্যমে এত প্রচারণা, ড. আবুল বারাকাতের সংবাদ সম্মেলন করে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য প্রকাশ, এগুলো করা হয়েছিল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য? প্রভূত দুর্নীতি সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, দেশী ও বিদেশী কুচক্রীরা মিলিতভাবে আমাদের সে সফলতা নস্যাৎ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে গেছে এবং অবশেষে তাতে সফলকামও হয়েছে। আমরা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোতে সামগ্রিক জবাবদিহিতার দাবি তুলছি। বিগত চার মাসে বর্তমান সরকার সমাজের অনেক ক্লেদ পরিষ্কার করেছে। বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে যারা জনমত বিভ্রান্ত করে, দেশের ভাবমর্যাদার যারা অহরহ ক্ষতিসাধন করে, তারাই বা আইনের গণ্ডির বাইরে থাকবে কোন অধিকারে? কাজেই সিন্ডিকেট বিষয়ক প্রচারণায় যেসব পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল ও অর্থনীতিবিদ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, তাদের সিন্ডিকেটের পরিচয়সহ প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বাধ্য করা জাতীয় স্বার্থে এখন সময়ের দাবি। আর্থিক দুর্নীতি এবং বিশিষ্টজনদের বিশেষ উদ্দেশ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বাংলাদেশের ১৫ কোটি সংগ্রামী ও ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী চাণক্যীয় কূটকৌশলের গিনিপিগে পরিণত হতে পারে না।

২৩.০৫.২০০৭

www.pathagar.com

জরুরি অবস্থা ঃ আক্রান্ত বিনিয়োগ

যেকোনো দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিনিয়োগ যে একটি মৌলিক উপাদান, এ তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ সীমিত। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বিনিয়োগের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতি বেগবান হয় এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে ব্যয়িত হয় এবং এ বিনিয়োগের ঘোষিত মূল লক্ষ্য মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অবকাঠামো উন্নয়ন। ১৯৯০ সাল থেকে বর্তমান জরুরি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত - প্রধান দুই দলের নেতৃত্বে তিনটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সরকারগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মতদ্বৈততা থাকলেও অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে তা এক ধরনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এর ফলে দুর্নীতিজনিত অপচয় সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে এ সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা দেশী-বিদেশী সব তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমেই প্রমাণিত। তবে কয়েক বছর ধরে সরকারি খাতে বিনিয়োগ অর্থাৎ মোট উন্নয়ন ব্যয় রাজস্ব আয় ঘাটতি এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি অংকে এসে থমকে দাঁড়ানোর ফলে জিডিপি'র শতকরা হিসাবে সরকারি খাতে বিনিয়োগ নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। এখানে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যের উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার হবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে বর্তমান অর্থবছর পর্যন্ত টাকার অংকে এবং জিডিপি'র শতকরা হিসাবে সরকারি খাতে বিনিয়োগ যথাক্রমে ২২ হাজার কোটি টাকা এবং ৬.২০ শতাংশে এসে এক প্রকার স্থির হয়ে আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে চাঙ্গাভাব বজায় থাকায় সরকারি খাতে স্থিতাবস্থা সত্ত্বেও গত বছর পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে মোট বিনিয়োগ টাকার অংক এবং জিডিপি'র হিসাব উভয় ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে ২০০১-০২ থেকে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত বিনিয়োগের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

২০০১-০২ থেকে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র

	২০০০-০১			২০০১-০২			২০০২-০৩		
	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার
সরকারি	১৮৩৮০	৭.২	৩১	১৭৪০০	৬.৪	২৮	১৮৬৩০	৬.২	২৬
বেসরকারি	৪০১৫০	১৫.৮	৬৯	৪৫৮৪০	১৬.৮	৭২	৫১৭২০	১৭.২	৭৪

www.pathagar.com

	২০০৩-০৪			২০০৪-০৫			২০০৫-০৬		
	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার	কোটি টাকায়	জিডিপি (%)	মোট বিনিয়োগের হার
সরকারি	২০৬২০	৬.২	২৬	২৩০১০	৬.২	২৫	২২০০০	৬.২	২২
বেসরকারি	৫৯৩৭০	১৭.৮	৭৪	৬৭৯২০	১৮.৩	৭৫	৭৭৭০০	১৮.৭	৭৮

সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ যেখানে সরকারি খাতের বিনিয়োগের সোয়া দুই গুণ ছিল, সেখানে ২০০৬ অর্থবছরে অর্থাৎ পাঁচ বছর পর বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতের বিনিয়োগের সাড়ে তিন গুণ হয়েছে। এ তো গেল ক্ষুদ্র-বৃহৎ মিলিয়ে দেশের উৎসাহব্যঞ্জক সার্বিক বিনিয়োগ পরিসংখ্যান। বিনিয়োগের গতিধারার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে হলে বৃহৎ বিনিয়োগের চিত্রটি পৃথকভাবে জানা প্রয়োজন। পাঠকরা অবগত আছেন, বৃহৎ বিনিয়োগের নিবন্ধন ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন বিনিয়োগ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। বিনিয়োগ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে যথাক্রমে ৩০ এবং ৩৫ শতাংশ। ২০০১ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত মাঝারি এবং বৃহৎ প্রকল্পে স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকার স্থলে ২০০৬ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। একইভাবে আঙ্কটাডের (UNCTAD) হিসাব অনুযায়ী ২০০১ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও নিচে, অথচ ২০০৫ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ৮৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্থানীয় বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত সন্তোষের সাথে দেখা গেছে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেই সর্বোচ্চ (৭০ শতাংশ) বিনিয়োগ হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রধান দুটি খাত হচ্ছে জ্বালানি ও টেলিকম।

যেকোনো অর্থনীতিবিদই লক্ষ্য করবেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ক্রমেই একটি চমৎকার মিশ্রণ গড়ে উঠছে। একদিকে যেমন বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও উৎসাহব্যঞ্জক বিনিয়োগ হচ্ছে। অপরদিকে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ বিনিয়োগই হচ্ছে শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যা দ্রুত এবং টেকসই কর্মসংস্থানের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি তেজীভাব অবশেষে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। বর্তমান অর্থবছরে রফতানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ যে রেকর্ড পরিমাণ ১২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে যাচ্ছে তাও সম্ভব হয়েছে উচ্চ বিনিয়োগের ফলে পণ্যের যোগান বৃদ্ধির কারণে। চারদলীয় জোট সরকারের শেষ বছরে ১২.৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানির লক্ষ্যমাত্রাকে অনেকে নির্বাচনী বছরের উচ্চাভিলাসী চমক বলে সমালোচনা করেছিলেন। আজকে তারা নিশ্চয়ই লজ্জিত হচ্ছেন। বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি খাতের উৎসাহব্যঞ্জক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির ফলে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, আমাদের দেশের প্রচুর মানুষের মধ্যে উদ্যোক্তার গুণাবলি ও সাহস – দুটোই রয়েছে।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয়টি, সাম্প্রতিক সময়ে উদ্যোক্তারা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ক্রমান্বয়ে আস্থাশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। এমতাবস্থায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের এক-এগারোর পরবর্তী ধারা বিশে-ষণ করতে হলে বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতা উভয় বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা প্রয়োজন।

আগে প্রতিবন্ধকতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বিনিয়োগ পরিবেশের যে সমস্যাগুলো বর্তমান সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেগুলোর মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, চট্টগ্রাম বন্দর পারিচালনায় অদক্ষতা ও বন্দর শ্রমিকদের উচ্ছৃংখল আচরণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোয় দুর্নীতির প্রসার। এর সাথে আবার যুক্ত ছিল রাজনীতি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। এসব কারণে এক-এগারোর আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনী সমর্থিত জরুরি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘটনাকে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা প্রাথমিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনও জানিয়েছিল। এ সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা তো ছিলই না বরং তারা আশা করেছিলেন, বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর ব্যর্থতার ফলে যে সমস্যাগুলো দিনে দিনে প্রকট হয়েছে, সেগুলোর সমাধান করে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনই নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য, এ সরকার প্রধানত একটি আমলা নেতৃত্বনির্ভর সরকার এবং জনগণের কাছে সরকারে দৃশ্যমান ১১ জনের মধ্যে নয়জনই বিগত সরকারের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। তারা বেসরকারি খাতের সাম্প্রতিক উত্থান সরাসরি প্রত্যক্ষ করার কারণে সঙ্গতভাবেই সবাই আশা করেছিল, এটি একটি সংস্কারমুখী ও বেসরকারি খাতবান্ধব সরকারে পরিণত হবে। কিন্তু অত্যন্ত বেদনা ও বিস্ময়ের সাথে দেশবাসী অবলোকন করল, বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বেসরকারি খাতকে প্রায় একটি প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি সেগুলোও শায়েস্তা করার জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে পড়ল। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের ভাষা অনুযায়ী রুই-কাতলা থেকে শুরু করে চুনোপুটি এমনকি কাঁচকির গুঁড়া ব্যবসায়ী পর্যন্ত কেউ বাদ গেল না সবরকম সহানুভূতি বিবর্জিত এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনবহির্ভূত সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে। ঢাকার রাস্তার দরিদ্র হকাররা বিতাড়িত হলো, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের হাটবাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, অতিক্ষুদ্র-অসহায় দোকানদারদের নিরন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আক্রান্ত হলো, এ জাতীয় শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-মালিকরা অপমানিত ও নিগৃহিত হলো, আমদানিকারকদের গুদাম সিল করা হলো, সব মিলিয়ে আতংকিত দেশবাসী সংস্কার নামক এক ভয়াবহ এবং অপরিণামদর্শী কর্মসূচির প্রথম অধ্যায় অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা একেবারেই জ্ঞাত নই যে, এ ধরনের কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটবে নাকি পর্দার অন্তরালে অধিকতর ভয়ানক কোনো দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রস্তুতি চলছে।

সরকারের এ ভ্রান্ত নীতির পেছনে উপদেষ্টা পরিষদের অবিবেচনা ও অনভিজ্ঞতার পাশাপাশি একশ্রেণীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদমাধ্যমের অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণাও সমভাবে দায়ী। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য এ সংবাদমাধ্যমগুলো বাংলাদেশে তথাকথিত সিন্ডিকেটের একটি বায়বীয় উপস্থিতি

www.pathagar.com

আবিষ্কার করে। ড. আবুল বারাকাত নামে একজন দলবাজ অর্থনীতিবিদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বাড়িয়ে জনগণের ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা জোট সরকার কৃর্তক চুরি করার এক কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী সম্পর্কে 'বায়বীয় সিন্ডিকেটের সন্ধানে' শীর্ষক নিবন্ধে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির মতোই এক উদ্বেগজনক চিত্র আমরা বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি। দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চেয়েও দ্রুত হারে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবমান। বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধনের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম তিন মাস অর্থাৎ জানুয়ারি-মার্চ-০৭ সময়কালে শুধু স্থানীয় বিনিয়োগ কমেছে শতকরা ২৬ ভাগ। বর্তমান বছরে এ সময়ে নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরিমাণ ২ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা, যা বিগত বছরে একই সময়ে ৩ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা ছিল। মাত্র তিন মাসে শুধু বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ কমেছে ১হাজার ২১ কোটি টাকা। বিদেশী বিনিয়োগের চিত্রও একই রকম হতাশাব্যঞ্জক। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বিনিয়োগ বোর্ডে বিদেশী বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে মাত্র ৮.৭০, ৪৫.৯৯ এবং ২৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৬ সালের একই সময়ের চেয়ে ১৩৩ শতাংশ কম। বিদেশী বিনিয়োগের অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা পরবর্তী জরুরি অবস্থা বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছে। অবস্থার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এখানে আরো উল্লেখ্য যে, নির্বাচিত সরকারের শেষ বছরে বিনিয়োগকারীরা সচরাচর বিনিয়োগবিমুখ থাকেন। ২০০৫-০৬ অর্থবছর সে অর্থে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের শেষ বছর ছিল। এ বিবেচনায় বর্তমান বছরের বিনিয়োগের গতিধারা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের চেয়েও কমে যাওয়া বর্তমান সরকারের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। দেশী ও বিদেশী উভয় বিনিয়োগই দ্রুতগতিতে হ্রাস পাওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়া। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি দুই অংকে পৌঁছানোর সম্ভাবনা অন্যদিকে বেকারত্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনকে প্রকৃত অর্থেই দুর্বিষহ করে তুলছে। এ সরকারের প্রায় ১৫০ দিন অতিক্রান্ত হলেও এ সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন কোনো সংবাদ এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি (১০মে, ০৭ পর্যন্ত)। বিনিয়োগ বোর্ড আইন ১৯৮৯ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী / প্রধান উপদেষ্টা পদাধিকার বলে বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ডসভা বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বেই হতে হবে। এখনো এ সভা না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যেকোনো কারণেই হোক বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় বিনিয়োগের স্থান নেই। বিষয়টি সত্যি হলে সরকারের অর্থনৈতিক দর্শন ও ব্যবস্থাপনার মান সম্পর্কে আতংকিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আগে যেসব উন্নয়ন সহযোগী বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে সর্বদা উচ্চকিত থাকতেন, তারাই বা এ বিষয়ে নিশ্চুপ কেন, তাও বোধগম্য নয়। নাকি ধরে নিতে হবে, তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী কোনো উন্নয়ন আকাংখিত নয়।

এমতাবস্থায় বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করতে হবে, বিপুল জনসংখ্যার অথচ ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আয়তনের আমাদের মাতৃভূমির অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

স্বাধীনতা সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হবে। ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের কার্যক্রমপরিচালিত করা প্রয়োজন। দেশের সব জনগণকে আতংকিত করার নাম সংস্কার হতে পারে না। এ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যারা দুর্নীতি দূর করার ভয়াবহ চিকিৎসাপত্র প্রদান করেছে, তারা দেশ কিংবা সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এবং অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে বিগত ৩৬ বছরে এ দেশের সংগ্রামী মানুষেরা রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপানের প্রথম ধাপে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারের সব সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত এ উন্নয়নের সোপানের পরবর্তী ধাপগুলোর আরোহণ প্রক্রিয়াকেদ্রুততর করা। সাম্প্রতিক সময়ের সব পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে সরকারের ১৫০ দিনের কর্মকাণ্ড এ উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হলেও তারা জবাবদিহিতার দায় এড়াতে পারে না। বিশেষত, তুলনামূলকভাবে একটি সবল অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে অর্থনীতির চাকা পিছনে নিয়ে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে, অবিলম্বে উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে এনে সবরকম সহায়তার ব্যাপারে তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করা। আগামী তিন মাসের মধ্যে বিনিয়োগের গতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সংস্কারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরিবর্তে মানুষ আরো দরিদ্র হয়ে পড়লে সংস্কার সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা কারোরই কাম্য নয়। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সুশীল সমাজ একটি বিতর্কিত শব্দে পরিণত হয়েছে, যার প্রমাণ নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের রাজনৈতিক পরাজয়ের মধ্যেও মিলেছে। নীতিনির্ধারকরা নিশ্চয়ই চাইবেন না, সংস্কারও সুশীল সমাজের পরিণতি ভোগ করুক। মহান আল্লাহতায়ালা বাংলাদেশকে মধ্যম পর্যায়ের একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি শক্তি, উর্বর শস্যভূমি, একটি কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান, আবশ্যকীয় পানিসম্পদ এবং সর্বোপরি একটি পরিশ্রমী জাতি দান করেছেন। রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক কিংবা জরুরি কোনো সরকারের অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ বিপুল সম্পদ বিনষ্ট করা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২৯.০৫.০৭

www.pathagar.com

'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' কারে কয়?

এ লেখাটি যেদিন লিখছি, সে ৩০ মে দেশের স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী প্রতিটি বাংলাদেশীর কাছে বড় বেদনা ও গ্লানিময় একটি দিন। ২৬ বছর আগে এ দিবসেই বাংলাদেশের ইতিহাসের জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমান বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক কয়েকজন বিদ্রোহী সেনাসদস্যের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। প্রবাদপ্রতিম সততার অধিকারী এ মানুষটি একটি দরিদ্র দেশের জনগোষ্ঠীকে মাথা উঁচু করে সসম্মানে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান নিঃসন্দেহে ছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিভূ তিনি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দুই কন্যা ছাড়া সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার প্রাক্কালে তিনি যে একজন অতি বিতর্কিত একনায়কে পরিণত হয়েছিলেন, এটিও ইতিহাসের দুঃখজনক বাস্তবতা। শেখ মুজিবের মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অন্তর্ধানের পর বাংলাদেশে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পূরণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এক মহানায়ক জিয়াউর রহমান। মুজিবের যেখানে ব্যর্থতা, ঠিক সেখানেই জিয়ার সফলতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের আগপর্যন্ত শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার চূড়ায় অবস্থান করেছেন। আর জিয়ার যে জনপ্রিয়তা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছিল, সে অপরিসীম জনপ্রিয়তা তার চারিত্রিক আদর্শের শক্তিতে আমৃত্যু ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেনানিবাস থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি অতি সহজেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন জনতার কাতারে। এ কারণেই সম্ভবত তার বিরুদ্ধে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়েছে এবং শেষ চেষ্টাটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হলেও ঘাতকের বুলেট আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার এ মহান রূপকারের প্রাণটি অসময়ে ঠিকই নিয়ে গেছে। তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য সমাধা হয়েছে। কিছু দেশদ্রোহী সেনা সদস্যের মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাসের সাজাও হয়েছে। কিন্তু, যে আঞ্চলিক চক্রান্তের মাধ্যমে এ রাষ্ট্রনায়ককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত ইতিহাস কি চিরকাল আমাদের অজানাই থেকে যাবে? যে ব্যক্তির সততাকে কর্মজীবনে আদর্শ মেনেছি, তার অন্তর্ধানের এ বেদনাবিধুর দিবসে আমার লেখাটি আবেগতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আগেভাগেই পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

শহীদ জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দশ বছর ধরে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবেশুধু পিছিয়েই গেছে। শিল্পায়ন হয়নি, কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা বিরাজ করেছে, বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থেকেছে, কর্মসংস্থান হয়নি। মোট কথা জাতির জীবন থেকে পুরো একটি দশক প্রায় হারিয়েই গেছে। সর্বোপরি, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে ওই আশির দশকেই। আজকে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার জিহাদ ঘোষণা করেছে, তারও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়েছিল ওই শাসনামলেই। বাংলাদেশেও যে একজন 'ফার্স্ট লেডি' প্রয়োজন এবং তারও যে একটি ভিন্ন কার্যালয় থাকে, এ নব্য ধ্যানধারণাও আমাদেরকে আশির দশকের একনায়ক জেনারেল এরশাদই 'শিক্ষা' দিয়েছিলেন। সে এরশাদ এখন দাবি করেন বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানই নাকি প্রমাণ করে যে, তিনি ও তার সরকার 'সম্পূর্ণ সততার সাথে দেশ পরিচালনা করেছেন', তখন অদৃষ্টকে পরিহাস করা ছাড়া আর কিছু বলার উপায় থাকে না। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ দু'জনই সেনাপ্রধান ছিলেন। উভয়েরই রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে সেনাবাহিনীতে একটি অপ্রকাশ্য ভূমিকা ছিল। অনেকেরই নিশ্চয় স্মরণে আছে, ১৯৮২ সালে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের পর অন্তত এক বছর জেনারেল এরশাদ নিজেকে রাজনৈতিকভাবে জেনারেল জিয়ার উত্তরসূরিরূপে বর্ণনা করতে পছন্দ করতেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দখলের এ স্থূল প্রচেষ্টা বেগম খালেদা জিয়ার গৃহান্তরাল ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরে অবশ্য 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এ বহুল প্রচলিত দর্শন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে জেনারেল এরশাদের সহযোগীর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত শেখ হাসিনার শেষ রাতের সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থ ছাড়াও অভিন্ন স্বার্থে পারস্পরিক বন্ধুত্বও নিহিত ছিল। সে বিশেষ সম্পর্ক যে অদ্যাবধি ক্রিয়াশীল এ সত্যটি দেশের সাধারণ জনতা বুঝলেও বিএনপির নীতিনির্ধারকরা কেন মাঝে মধ্যেই বিস্মৃত হন, এটি এক অপার রহস্য।

গভীর বেদনার এ বিশেষ দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পথপরিক্রমা বর্তমান কঠিন সময়ের বিশেষ ধরনের রাজনীতি উপলব্ধির খাতিরেই প্রয়োজন। এক-এগারো আমাদের দেশের জন্য আবার একটি সন্ধিক্ষণ বহন করে এনেছে। রাজনীতি ও প্রশাসনে বল্গাহীন দুর্নীতির প্রসার, সমাজব্যবস্থায় বাধাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও সন্ত্রাস, জবাবদিহিতাবিহীন ও জনস্বার্থবিরোধী রাজনীতি এবং দেশী ও বিদেশী চক্রান্তের ফলে এক-এগারো যে ক্রমশ অবধারিত হয়ে উঠছিল সেটা জনগণ বুঝলেও, দেশ পরিচালনাকারী নেতা-নেত্রীরা বোঝেননি বা বুঝতে চাননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এবং জনসংখ্যার বিচারে বৃহৎ কোনো দেশ স্বাধীন নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হোক – এটি আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী একক শক্তির একেবারেই যে ইচ্ছাবিরুদ্ধ, এ কঠিন সত্যটি ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যতদিন পর্যন্ত ইরাকে একনায়ক সাদ্দাম হোসেন বিনা প্রতিবাদে মার্কিনিদের সব নির্দেশ পালন করেছেন ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার ঘনিষ্ঠতম মিত্ররূপে তাকে আমরা দেখেছি। ইরাককে সর্বপ্রকার বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে দশ বছরব্যাপী যুদ্ধে, তথ্য ও রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে ইরাকি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন তখন একনায়ক হলেও ছিলেন পশ্চিমাদের নিজস্ব একনায়ক। সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে সামান্যতম স্বাধীনতার আকাংখার বীজ বিশ্ব মোড়লদের নজরে আসামাত্রই মৌলবাদী খ্রিষ্টান এবং ইহুদিবাদী প্রচারণার কল্যাণে তাকে প্রথমে 'পিশাচ' রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং পরিশেষে অবধারিতভাবে ইরাক লুণ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সাদ্দামকে হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইরানের ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই নাটকের পুনরাভিনয় বিশ্ববাসীর প্রত্যক্ষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য একটিই, ইরানের শাহের পতনের পর থেকে অদ্যাবধি ওই দেশটিতে সে অর্থে কোনো ছালাবি কিংবা কারজাই'র আবির্ভাব এখনো ঘটেনি। ভবিষ্যতের কথা একমাত্র গায়েবের মালিক আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। আমাদের অনেকটা অগোচরেই তুরস্কে পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের আরেক কাহিনী রচিত হচ্ছে। তুরস্কে বর্তমানে একটি ইসলামি দল ক্ষমতায় রয়েছে এবং সে সরকারের অত্যন্ত দক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল্লাহ গুল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। সাথে সাথে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সমর্থনে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জনাব গুলের রাষ্ট্রপ্রধানের পদে প্রার্থিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু করে দেয়। জনাব গুলের প্রধান 'অপরাধ' হলো, তার স্ত্রী ইসলামি ঐতিহ্য অনুযায়ী মাথায় রুমাল বা স্কার্ফ পরিধান করেন, যা তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী অবৈধ। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অনৈতিক চাপের মুখে জনাব গুল তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছেন। এসব ঘটনাপ্রবাহ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নিদারুণ অবমাননা। অনেক পাঠকেরই হয়তো স্মরণে আছে, ১৯৯১ সালে আলজেরিয়ার গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ইসলামপন্থী দল এফআইএস জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে ইসলামবিরোধী পশ্চিমা শক্তির প্ররোচণা এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সে দেশের সেনাবাহিনী জনমত উপেক্ষা করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। এ অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় আলজেরিয়ায় যে দুঃখজনক গৃহযুদ্ধ বেধে যায়, তাতে সে দেশের কমপক্ষে ১ লাখ ৫০ হাজার নাগরিক নিহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটকৌশলের এ কাহিনীগুলো অনেক পাঠকেরই হয়তো জানা। তবু আজকের বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই সাম্প্রতিককালের প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের এ অবতারণা।

২০০১ সালের অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দল বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট বিপুল বিজয় অর্জন করেছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরে সরকারে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসকারী অপতৎপরতা এবং দেশী-বিদেশী নানাবিধ চক্রান্ত সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ পুরো সময় ধরেই বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর, মৌলবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্ররূপে চিত্রিত করার যে অব্যাহত প্রচেষ্টা দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমে লক্ষ্য করা গিয়েছে, তা কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতিজনিত অভ্যন্তরীণ নৈতিক দুর্বলতার ফলে দেশবিরোধী শক্তি বিনা বাধায় বাংলাদেশে তাদের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মীরা রাজপথ, সমুদ্র বন্দর, রেলপথসহ সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, সুশীলসমাজ সহযোগী সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় দেশের কথিত দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে দেশে-বিদেশে অতিরঞ্জিত প্রচারণা চালিয়েছে; জেএমবি মার্কা সংগঠন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে বিদেশী শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে, বিদেশী কূটনীতিকরা তাদের বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের জন্য এ দেশীয় মীরজাফরদের সংঘবদ্ধ করেছে এবং অবস্থাদৃষ্টে এখন সন্দেহ জাগে, সরকারের অতি কাছের ও অভ্যন্তরেরই একটি গোষ্ঠী নিঃশব্দে তাদের চক্রান্তের কূটকৌশলের জাল বুনে গেছে। এ সব কিছুর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই এক-এগারো। তবে তার আগের দুটি দিনে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশস্থ ইউএনডিপি, এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আরেক রহস্যের অবতারণা করেছিলেন। জাতিসংঘ ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন,

The following statement was issued today by the Spokesperson for UN Secretary-General Ban Ki-moon : "The political crisis in Bangladesh has severely jeopardized the legitimacy of the electoral process. The announced cancellation of numerous international observation missions is regrettable. The United Nations has had to suspend all technical support to the electoral process, including by closing its International Coordination Office for Election Observers in Dhaka.

The United Nations is deeply concerned by the deteriorating situation in the country, and urges all parties to refrain from the use of violence. It is hoped that the Army will continue to play a neutral role and that those responsible for enforcing the law act with restraint and respect for human rights. The United Nations urges the non-party Caretaker Government and Election Commission to create a level playing field and ensure parties can have confidence in the electoral process.

The United Nations is concerned that Bangladesh's democratic advances and international standing will be negatively affected if the current crisis continues. It urges all concerned to seek a compromise that will serve the interests of peace, democracy and the country's overall well-being."

পরদিন ঢাকায় ইউএনডিপি'র স্থানীয় প্রতিনিধি জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে যে বিবৃতিটি প্রদান করেন, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে নিম্নোক্ত অংশটি জাতিসংঘের প্রকৃত বিবৃতিতে না থাকলেও সংযোজন করা হয়।

"Deployment of the Armed Forces in support of the election process raises questions. This may have implications for Bangladesh's future role in UN Peacekeeping Operations." (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।

এখন সংগত কারণেই দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, উপরোল্লিখিত বক্তব্য দুটির মধ্যে কোনটি জাতিসংঘের প্রকৃত বক্তব্য? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যদি জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিবৃতিটিই সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ঢাকাস্থ ইউএনডিপি প্রতিনিধি মিজ রেনাটা কোন অধিকার বলে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি সংযোজন করলেন? এ দুই প্রশ্নের জবাব প্রদানের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই এখন বর্তাচ্ছে ঢাকাস্থ ইউএন মিশন এবং আমাদের এক-এগারো সরকারের ওপর। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ তথ্যটি জানতে চেয়ে আবার মহা অন্যায় করে ফেললাম কি? ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে এক-এগারো পর্যন্ত বাংলাদেশের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, এ নিয়ে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ আছে বলে মনে করি না।

বর্তমান সরকারকে কী নামে সম্বোধন করা যায় এ আর এক বিরাট সমস্যা। বিগত সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেন যে, বর্তমান সরকার যেহেতু সংবিধানের ৫৮গ (৫) ধারা অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করেছেন সেহেতু এ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অবশ্য সংবিধানের এসব ধারা তার কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল। যা-ই হোক, তর্কের খাতিরে শেখ হাসিনার বর্তমান অবস্থান মেনে নিলে এ সরকারকে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে হয়। কিন্তু, সম্প্রতি বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা আমজনতাকে একটু বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এ সরকারের কথিত বাইরের সমর্থন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, বর্তমান সরকারকে সেনাবাহিনী সমর্থন করছে। ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রধান উপদেষ্টা এ পর্যন্ত সব বক্তৃতাতেই দাবি করেছেন, তার সরকার অবশ্যই সাংবিধানিক সরকার। দেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন ও প্রথা, এগুলো অনুযায়ী যেকোনো সাংবিধানিক সরকারকেই সেনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করতে বাধ্য। এ সরকার যদি পুরোপুরি সাংবিধানিকই হবে, তাহলে বিশেষ সমর্থনের প্রসংগ আসবে কেন? এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা অজান্তেই তার সরকারের যেকোনো ব্যর্থতার সাথে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীকে অনভিপ্রেতভাবে জড়িত করে ফেললেন না তো? হয়তো ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহই এ প্রশ্নের জবাব নির্ধারণ করবে।

বলছিলাম এ সরকারের 'নির্দলীয়' চরিত্রের কথা। বর্তমান সরকার প্রধান ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরই তার একদা শিক্ষক, সুশীল(?) সমাজের অকথিত গুরু, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তার পুরো উপদেষ্টা পরিষদসহ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে সরকারের সংবিধান নির্দেশিত নির্দলীয় চরিত্রকে ইতোমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। একজন সফল সাবেক ছাত্র হিসেবে তার খ্যাতিমান শিক্ষকের অনুষ্ঠানে তিনি অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। তবে এ ধরনের উপস্থিতি অবশ্যই কোনো রকম রাষ্ট্রাচার ছাড়া হতে হবে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, সেটি বাংলাদেশের আদৌ স্বার্থরক্ষা করে কি না, তা নিয়ে দেশে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংগে নিজেকে এবং সরকারকে জড়িয়ে ফেলার ফলে বর্তমান সরকারকে আর যে নামেই ডাকা হোক না কেন, একটি বিশুদ্ধ নির্দলীয় সরকাররূপে কোনোভাবেই অভিহিত করা যাচ্ছে না। তদুপরি বাংলাদেশের প্রধান দুটি দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের সাম্প্রতিক আচরণে যে লক্ষণীয় পার্থক্য প্রতীয়মান হচ্ছে, তাতে প্রধান উপদেষ্টা কথিত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের সংজ্ঞা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন অর্থ বহন করার আশংকা দেখা দিচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

উদাহরণ এক : ক'দিন আগে শেখ হাসিনার নাটকীয় স্বল্পকালীন নির্বাসনের সময় ১৮ এপ্রিল সরকার এক প্রেসনোট জারির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সরকারবিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান এবং জনশৃংখলাবিরোধী কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্যও আওয়ামী লীগ এবং

www.pathagar.com

সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে অভিযুক্ত করা হয়। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সে অতি বিপজ্জনক শেখ হাসিনা এখন দেশের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন। প্রতিদিন তার সংগে দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সাক্ষাৎ করছেন, নানা রকম সংবর্ধনা প্রদান করছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে যত্রতত্র বিচরণ করছেন । দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত বিবৃতি প্রদান করছেন। ২১ মে ভারতীয় টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন'কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করে বক্তব্য প্রদানকালে বলেছেন, সেনাশাসন সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। তার এজাতীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরকার কোনো প্রতিবাদ না করায় আমাদের কি এখন ধরে নিতে হবে যে এগারো জনের উপদেষ্টা পরিষদও শেখ হাসিনার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন? রাজনৈতিক দলগুলো ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য নিত্যদিন সরকারের কাছে দেনদরবার করছে। অথচ শেখ হাসিনার কর্মকান্ডে প্রতীয়মান হচ্ছে, ঘরোয়া রাজনীতি তো দূরের কথা দেশে এখন প্রকাশ্য রাজনীতির ওপরই কোনো বিধিনিষেধ নেই। নাকি এ সরকারের কাছে শেখ হাসিনার অবস্থান সব ধরনের আইনকানুনের উর্ধ্বে অতিশয় স্বতন্ত্র? অন্যদিকে বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কথিত-অকথিত আইনের সবরকম অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী গৃহে টেলিফোন নেই, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি নেই, অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ সীমিত, পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত, গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতিপ্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ এবং প্রায় দুঃসাধ্য, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত, সব মিলিয়ে এক অসহনীয় জীবনযাপনের গ্লানি। মেনে নিচ্ছি, বর্তমান দুর্দশার জন্য তিনিও তার আংশিক দায়িত্ব এড়াতে পারেন না । তার পরও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার প্রতি দৃষ্টিকটুভাবে একপেশে আচরণ করলে সরকারের নৈতিক অবস্থান কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ হয় বৈকি। অবাক লাগে, কোনো এক রহস্যজনক কারণে এক সময়ের আপোসহীন নেত্রী এখনো তার সেনানিবাসস্থ বাসস্থান ত্যাগ করে জনতার মাঝে স্থান করে নিতে পারছেন না। শেরাটন হোটেলে বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার-পরবর্তী বক্তব্য প্রদানকালেও বেগম খালেদা জিয়াকে জনগণের কাছে কিছুটা হলেও অচেনা মনে হয়েছে।

উদাহরণ দুই : মরহুম রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি কারান্তরালে রয়েছেন এক কোটি টাকার এক চাঁদাবাজি মামলায় যা এখনো বিচারাধীন। অথচ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত বিহঙ্গ। বর্তমান সরকারের এক উপদেষ্টা এ প্রসংগে সাফাই গাইতে গিয়ে সেদিন বললেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয় নাকি, হয় দুর্নীতির মামলা। কী চমৎকার বিচার। নতুন করে জানলাম চাঁদাবাজির অপরাধ দুর্নীতির অপরাধের চাইতেও গুরুতর। এ সরকারের উপদেষ্টাদের কাছ থেকে আমাদের আরো বহু জ্ঞান আহরণ করা বাকি রয়েছে। এক যাত্রায় ভিন্ন ফলের অতি চমৎকার উদাহরণ নির্বিবাদে তৈরি করে চলেছে বর্তমান সরকার।

উদাহরণ তিন : অবরোধ, হরতাল ও নৈরাজ্যের নামে বিগত পনের বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির এককভাবে সর্বাধিক ক্ষতি করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন চৌধুরী। জনশ্রুতি অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী কোনো একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের স্বার্থেই তিনি আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সর্বাংশে ধ্বংস করার এজেন্ডা বাস্তবায়নে বহুদিন ধরেই রত। কারারুদ্ধ, দুর্নীতিপরায়ণ এ উগ্রবাদী নেতাকে হাইকোর্ট চিকিৎসার জন্য তিন মাসের জামিন মঞ্জুর করেছেন এবং তার প্রতি সরকারের আচরণও বাহ্যিকভাবে যথেষ্ট সহৃদয়তাপূর্ণ ও মানবিকই ঠেকছে। অথচ ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী সাবেরা আমানের প্রতি কর্তৃপক্ষের চরম নির্দয় আচরণ দেখলে যেকোনো পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হওয়ার কথা। আরো পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তার অসহায় কন্যাটির হৃদয় বিদীর্ণ করা কান্নাও প্রধান উপদেষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছেনি। আমি বুঝতে অক্ষম, সাবেরা আমানের স্বামী সাবেক প্রতিমন্ত্রী আমানুল্লাহ আমানের দুর্নীতির শাস্তি তার স্ত্রীকে এত নির্মমভাবে কেন পেতে হবে? আমান তার দুর্নীতিলব্ধ অর্থ যদি তার স্ত্রীর নামে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখেও থাকেন, তাহলেও তো ন্যায়বিচারের স্বার্থেই সে দুষ্কর্মের দায়িত্ব আমানের ওপরই বর্তানো উচিত। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের মহাশক্তিধর নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরীর চেয়েও সাবেরা আমানের অপরাধ গুরুতর এটি মেনে নেয়া যেকোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছেই কঠিন হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সবাইকে পবিত্র কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি : সুরা আল মায়েদাহ, আয়াত-৮৭, 'এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।'

বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা তার প্রতিটি বক্তৃতাতেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির সংকল্পের কথা নিয়মিতভাবেই বলে যাচ্ছেন। বিগত প্রায় পাঁচ মাসের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদে তিনি আত্মীয় পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছেন। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ড. ফখরুদ্দীন প্রমাণ করেছেন যে তিনি অতিশয় সুশীল(?) সমাজভক্ত। বহু বিতর্কিত পরজীবী বিশেষ সমাজের মুখপাত্র হিসেবে যে পত্রিকা সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেছে, সে পত্রিকারই সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের পদ অলংকৃত করে আছেন। বর্তমান সরকারের 'একিলিস হিল' দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে গবেষণা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য দেশে সুশীল(?) সমাজ শিরোমণি অধ্যাপক রেহমান সোবহানের প্রতিষ্ঠান সিপিডি ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম শাসকদের মস্তিষ্কে উদিত হয়নি। এরপর যদি সরকারের কথিত নির্দলীয় চরিত্র নিয়ে কোনো সাধারণ নাগরিক সংশয় প্রকাশ করেন তাহলে তাকে খুব বেশি দোষারোপ করা যাবে কি? সরকারের কাছে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আবার কোনো একটি বিশেষ দলকে ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়ারই নাম নয় তো ? এতসব বিব্রতকর প্রশ্ন উত্থাপন করে এতক্ষণে নিশ্চয়ই শূলে চড়ানোর মতো রাজরোষ সৃষ্টি করে ফেলেছি। তবে সব অবস্থাতেই ভরসার এক ও অদ্বিতীয় স্থল তো মহান আল্লাহতায়ালাই। পবিত্র কুরআন শরীফের আর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই আজকের কথকতার সমাপ্তি টানছি।

সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১২০ : 'আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সে সবই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।'

৩০.০৫.০৭

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র প্রাসংগিকতা

আশির দশক থেকে বাংলাদেশের সব সরকারকেই সাধারণ্যে একটি অভিন্ন অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অভিযোগ করা হয়ে থাকে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি বহুপক্ষীয়, আন্তর্জাতিক, আর্থিক সংস্থার নির্দেশে অথবা আরেকটু মৃদুভাবে বললে তাদের পরামর্শে প্রণীত হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নব্বইয়ের দশকে দেশের একটি প্রধান দল আওয়ামী লীগের বামঘেঁষা আর্থিক নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের ফলে এ অভিযোগের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়েছে। উপরিউক্ত পরিবর্তনের ফলে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের এ চির বৈরী দুই রাজনৈতিক দলের ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতিতে বর্তমানে আর মৌলিক কোনো ভিন্নতা নেই বললেই চলে। এতদসত্ত্বেও কৌতুকের বিষয় হলো বিরোধী দলে গেলেই দুটি দলই আবার ক্ষমতাসীন সরকারকে নিয়মিতভাবে বিশ্বব্যাংক তোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। পাঁচ বছর মেয়াদে সরকারি কাজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, বিশ্বব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে সরকারের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। তবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত যেকোনো সরকার সে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ যে দলীয়ই হোক না কেন, তারা যে বিনা প্রতিরোধে এদের সব চিকিৎসাপত্র মেনে নেয় – বিষয়টি এমন নয়। ধারণা করা হয়ে থাকে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নয় এমন কোনো বিশেষ সরকার ক্ষমতায় থাকলে এ ধরনের চাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের ম্যান্ডেটবিহীন সরকার তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই অনেক সময় নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। দু-একটি উদাহরণ দিলে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিরোধের চিত্রটি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হবে।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দুই বছর ধরে দেশে তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচন্ড চাপ ছিল। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে এ চাপের বৃহদাংশ সহ্য করতে হলেও সরকারের শেষ ষোল মাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে আমাকেও সে চাপের কিয়দংশের ভার বহন করতে হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক প্রকার দরকষাকষির পর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত তেলের আংশিক মূল্যবৃদ্ধিতে রাজি হলেও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে আমি কোনোভাবেই সম্মত হইনি। এ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমার এবং জনাব সাইফুর রহমানের মধ্যকার কল্পিত মতবিরোধের কাহিনী সে সময় পত্রপত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হতো। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেও সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘবে তৎকালীন সরকার জনগণের কাছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি নীতি গ্রহণ করেছিল। ইরাক যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকসানের ভারে মুমূর্ষু বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে কিছুটা প্রাণশক্তি দেয়ার জন্য পরিবহন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবহার্য ডিজেল ও কেরোসিনের তুলনামূলক কম মূল্য বৃদ্ধি (লিটারপ্রতি

www.pathagar.com

তিন টাকা) এবং সাধারণভাবে বিত্তবানদের ব্যবহার্য অকটেন ও পেট্রলের বড় রকম মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাঠকের হয়তো মনে আছে, সরকারের শেষ বছরে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি এ সমবেদনামিশ্রিত নীতির কারণে সে সময় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তেমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। গ্যাসের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য ছিল – মূল্য না বাড়িয়ে সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে এ খাতের মুনাফা বৃদ্ধির কৌশলই দেশের অর্থনীতির জন্য অধিকতর যৌক্তিক। চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে শিল্পায়নের যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে সরকারের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতার মাধ্যমে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এ সুযোগ গ্রহণ করে আমি শীর্ষ নেতৃত্বকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, শিল্প খাতে গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হলে তা আমাদের বিকাশমান শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল করবে এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলো পরোক্ষভাবে লাভবান হবে। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ'র প্রভূত চাপ সত্ত্বেও গ্যাসের মূল্য না বাড়ানোর নীতিতে সরকার শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দেশের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কারণেই প্রভূত চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তৎকালীন সরকারকে প্রতিরোধবিহীন আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যায়নি। অবশ্য এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে সব সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যেই যথেষ্ট টানাপড়েন থাকে। অরাজনৈতিক ব্যক্তি হওয়ায় আমার সুবিধাও যেমন ছিল, তেমনি প্রবীণ নীতিনির্ধারকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুও অনেক সময়ই আমাকে হতে হতো। আমি আগেই বলেছি, জনগণের ম্যান্ডেটবহির্ভূত বিশেষ সরকারগুলোর ওপর খবরদারির এ চাপের তীব্রতা অধিক মাত্রায় থাকে। সম্প্রতি ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য এক লাফে সাত টাকা বৃদ্ধি এবং এক-এগারোর পর গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা সম্ভবত সে চাপেরই বহিঃপ্রকাশ ইতোমধ্যে দেখতে শুরু করেছি।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়টি অনুধাবন করতে আমাদের অর্থনীতির সার্বিক চিত্র এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ কী কাজে ব্যবহৃত হয় এ দ্বিবিধ বিষয় পর্যালোচনা করা আবশ্যক। ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের পতনের পর থেকে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিগত ষোল বছরে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দুর্বৃত্তায়ন, ইত্যাকার অভিযোগ জোরেশোরে উত্থাপিত হলেও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দেশের যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশ সাহায্যনির্ভর দেশ হিসেবেই বিশ্বের কাছে পরিচিত ছিল। আজকের বাংলাদেশ দ্রুতই একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশে পরিণত হচ্ছে। এখানে কিছু প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করলে আশা করি আমার দাবির পিছনের যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারির বছর অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১ হাজার কোটি টাকা। এ সাহায্যের মাধ্যমে ওই বছর মোট উন্নয়ন বাজেটের ৩৭ শতাংশের অর্থায়ন হয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ সরকারের পতন-পূর্ব ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেটে বিদেশী সাহায্যের অংশ অর্থাৎ পরনির্ভরতা আট বছর আগের ৩৭ শতাংশ থেকে আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪ শতাংশে উপনীত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের বর্তমান পর্বের গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থার অন্তিম বছর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৭ শতাংশে। ১৬ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ যে পরনির্ভরতার হার ৩৭ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি বাংলাদেশীর শ্লাঘার বিষয়। এ সময়ের মধ্যেই আমাদের রফতানি আয় ১.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। বাংলাদেশের কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-ঘামের বিনিময়ে অর্জন করা অর্থ প্রেরণের পরিমাণ ৭৬১ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আলোচ্য সময়ে রফতানি এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের প্রবৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৮ এবং ৭ গুণ। টাকা-ডলার গড় বিনিময় হারের ভিত্তিতে ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে (টাঃ ৩২.৯২) বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ওই বছর চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ ছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। এ হিসাবে তৎকালে আমরা জিডিপি'র প্রায় ৫ শতাংশ বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করতাম। ১৫ বছর পর ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপি'র (৬২ বিলিয়ন ডলার) বিপরীতে প্রকল্প সাহায্য ও ঋণ মিলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ (১.৫ বিলিয়ন ডলার) জিডিপি'র ২.৪ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব অনুযায়ী গত বছর বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধ করেছে ৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জেনারেল এরশাদের ব্যর্থ সামরিক ও আধা-সামরিক সরকার ১৯৯০ সালে বিদায়ের সময় আমাদের কোষাগারে মাত্র ৫২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিল। আর ষোল বছরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অন্তে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৯০ সালে দেশে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল তৎকালের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের এক-তৃতীয়াংশেরও কম আর আজকের সঞ্চয় বর্তমান সময়ের গড় বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের তিন গুণেরও অধিক।

এবার উপরিউক্ত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কোথায় ব্যয় হচ্ছে, সে খাতভিত্তিক বিশ্লেষণের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১০০ কোটি এবং ৫০০ কোটি টাকার ওপর বৈদেশিক ঋণের টাকা ব্যয়িত হয়েছে এমন মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে দশ এবং তিনটি। অবশ্য ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি খরচ হয়েছে আরো দুটি মন্ত্রণালয়ে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরশীল পাঁচটি খাত হলো বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, পরিবহন, পল্লী উন্নয়ন ও শিক্ষা। এ পাঁচটি খাতেই মোট বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই আবার বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটাতে খরচ হয়। আমরা যদি এ খাতে ২০ শতাংশ হারে মোটামুটি সম্ভাব্য ব্যয় ধরি, তাহলে বর্তমানে গড়ে নিট বার্ষিক বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারের অধিক হবে না। অর্থের হিসাব তো হলো। এখন বাংলাদেশের জন্য এ এক বিলিয়ন ডলারের বিনিময় মূল্যটি জানা এবং বোঝা প্রয়োজন। প্রথমেই যে মূল্যটি আমাদের প্রদান করতে হয়, তা হলো দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক বিষয়েও, এসব তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগীর অনাকাংখিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিক

www.pathagar.com

চাপ প্রয়োগের অধিকার অলিখিতভাবে মেনে নিতে হয়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যের কারণে এমনিতেই বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন। উপরন্তু সাহায্যের নামে উন্নয়ন সহযোগীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রসারিত, ফলে সার্বভৌমত্বের যা-ও বা ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল, সেটিও মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র চাপে বাংলাদেশকে একতরফাভাবে বাণিজ্য উদারীকরণ করতে হচ্ছে, অথচ তার বিনিময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্য বাজার সুবিধা প্রদান করতেও অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্যাবধি সে দেশে আমাদের তৈরি পোশাক রফতানির জন্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করেনি, যদিও এ জাতীয় বাজার সুবিধা তারা এশিয়া ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সব এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রকেই দিয়েছে। আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারত আমাদের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সে দেশে তো দিচ্ছেই না, উপরন্তু শুল্ক আরোপের সাথে বিভিন্ন ধরণের অশুল্ক (প্যারা-ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ) বাধা অব্যাহতভাবে সৃষ্টি করে চলেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি নিরুৎসাহিত করা। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ব্যাটারি রফতানিবিষয়ক জটিলতা নিরসনের জন্য বিগত চারদলীয় জোট সরকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরই কেবল ভারত এ সংক্রান্ত শুল্ক ও অশুল্ক বাধা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিল। এ প্রকারের অসম বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ প্রতি বছর বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সম্প্রতি ভারত মাত্র ৬০ লাখ তৈরি পোশাক বিনা শুল্কে আমদানির ঘোষণা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার আহ্লাদের আতিশয্য দেশবাসীকে বিস্মিত করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে একজন কী পরিমাণ অন্ধকারে থাকলে এমন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন, তা সহজেই বিচার্য।

সরকার সম্প্রতি ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য একলাফে সাত টাকা বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতির আগুনে যে ঘি ঢেলেছে, আমি নিশ্চিত, এ সিদ্ধান্তের পিছনেও বিশ্বব্যাংকের চাপ ক্রিয়াশীল ছিল। বর্তমানে আইএমএফ আরো একটি বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশের ট্যাক্স জিডিপি'র হার বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে তারা এখন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর অবকাশ সুবিধা প্রত্যাহারের কথা বলছে। রফতানি প্রক্রিয়া অঞ্চলের বাইরে বিদ্যুৎ খাত ব্যতীত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে বর্তমানে এলাকা ভিত্তিতে চার থেকে ছয় বছর কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয় যা বিশ্বে আমাদের প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় কমই বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ভিয়েতনাম ও জর্ডানে যথাক্রমে ৮ ও ১০ বছর কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত অধিক হারে শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার কারণে। এমনিতেই বিভিন্ন কারণে অর্থনীতিতে মন্দার পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমছে, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সময় আবার কর অবকাশ সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে আমাদের জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে অধিকতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আইএমএফ'র চিকিৎসাপত্র হলো, একদিকে কর অবকাশ সুবিধা এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ওপর প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে,

www.pathagar.com

অন্যদিকে বাংলাদেশের বাজার বিদেশীদের জন্য অধিকহারে উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া হিসেবে আমদানিতব্য পণ্যের নেগেটিভ লিস্ট সংকুচিত করতে হবে। এমন বন্ধু থাকলে বাংলাদেশের আর শত্রুর প্রয়োজন নেই। বর্তমান সরকার অতিমাত্রায় উন্নয়ন সহযোগীদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও আশা করব যে তারা এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকবে। তবে সেবা খাতে কর অবকাশের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের সাথে অসংগতিপূর্ণ অতি কর্মতৎপরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক চাপের উদাহরণ আমরা প্রাক-এক-এগারোর বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমপিরা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটরদের সাম্প্রতিক বিবৃতি এ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের অব্যাহত চাপ সৃষ্টিরই উদাহরণ। বিস্ময়ের বিষয় হলো, এদের বক্তব্য আবার সময় সুযোগমতো পরিবর্তিত হতেও বিলম্ব হয় না। এটিও আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এক-এগারোর অব্যবহিত পর এদের কাছ থেকেই আমরা একেবারেই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম। সামাজিক বিষয়ে চাপের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের বাংলাদেশের আহমদিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অতি স্পর্শকাতরতা। এ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত উপাসনালয় পরিদর্শন এখন বাংলাদেশ সফরে আসা যুক্তরাষ্ট্রের সব সরকারি কর্মকর্তাদের অবশ্য করণীয়তে পরিণত হয়েছে। সফরসূচি তৈরিতেও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বাংলাদেশ সরকারের মতামতের তোয়াক্কা করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন কখনো অনুভব করেনি। অনৈতিক চাপের অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ ব্যতীত আমাদের এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য বিদেশী সাহায্যের প্রকৃত বিনিময় মূল্যসংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত হবে না। বর্তমান বছরের ১১ জানুয়ারি ঢাকাস্থ ইউএনডিপি'র প্রধান মিজ রেনাটা বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিবিষয়ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ প্রচ্ছন্ন হুমকির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, একটি সার্বভৌম দেশের সেনাবাহিনীকে অনেকাংশে ভাড়াটে সৈন্য বিবেচনাপ্রসূত এ জাতীয় হুমকি যেকোনো দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীর কাছে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং অবমাননাকর ঠেকবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে এ ভাষায় হুমকি প্রদানকারী যেকোনো বিদেশী কূটনীতিককে যে অবিলম্বে সে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হতো, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিনা প্রতিবাদে এ অপমান হজম করার বিষয়টি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে দীর্ঘদিন আমাদের জন্য এক দুঃখজনক ব্যর্থতার অধ্যায় হয়েই থাকবে। এ হুমকির দ্বিতীয় দিকটি অধিকতর রহস্যজনক। মিজ রেনাটার বিবৃতি প্রদানের এক দিন আগে অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব মি. বান কি মুনের মুখপাত্রের একটি সরকারি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সে বিবৃতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটি মাত্র বাক্য রয়েছে এবং বাক্যটি নিম্নরূপ:

'It is hoped that the Army will continue to play a neutral role, and that those responsible for enforcing the law act with restraint and respect for human rights.

www.pathagar.com

(আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার নির্দলীয় চরিত্র অব্যাহত রাখবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংযমী ও মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন)।

লক্ষণীয় যে, জাতিসংঘের বিবৃতিতে বাংলাদেশের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। এমতাবস্থায় এটি ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, ঢাকাস্থ ইউএনডিপি মিশন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যেই ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে শান্তি মিশনের বিষয়টি কূটনৈতিক নিয়মবহির্ভূতভাবে যোগ করেছেন। অনৈতিক ও বেআইনি চাপ প্রয়োগের এ উদাহরণটি নিয়ে অতিরিক্ত কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন হলেও সরকার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে পারে।

এতক্ষণ বার্ষিক এক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য এবং বাংলাদেশের জন্য তার বিনিময় মূল্য নিয়ে যে আলোচনা করলাম, তার মাধ্যমে আশা করি পাঠকরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন যে, এ সাহায্যটি আমাদের আর নেয়া উচিত কি না আর নিলেও কতদিন এটি অব্যাহত রাখা হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমাদের অর্থনীতি আজ এমন এক অবস্থানে এসেছে, নীতিনির্ধারকরা ইচ্ছা করলে একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর এ নির্ভরতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। এক বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সাত হাজার কোটি টাকার এ ফাঁকটি আমাদের দুই দিক থেকে পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে অর্থায়নের জন্য এ পরিমাণ টাকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে। এক-এগারোর আগ পর্যন্ত আমাদের দেশে শিল্পায়নের যে গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, সেটি আগামী পাঁচ বছর অব্যাহত রাখতে পারলে অতিরিক্ত সাত হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ অবশ্যই সম্ভব হতো। এর সাথে আয়করের আওতা বিস্তৃতকরণ, দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা এবং অপচয় রোধ এ তিন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে, অন্যদিকে উন্নয়ন ব্যয়ের সার্বিক মান উন্নত করে ব্যয় সংকোচন করা হলে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আর বিদেশীদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এ তো গেল স্থানীয় মুদ্রার সংস্থানের উপায়। এবার দ্বিতীয় যে চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে, তা হলো বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা। রফতানি বৃদ্ধি এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এ দুই কৌশলের মিশ্রণের মাধ্যমে এ লক্ষ্যটি অর্জন করার মতো ভিত্তি ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। আমরা যদি ধারণা করে নিই যে, শিল্পজাত যেসব পণ্য বাংলাদেশ থেকে এখন রফতানি করা হচ্ছে, তার মূল্যসংযোজনের পরিমাণ গড়ে ৪০ শতাংশ হলে ১ বিলিয়ন ডলার নিট বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়ানোর জন্য আমাদের ২.৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য অতিরিক্ত রফতানি করতে হবে। বর্তমান বছরে বাংলাদেশের ১২.৫ বিলিয়ন ডলার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা মহান আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে অর্জিত হতে যাচ্ছে এবং বর্তমান বছরের রফতানি আয়কে ভিত্তি ধরলে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের জন্য আর মাত্র ২০ শতাংশ অতিরিক্ত রফতানি প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। বিগত পাঁচ বছরে আমাদের রফতানি বেড়েছে প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন ডলার এবং বার্ষিক গড়ে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। বর্তমান বছর এবং ২০০৫-০৬ অর্থবছর - এ দুই বছরই আমাদের রফতানি বৃদ্ধি হয়েছে প্রতি বছর ২ বিলিয়ন ডলার করে। কাজেই বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতা থেকে বের করে আনার জন্য যে ২.৫ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত রফতানি প্রয়োজন, তা অর্জন করা আজকের বাংলাদেশে আর কোনো

www.pathagar.com

অলীক কল্পনা নয় বলেই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। এখন প্রয়োজন শুধু দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বের যারা জাতিকে এ স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র মতো বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সংক্রান্ত এ নিবন্ধটি ২০০১ সালের অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী এবং জনপ্রিয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মি. জোসেফ স্টিগলিজের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Globalization and its discontents' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমাপ্ত করতে চাই। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র বর্তমান নেতিবাচক কর্মপদ্ধতি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে চমৎকারভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

'The two institutions could have provided countries with alternative perspectives on some of the challenges of development and transition, and in doing so they might have strengthened democratic processes. But they were both driven by the collective will of the G-7 (the governments of the seven most important advanced industrial countries), and especially their finance ministers and treasury secretaries, and too often, the last thing they wanted was a lively democratic debate about alternative strategies.'

(উন্নয়ন ও যুগ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে এ দুটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশকে বিকল্প দর্শন দিতে পারত এবং এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুসংহত হতো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো আজ জি-৭(বর্তমানে জি-৮) রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত অভিলাষ বিশেষত তাদের অর্থমন্ত্রীদের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে এবং বিকল্প কৌশল সম্পর্কে কোনো রকম প্রাণবন্ত, গণতান্ত্রিক বির্তক এদের একেবারেই পছন্দ নয়।)

মি. স্টিগলিজের এ মন্তব্যের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক কিংবা আইএমএফ'র প্রাসংগিকতাবিষয়ক বিতর্কটিই সম্ভবত অনাবশ্যক।

০৫.০৬.০৭

www.pathagar.com

ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ সংযোগের নেপথ্যে

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অদূরে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৬ টিসিএফ মজুদবিশিষ্ট একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে সেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মসূচি সমাপ্ত করেছে। মিয়ানমারের গ্যাস সমৃদ্ধ এ-ওয়ান ব্লকটিতে দক্ষিণ কোরিয়ার দেইয়ু ইন্টারন্যাশনাল, ভারতের তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি, ভারতের গেইল (GAIL) ইন্ডিয়া লিমিটেড ও কোরিয়া গ্যাস করপোরেশনের যথাক্রমে ৬০, ২০, ১০ এবং ১০ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্রের অদূরেই এ-থ্রি গ্যাসক্ষেত্রের ১০০ ভাগ মালিকানা দেইয়ু করপোরেশনের থাকলেও ভারতের গেইল (GAIL)-কে আবার ওই ব্লকের গ্যাস বাজারজাতকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি যে, এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে দু'টি পরাশক্তির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য অথচ তীব্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিযোগিতা চলছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উভয় দেশই আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে এ দুই দেশেরই আমদানিকৃত জ্বালানি চাহিদার বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি বিশ্বের অন্য সব দেশকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। পাঠকরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে, আমি চীন ও ভারত নিয়েই আলোচনা করছিলাম। মিয়ানমারে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত এ গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাস ক্রয়ের জন্য স্বাভাবিকভাবেই চীন ও ভারত উভয়েই বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গ্যাসপ্রাপ্তির এ প্রতিযোগিতায় কে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে তা প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অবশ্যই গ্যাসের প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্বিতীয়টি এ গ্যাস পরিবহনের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সম্ভাব্যতা। আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে বাংলাদেশের আবশ্যিক প্রাসংগিকতা শুরু হয়েছে গ্যাস পরিবহনের পন্থাকে কেন্দ্র করেই।

মিয়ানমারের আলোচিত গ্যাসক্ষেত্রটিতে যেহেতু ভারতের বিনিয়োগ রয়েছে সে কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে মিয়ানমার সরকারও ভারতেই গ্যাস বিক্রয়ে অধিকতর উৎসাহী ছিল। এ প্রেক্ষিতেই সে দেশের রাজধানী ইয়াংগুনে ১২ ও ১৩ জানুয়ারি, ২০০৫ তিন দেশের জ্বালানিমন্ত্রীত্রয় বাংলাদেশের এ কে এম মোশারফ হোসেন, ভারতের মনিশংকর আইয়ার এবং মিয়ানমারের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুন থি ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত উত্থাপন করা হয় ঃ ১. নেপাল ও ভুটান থেকে বাংলাদেশ জলবিদ্যুৎ আমদানির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে ভারত প্রয়োজনীয় ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করবে। ২. নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্থল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক প্রদান করবে। ৩. বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বর্তমান বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ভারত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ভারত উপরোক্ত শর্ত তিনটিকে সমঝোতা স্মারকের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ বিষয়টিকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করে। এমতাবস্থায়, কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব না হওয়ায় ১৩ জানুয়ারি একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মন্ত্রী পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় আলোচনাটি সমাপ্ত হয়।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওই বছরই ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াংগুনে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যৌথ কারিগরি-বাণিজ্যিক কার্যনির্বাহী কমিটির (Techno Commercial Working Committee) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই কমিটিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পেট্রোবাংলার তৎকালীন চেয়ারম্যান এস আর ওসমানী এবং পরিচালক (অপারেশন) খন্দকার আব্দুস সালেক অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী আলোচনা শেষে স্ব-স্ব দেশের নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ সম্মতিসাপেক্ষে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। কিছুটা বিস্ময়করভাবে ওই সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য শর্ত তিনটি শুধু মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট করা হয় এবং মূল চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনোরূপ উল্লেখ না থাকায় সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বর্ণিত সমঝোতা স্মারকটি কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হবে। পরে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে সরকারিভাবে প্রস্তাব করা হলে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সে প্রস্তাব অনুমোদনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বহুল আলোচিত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের এমনই এক অচলাবস্থা চলাকালীন ২০ জুন, ২০০৫ এ নিবন্ধকারকে সরকার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করে। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের আমন্ত্রণে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মনি শংকর আইয়ার এক দিনের সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন। গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে মি. আইয়ার এবং তার সফর সংগীদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এবং নিবন্ধকারের নেতৃত্বে শেরাটন হোটেলে অর্ধদিবসব্যাপী একটি দরকষাকষি অথবা মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এ আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত একটি স্মারক মোরশেদ খানের আমন্ত্রণে সরকারিভাবে সান্ধ্য ভোজসভাকালীন সময়ে স্বাক্ষরিত হবে। সমঝোতা স্মারকটি প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ পক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাতের প্রত্যাশিত ভূরিভোজটি যে নিবন্ধকার এবং মি. মনি শংকরের মধ্যকার প্রচন্ড মতবিরোধের কারণে প্রায় পরিত্যক্ত হবে এ রকম কোনো আশংকা ঘূণাক্ষরেও তখন অবধি কোনো পক্ষের মনেই উদিত হয়নি। যাহোক, ভোজের নির্ধারিত সময়ে প্রধান টেবিলে বাংলাদেশ সরকারের সব বিশাল ও ক্ষমতাবান মন্ত্রীদের সাথে আমার মতো ব্রাত্যজনেরও বসার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রধান অতিথির সাথেই। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আমার সহকর্মীদের প্রস্তুতকৃত দিনব্যাপী আলোচনার খসড়াটি দেখামাত্র মনি শংকর আইয়ারের প্রচন্ড ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং তিনি বোধ হয় খানিকক্ষণের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, ভোজসভাটি ভারতে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ঘটনার আকস্মিকতায় ভোজসভার আয়োজনকারী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার অবিমৃষ্যকারিতাজনিত একগুঁয়েমিতে টের পাচ্ছিলাম যে, আমাদের বড় বড় মন্ত্রী যারপরনাই বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমি কোনো চাপের মুখেই ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত মি. আইয়ার নিজেই বাংলাদেশস্থ তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রিকে দ্বিপক্ষীয় স্মারকের বিষয়ে নতুন করে ডিক্টেশন দিতে শুরু করলেন। তার ইংরেজির ব্যুৎপত্তি আমাদের সবারই জানা এবং ডিক্টেশনটি তিনি বেশ স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করলেন। মজার ব্যাপার হলো, ডিক্টেশন শেষে যে দলিলটি প্রস্তুত হলো তার সাথে আমি অন্তত আমাদের সহকর্মীদের প্রস্তুতকৃত দলিলের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি। ওই দলিলটি এখনো নিশ্চয়ই জ্বালানি এবং পররাষ্ট্র উভয় মন্ত্রণালয়ের নথিতেই পাওয়া যাবে। ডিক্টেশন দেয়া শেষ করেই মি. আইয়ার প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা' থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমার ধারণা, এর চেয়ে নিরানন্দময় এবং বিব্রতকর আর কোনো অনুষ্ঠান 'পদ্মা'য় কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

যাহোক, এ ঘটনার অব্যবহিত পর ভারত সরকার মি. আইয়ারের দফতর পরিবর্তন করে এবং তাকে তুলনামূলকভাবে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতিবিষয়ক অনেক বোদ্ধা ধারণা করে থাকেন যে, মি. আইয়ারের দৃশ্যত পদাবনতির পেছনে তার ঢাকায় ডিক্টেশন দেয়া দলিলটি মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং নাকি বিষয়টিকে তার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে মনি শংকরের অনধিকারচর্চা হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। এ সবই বিশ্লেষকদের বক্তব্য এবং প্রকৃত নেপথ্য কাহিনী অবশ্যই আমাদের অজ্ঞাত। চারদলীয় জোট সরকারও তাদের ক্ষমতাকালীন বাকি সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতা এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেনি এবং দায়িত্ব ত্যাগ করা পর্যন্ত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। তবে ভারতের তরফ থেকে গ্যাস লাইনের অধিকার লাভের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ গত সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সে দেশের সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে বলে গেছে যে, এ গ্যাস পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় আমাদের তিনটি শর্তের কোনোটিই ভারত সরকারের বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতের জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা এবং জ্বালানিবিষয়ক কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই চারটি বিকল্পের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন সম্ভব বলে দাবি করতেন বা এখনো করে থাকেন। তাদের প্রস্তাবিত বিকল্পগুলো হলো, মিয়ানমারের গ্যাসকে এলএনজিতে পরিবর্তন করে ট্যাংকারের মাধ্যমে ভারতে পরিবহন, গ্যাসকে সিএনজিতে পরিবর্তন করে বার্জের মাধ্যমে পরিবহন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বাইরে দিয়ে গভীর সমুদ্রতলে পাইপলাইন স্থাপন এবং বাংলাদেশের ভূসীমা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে নাগাল্যান্ডের পাহাড়সংকুল এবং নাগা বিদ্রোহীদের এলাকার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন স্থাপন। এ বিকল্প প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো এবং বিবিসি কিছুদিন পরপরই আমার অভিমত জানতে চাইত। প্রত্যুত্তরে যথোপযুক্ত বিনয়ের সাথে আমি ধারাবাহিকভাবে একটি জবাবই দিয়ে গেছি আর তা হলো, ভারতের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল (Good luck to them.)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের অবগতির জন্যই এ ইতিহাস বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ছিল। এবার বর্তমানে ফেরা যাক। দেশবাসীর কাছে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হচ্ছে, অনেকটা যেন আকস্মিকভাবেই জরুরি সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা ত্রিদেশীয় গ্যাসলাইনের প্রতি অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। মিয়ানমার সফর শেষ করে দেশে ফিরেই পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা করলেন, 'মিয়ানমার গ্যাস বিক্রি করতে রাজি হলে এবং ভারত তা কিনতে সম্মত হলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিদেশীয় পাইপলাইন স্থাপন নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের আপত্তি নেই। আলোচনার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করব, আমরা রাজস্ব পাব।' পররাষ্ট্র উপদেষ্টার এ আগ্রহ প্রকাশের পরপরই জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরীর বক্তব্য শুনে মনে হলো আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতকে খুশি করার জন্য সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। মি. চৌধুরী আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'আমাদের যেহেতু হারানোর কিছু নেই, এ কারণে কোনো রকম শর্ত ছাড়াই আমরা আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত। পক্ষান্তরে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব।' বহুল আলোচিত গ্যাস পাইপলাইন সম্পর্কে দুই উপদেষ্টার বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ সরকারের কোনো পর্যায় থেকেই এখনো যেহেতু শোনা যায়নি, কাজেই ধারণা করছি যে, উল্লিখিত দু'জন উপদেষ্টা তাদের বক্তব্যে সামরিক বাহিনী সমর্থিত বর্তমান সরকারের সামগ্রিক নীতিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিষয়টি সত্য হলে এর চেয়ে পরিতাপের আর কিছু হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এ নিবন্ধে উল্লেখিত দুই সরকারের মধ্যকার অস্বাক্ষরিত একটি দলিলের (Non Paper) অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোনো এক অজানা উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত সে কাগজটিকে আমলে নেয়ার কোনো প্রয়োজন আপাতদৃষ্টিতে অদ্যাবধি বোধ করেননি। উপদেষ্টাদ্বয়ের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে তাদের চিন্তা-চেতনার যে রূপটি আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে, তা নিম্নে বিধৃত হলো :

১. ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন নির্মিত হলে বাংলাদেশের হারানোর কিছু নেই।

২. মিয়ানমার এবং ভারতের মধ্যে গ্যাস বিনিময় বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মতো যদিও বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আলোচ্য পাইপলাইনের একটি বৃহৎ অংশ স্থাপিত হবে।

৩. এ পাইপলাইন স্থাপিত হলে রাজস্ব বাবদ বাংলাদেশ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে।

৪. গ্যাস পাইপলাইনবিষয়ক আলোচনার জন্য বাংলাদেশ তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক অবস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসে সব শর্ত প্রত্যাহারে সম্মত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি আপাত উদাসীনতার এ নীতিতে যেকোনো দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীই যে একাধারে ব্যথিত এবং আতংকিত হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সরকারের দুই প্রভাবশালী উপদেষ্টার উপরোক্ত কুযুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে বৃহৎ প্রতিবেশীর ক্ষমতার কারণে ভীত এক প্রকার আত্মসমর্পণমূলক দুর্বল মানসিকতা দেশবাসীর কাছে প্রতিফলিত হবে বলেই ধারণা করছি।

www.pathagar.com

যেকোনো নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে কোনো তৃতীয় দেশের গ্যাস সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন স্থাপনের সাথে আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। অনেকেই হয়তো অবগত আছেন, রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করে। এ গ্যাস সরবরাহ নিয়ে ওই অঞ্চলের দেশগুলো কতবার পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে এবং কতগুলো সরকারের পতন হয়েছে এ তথ্যগুলো মাননীয় উপদেষ্টাদের নীতিনির্ধারণী বক্তব্য দেয়ার আগে জানা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে অন্য একটি প্রস্তাবিত এবং আলোচিত ত্রিদেশীয় ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন যে বিশ্বের একমাত্র মুরব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির কারণে করা যাচ্ছে না সে বিষয়টিও কি উপদেষ্টারা জ্ঞাত নন? আমার স্মরণে আছে যে, ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে চারদলীয় জোট সরকারের গৃহীত নীতির এবং দৃঢ় অবস্থানের প্রতি তখন সব নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞেরই সমর্থন ছিল। এখন সে সব বিশেষজ্ঞেরও নিরাপত্তাবিষয়ক দর্শনের পরিবর্তন হয়েছে কি না সে তথ্যটি অবশ্য আমাদের অজানা। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যারাই কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকার চেষ্টা করেন তারা সবাই অবহিত আছেন যে, জ্বালানিই হচ্ছে বৃহৎ শক্তিবর্গের আজকের সব কৌশলের মূল অস্ত্র। জ্বালানি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে আমাদের বিদগ্ধ শাসকদের যেকোনো ভুল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকেই দুর্বল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট – এটি যেন তারা কোনো অবস্থাতেই বিস্মৃত না হন। বৈদেশিক মুদ্রায় রাজস্ব আয়ের আশায় উদ্বেলিত উপদেষ্টাদের কাছে আমাদের সরল জিজ্ঞাসা হচ্ছে – রাজস্ব আয়ের এ সোনার হরিণের পরিমাণটি কত? আমাদের জানা মতে, পূর্ববর্তী প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের জন্য বাংলাদেশ সঞ্চালন চার্জ বাবদ বছরে ১০০ থেকে ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান আকারের তুলনায় এ অংকটি একাধারে অকিঞ্চিতকর এবং অনুল্লেখ্য। উপদেষ্টাদের বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি আয় এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মহান আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় যথাক্রমে ১২ হাজার ৫০০ এবং ৬ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। শতকরা হিসাবে গ্যাস পাইপলাইন বাবদ প্রত্যাশিত রাজস্ব আয় হবে আমাদের বার্ষিক রফতানি আয়ের ১ শতাংশেরও কম। বিগত চারদলীয় জোট সরকার যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত একটি সরকার ছিল এ সত্যটি সম্ভবত তাদের চরমতম শত্রুর পক্ষেও অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। সে সরকার রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেই ভারতের কাছে গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের সাথে তিনটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত শর্ত প্রদান করেছিল। প্রধান উপদেষ্টা বর্তমান সরকারকে সর্বদাই একটি সংবিধানসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দাবি করেন। সংবিধানের ৫৮ঘ অনুযায়ী এ প্রকার সরকারের কার্যাবলি নিম্নলিখিতভাবে সংবিধানে বিধৃত আছে :

'অনুচ্ছেদ ৫৮ঘ : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী ১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। ২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।'

আমাদের জানা মতে, বর্তমান উপদেষ্টামণ্ডলী যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। এখন আপনারাই বলুন, জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের দেশের স্বার্থে প্রদত্ত শর্তাবলি সংবিধানের কোন ধারাবলে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রত্যাহারের ক্ষমতা রাখে? আমার সাধারণ জ্ঞানে এ জাতীয় দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত কোনো জরুরি আইনের শক্তিতে কখনোই বৈধ করা সম্ভব হবে না। কারোরই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, বাংলাদেশ ১৫ কোটি গর্বিত জনগোষ্ঠীর একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। কাজেই মিয়ানমার, ভারত এবং বাংলাদেশের সমন্বয়ে যখন কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে, সে রকম কোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব আন্তর্জাতিক আইনেই আমাদের বাংলাদেশ সমঅধিকারের দাবিদার। বাংলাদেশের জনগণ কখনোই এ দেশকে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণকারী তথাকথিত একটি ব্যানানা রিপাবলিকে পরিণত হতে দেবে না – এ আস্থা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বহুল আলোচিত মিয়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের সব দিক নির্মোহভাবে বিচার করলে এ সত্যটি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে সর্বতোভাবে এবং সর্বাধিক লাভবান হবে আমাদের প্রতিবেশী ভারত। বিগত বছরগুলোতে ভারতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে সর্বপ্রকার জ্বালানি চাহিদা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে জ্বালানির এ চাহিদা বৃদ্ধি চীনের সমতুল্য। কাজেই মিয়ানমারে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস আহরণের জন্য চীন ভারতের সাথে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এ নিবন্ধে আলোচিত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পে বিভিন্ন জটিলতার সুযোগ গ্রহণ করে চীন ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ-ওয়ান ব্লক থেকে গ্যাস ক্রয়ের জন্য মিয়ানমারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক ভারতকে এক প্রকার অন্ধকারে রেখেই দ্রুততার সাথে সই করে ফেলেছে। এ চুক্তি প্রসঙ্গে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে মন্তব্য করেছেন, 'That agreement with China was perceived as a serious set back to our quest for energy security' (আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে চীনের সাথে ওই চুক্তি একটি বড় বাধা হিসেবেই বিবেচিত হবে)। ভারতীয় জ্বালানি কর্মকর্তার এ মন্তব্য থেকেই জ্বালানি বিষয়ে সে দেশের মরিয়া অবস্থার প্রমাণ মিলছে। আমাদের আরো উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মিয়ানমারের জন্য চীন অথবা ভারত যেকোনো দেশেই গ্যাস বিক্রয়ে তাদের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই অথবা সে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও তেমন কোনো আশংকা নেই।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মিয়ানমারের জ্বালানির জন্য বাংলাদেশের বৃহৎ দুই প্রতিবেশীর এ লড়াই কৌশলগত কারণেই আমাদের দেশের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করে দরকষাকষির একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি করেছে। গত চারদলীয় সরকার দুর্নীতি দমনে লজ্জাকর ব্যর্থতাসহ কিছু বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও অন্তত দেশের জ্বালানি

www.pathagar.com

নিরাপত্তার স্বার্থটিকে সম্পূর্ণ দেশপ্রেমের সাথে সংরক্ষণ করেছে এবং ওই বিষয়ে কোনো প্রকার ছাড় প্রদান করেনি – এ দাবি দৃঢ়তার সাথেই করা যায়। আমার অত্যন্ত বিস্ময় জাগে জ্বালানি নিরাপত্তার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে বর্তমান সরকার গত সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে কোনো রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন। অনভিজ্ঞতা এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ এ দুই কারণের সমন্বয়েই সম্ভবত তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক জ্বালানি মন্ত্রীদের সম্মেলনে যাওয়ার প্রাক্কালে সম্ভবত কোনো প্রাথমিক বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা ভারতের অভ্যন্তর দিয়ে নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির এক বায়বীয় প্রস্তাব করে আন্তর্জাতিক অংগনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট হাস্যোস্পদ করেছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী দিল্লীর বৈঠকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশের কারো কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। এখন আবার মিয়ানমার থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির নতুন এক পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে। আশা করি, এবারকার প্রস্তাব অন্তত যথেষ্ট হোম ওয়ার্ক সম্পন্ন করে মিয়ানমার সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করেই উত্থাপন করা হয়েছে। চুন খেয়ে দ্বিতীয়বার মুখ পুড়লে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে এ জাতীয় সমন্বয়হীনতা এবং অনভিজ্ঞতার নিদর্শনে জনগণ ক্রমেই এ সরকারের সফলতার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ যুক্তিসংগত কারণেই একটি দীর্ঘমেয়াদি, বহুমাত্রিক এবং বাস্তবসম্মত জ্বালানি কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত ভবিষ্যৎ সরকারের ওপর ন্যস্ত করাই সম্ভবত অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। আর এ বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা বর্তমান সরকারের ওপর যদি থেকেই থাকে তাহলে সে সিদ্ধান্ত সব দেশপ্রেমিক শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হলেই কেবল জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

০৬.০৬.০৭

www.pathagar.com

স্বাধীনতা থেকে এক-এগারো এবং পরবর্তী গন্তব্য

এক.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান নিবন্ধে একটি জটিল এবং বিতর্কিত বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য প্রথমেই বিদগ্ধ পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। একজন সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন অথচ রাজনীতিমনস্ক নাগরিক হিসেবেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির পরিবর্তনের ধারাটি সবসময় বোঝার চেষ্টা করেছি। ড. তালুকদার মনিরুজ্জামানসহ আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে তাদের নানাবিধ বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন। তবে এক-এগারো আমাদের দেশকে একেবারেই নতুন এবং অজানা এক পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে এবং এ পরিস্থিতি থেকে অপরিহার্য শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণের উপায় খুঁজতে হলে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ধারার একটি নির্মোহ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীতা রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দেশের পূর্ব অংশকে শুধু একটি পশ্চাৎ প্রদেশ (hinter land) হিসেবে বিবেচনা করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে শোষণ করার ঔপনিবেশিক কৌশল অবলম্বন করে। সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের শাসকশ্রেণী প্রধানত সামন্ত প্রভুদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। পক্ষান্তরে আজকের বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনীতিবিদদের অনেকেই অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এদের মধ্যে সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনার রাজনীতিবিদ যে একেবারেই ছিলেন না বিষয়টি সে রকম না হলেও আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমাজের সব শ্রেণী থেকে আসা একটি ইতিবাচক মিশ্রণ থাকার ফলে মাটি-মানুষের সাথে তাদের সব সময়ই একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি করেই পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃতি, মানুষ, ভাষা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃতি, মানুষ, ভাষা ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোনো দিনই কোনো ধরনের সহমর্মিতা গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিকভাবে একই দেশের দুই অংশের এই বিশাল বিভেদকে শুধু ধর্মের বন্ধন দিয়ে একীভূত রাখা প্রকৃতির নিয়মেই সম্ভব ছিল না। উপরন্তু চারিত্রিকভাবেই অত্যন্ত উদ্ধত এবং নৃশংস পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের সাধারণ মানুষের নির্ভেজাল ধার্মিকতার কোমল সুফি রূপটি চিনতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এমতাবস্থায় পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের বিভাজন শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত এবং সফল ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের বিভাজন প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল হতে সাহায্য করেছিল। এই ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মোট

www.pathagar.com

ভোটের ৭৪.৯ শতাংশ পেয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৬০টি সংসদীয় আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পকিস্তান পিপল্‌স পার্টি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮১টি আসন লাভ করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের আইন অনুযায়ী মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার বৈধ দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে । শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অধ্যায় এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের ওপর প্রচুর সুলিখিত বই রয়েছে। এ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করার কোনোরূপ ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমি কোনোভাবেই ধারণ করি না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার যে পরিবর্তন গত ৩৬ বছরে সাধিত হয়েছে, শুধু সে বিষয়টি বিশ্লেষণে সহায়তার জন্যই স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গটি উত্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে। সেই নির্বাচনের আগেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করেছিল - জাসদ তত দিনে জন্মলাভ করেছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার যাত্রাও দ্রুত নিম্নগতি লাভ করছিল। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সেসময়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মেজর জলিল, ড. আলীম-আল রাজি, ইঞ্জিনিয়ার রশীদ, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, মোশতাক আহমেদ চৌধুরী, প্রমুখের পরাজয়। অনেক নিষ্ঠাবান আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও হয়তো অন্তত সত্যের খাতিরে এত বছর পরে হলেও স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশে নির্বাচনে কারচুপির ইতিহাসও শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই। যা-ই হোক, ওই নির্বাচনের সরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৩.২ শতাংশ ভোট পেয়ে জাতীয় সংসদে ২৯৩টি আসন লাভ করেছিল। অর্থাৎ পাওয়া ভোটের শতকরা হিসেবে ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তুলনায় শতকরা ১.৭ শতাংশ ভোট কম লাভ করেছিল। বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন থেকে ১৯৭৫ সাল মাত্র এই দুই বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের আদর্শচ্যুতি, দুর্নীতি, প্রশাসন পরিচালনায় অদক্ষতা এবং অতি মাত্রায় সোভিয়েত-ভারত অক্ষশক্তির প্রতি নির্ভরশীলতার সমন্বয়ে দেশের রাজনীতি এক অপরিবর্তনীয় ইতিহাস নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করেছিল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রামরত মরহুম শেখ মুজিব অবিশ্বাস্যভাবে চরম একনায়কে পরিণত হয়ে জনগণের সব অধিকার হরণকারী একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে তার শাসনযন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি প্রোথিত করেন। দেশব্যাপী চরম দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অত্যাচার এবং অজনপ্রিয় একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রর্বতনের অবশ্যম্ভাবী মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর একটি অংশের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তরুণ সেনানায়ক ও বীর

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান সেই দিনের বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এলেন এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সময়ের চাহিদাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নব আদর্শ সংবলিত রাজনৈতিক প্লাটফর্ম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে আজো দু'টি পৃথক রাজনৈতিক ধারার প্রতিযোগিতাই বাংলাদেশের রাজনীতিকে সর্বাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আটটি সংসদ নির্বাচন আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফলটি বিবেচনা বহির্ভূত রাখলে বাকি নির্বাচনগুলোতে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রায় দেয়ার একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমানের স্থাপিত দল বিএনপি ৪১.২ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০৭টি সংসদীয় আসন লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়। ওই নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক দল আওয়ামী লীগ ২৪.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৩৯টি আসন লাভ করে। ১৯৮১ সালে বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক একদল বিদ্রোহী সেনা সদস্যের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে শহীদ জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হওয়ার এক বছরের মাথায় ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি সাত্তার সরকারকে উৎখাত করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখলের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাহ্যিকভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ১৯৮৩ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করার ফলে কোনোরূপ রাজনৈতিক আর্দশবিহীন এরশাদ সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তার নিজস্ব দল জাতীয় পার্টি সংগঠিত করেন। মরহুম জিয়াউর রহমানের বিপুলভাবে জনপ্রিয় ১৯ দফা কর্মসূচির অনুকরণে এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তার সপক্ষে জনমত সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর ভাঙনই এরশাদের অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং বিএনপি'র অনেক জাঁদরেল নেতাই সেই সময়ে এরশাদের তথাকথিত কিংস পার্টিতে যোগদান করে। এরশাদের সামরিক শাসনকে রাজনৈতিক বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সহায়তায় ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়াই। ওই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যথাক্রমে ৪৩.৩ শতাংশ ভোট ও ১৫৩টি সংসদীয় আসন, ২৬.২ শতাংশ ভোট ও ৭৬টি সংসদীয় আসন এবং ৪.৬ শতাংশ ভোট ও ১০টি সংসদীয় আসন লাভ করে। অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের তুলনায় ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১.৬ শতাংশ বেশি ভোটপ্রাপ্ত হয়। ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে জেনারেল এরশাদের একদলীয় নির্বাচন ছিল বিধায় ওই নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত কোনো বিশ্লেষণ করলে শুধু নিবন্ধের মূল্যবান স্থানেরই অপচয় ঘটবে।

এরশাদের আট বছরব্যাপী চূড়ান্ত ব্যর্থ স্বৈরশাসন পতন-পরবর্তী ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বপ্রথম সরকারি প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

বিজয়ের ব্যাপারে অতি আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ম্যান্ডেট লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী যথাক্রমে পাওয়া ভোটের ৩০.৮, ৩৩.৭, ১১.৯ ও ১২.১ শতাংশ লাভ করে। অবশ্য সংসদীয় আসনের হিসেবে উপরোল্লিখিত দলগুলো যথাক্রমে ১৪০, ১০০, ৩৫, ও ১৮টি আসন লাভে সমর্থ হয়। আলোচ্য নির্বাচনে সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ভোটাররা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ৩০.৭ শতাংশ ভোট এবং জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি চিন্তা-চেতনার পক্ষে ৫৪.৮ শতাংশ ভোট প্রদান করেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির অত্যন্ত বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা সঙ্গত কারণেই একেবারেই নিরর্থক। দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব নেয়ার ১৫ বছর পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। আলোচ্য নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যথাক্রমে ৩৩.৬, ৩৭.৪, ১৬.৪ ও ৮.৬ শতাংশ ভোট পায়। মোট প্রদত্ত ভোটের হিসাবে এবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর পাওয়া ৩৭.৪ শতাংশ ভোটের বিপরীতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক ধারা অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারার পক্ষে ৫৮.৬ শতাংশ ভোটার তাদের রায় প্রদান করে। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন না এমন ভোটারের সংখ্যা ৩.৮ শতাংশ বেড়ে যায়, যদিও সংসদীয় গণতন্ত্রের সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে কথিত ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের অক্টোবরের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর ভোটের সংখ্যা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় ১.১ শতাংশ বাড়লেও সংসদীয় আসনের ক্ষেত্রে তাদের বলতে গেলে চরম ভরাডুবি ঘটে এবং তারা মাত্র ৬২টি সংসদীয় আসন লাভে সমর্থ হয়। শেষোক্ত নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধবাদীরা পাওয়া ভোটের ৫১.৮ শতাংশ পেয়ে ২২৬টি আসন লাভ করে। বাংলাদেশের আটটি সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যে প্রথম (১৯৭৩), তৃতীয় (১৯৮৬), চতুর্থ (১৯৮৮) ও ষষ্ঠ (১৯৯৬, ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনের ফলাফলের হিসাব নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত কারণে এই নিবন্ধের বিশ্লেষণের বাইরে রাখলে বাংলাদেশের জনগণের ভোট প্রদানের যে নিম্নরূপ ধারাটি আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে একটি পরিষ্কার সামঞ্জস্য অতি সহজেই দৃশ্যমান :

		পাওয়া ভোটের শতকরা হিসাব			পাওয়া সংসদীয় আসন		
সংসদ নির্বাচন	তারিখ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সমমনা	অন্যান্য	বাঙালি জাতীয়তাবাদ	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সমমনা	অন্যান্য
দ্বিতীয়	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	২৪.৬	৪১.২	৩৪.২	৩৯	২০৭	৫৮
পঞ্চম	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১	৩৩.৭	৫৪.৮	১১.৫	১০০	১৯৩	৭
সপ্তম	১২ জুন, ১৯৯৬	৩৭.৪	৫৮.৬	৪.০	১৪৬	১৫১	৩
অষ্টম	১ অক্টোবর ২০০১	৩৮.৫	৫১.৯	৯.৬	৬২	২২৬	১২

www.pathagar.com

জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটপ্রাপ্তির ধারা : ছকে 'অন্যান্যের' ভোটপ্রাপ্তির যে হিসাব দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ডানপন্থী, বামপন্থী, বিভিন্ন দলের বিদ্রোহী প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটও রয়েছে । হয়তো এ কারণেই ভোটপ্রাপ্তির এই সংখ্যাকে প্রধান দুই রাজনৈতিক ধারার বহির্ভূত একটি সম্ভাব্য তৃতীয় ধারা বিবেচনা করাও যেতে পারে, যদিও আমার এই অভিমত নিয়ে সুস্থ বিতর্কের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তদুপরি সম্ভাব্য তৃতীয় ধারার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতীয়মান হচ্ছে না, যাতে করে মনে হতে পারে যে, সেই তৃতীয় ধারা অদূর ভবিষ্যতে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হতে পারে। ভোটপ্রাপ্তির পরিসংখ্যানের উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসারে প্রমাণ হচ্ছে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার দলগুলো সর্বনিম্ন ২৪.৬ থেকে সর্বোচ্চ ৩৮.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে । অন্য দিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী তিনটি দল সর্বনিম্ন ৪১.২ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫৮.৬ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছে। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, জাতীয় পার্টির ভোট এরশাদের অবর্তমানে কোন দিকে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, সে রকম পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে মেরুকরণ ঘটবে তাতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীই অধিকতর শক্তিশালী হবে। তবে এ বিশ্লেষণ নিয়ে অবশ্যই ভিন্নমত থাকতে পারে এবং এ বিষয়ে আরেকটি অর্থবহ বিতর্ক হওয়াও সম্ভব ।

১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের ভোটভিত্তিক রাজনীতির উপরোক্ত বিশ্লেষণের জোরে এই দাবিটি এখন দৃঢ়তার সাথেই করা যায় যে, মরহুম জিয়াউর রহমানের দর্শনভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থনের শক্তিতে এ দেশে প্রধান রাজনৈতিক ধারা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এ কারণেই যখনই এরশাদের মতো নতুন কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন তখনই এই প্রধান ধারাটিকেই বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিএনপিতে ছোট-বড় মিলিয়ে বারো-দশেক বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্তি এসেছে। দলত্যাগের এই বিশাল মিছিলের উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো– শাহ্ আজিজ, শামসুল হুদা চৌধুরী, হালিম চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ, ওবায়দুর রহমান, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শেখ রাজ্জাক আলী, কর্নেল অলি এবং ইদানীংকার আলোচিত ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী। এমনকি শেখ হাসিনাও তার শাসনামলে বিএনপি থেকে নির্বাচিত দু'জন স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত সংসদ সদস্যকে মন্ত্রী বানিয়ে বিএনপিকে ভাঙার আরেকটি ব্যর্থ ও চমকপ্রদ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। গত দুই দশকে যে অসংখ্য ছাত্রনেতা ক্ষমতাসীনদের প্রদত্ত উৎকোচের আকর্ষণে প্রধানত জাতীয়তাবাদী ঘরানা থেকে দলত্যাগী হয়েছেন তাদের বিশাল ফর্দ আপাতত আলোচনার বাইরেই রাখলাম। মোদ্দা কথা হলো, যখনই নতুন কোনো শক্তি ক্ষমতায় আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা অবধারিতভাবেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধের কিস্তিতে আরোহণ করেই রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেছেন। অপরপক্ষে অখণ্ড বাঙালি প্রেমে আপ্লুত ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কিন্তু ১৯৮১ সালের পরবর্তী গত ২৬ বছরে আরো সংহত হয়েছেন। সেই বিচারে তাদের নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা ও চতুরতা এবং ওই ধারার কর্মীবাহিনীর বিশ্বস্ততার সাধুবাদ দিতে কোনো কার্পণ্য করা

www.pathagar.com

অনুচিত হবে। তবে বিষয়টিকে অতি সরলীকরণের বাইরে রেখে এ রহস্যের আরেকটু গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের প্রতিবেশী আঞ্চলিক শক্তি বাংলাদেশে তাদের পছন্দের দল হিসেবে সর্বদাই আওয়ামী লীগকেই বেছে নিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাঙালিত্বে বিশ্বাসী শক্তি যখনই কোনো সঙ্কটে পতিত হয়েছে তখনই তাদের বহির্দেশীয় এসব বন্ধু দেশীয় এজেন্টদের সহায়তায় সঙ্কট উত্তরণের জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে কোনো কার্পণ্য করেনি। আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, শহীদ জিয়ার প্রশ্নাতীত সৎ নেতৃত্বের শক্তিতে বাংলাদেশ যখন বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল, তখনই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে ১৯৭৫ সালে সৌদি আরবের স্বাধীনচেতা বাদশাহ্ ফয়সালের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যা-ই হোক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বারবার বিভাজিত করার চাতুর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্য বজায় রাখার প্রচেষ্টায় বিদেশী মদদের রহস্যজনক বিষয়টি উদঘাটনের দায়িত্ব অবশ্যই সামরিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের ওপরই ন্যস্ত। ১৫ কোটি জনশক্তির এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জ্বালানিসম্পদ সংবলিত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকলে বর্তমানে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী মৌলবাদী খ্রিষ্টান-ইহুদি-হিন্দুত্ববাদীরাই যে লাভবান হবেন, এ নিয়ে সন্দেহবাদীদের সংখ্যা আমার বিবেচনায় নগণ্য হওয়ারই কথা। ওয়াশিংটনে কট্টরপন্থী রক্ষণশীল সংগঠন 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন' আয়োজিত এক সাম্প্রতিক সভায় মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একযোগে কাজ করার ঘোষণা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বছরখানেক আগে ভারত সফরে এসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইস বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, তার ফলাফল পরবর্তী সময়ে এ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমরা ভালোমতোই প্রত্যক্ষ করেছি। আশা করি, বর্তমান শাসক এবং তাদের নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞরা নিকোলাস বার্নসের সাম্প্রতিক বক্তব্যকেও যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন। নইলে চারদলীয় জোট সরকারের মতোই পরে পস্তাতে হতে পারে।

১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে এক-এগারো অবধি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাতবার অতীব সুদূরপ্রসারী পটপরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের ক্রম অনুযায়ী এগুলো হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত পন্থায় সরকার পরিবর্তন, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড, ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদের পতন এবং অতি সাম্প্রতিক ২০০৭ সালের ১/১১-এর তথাকথিত রাজনৈতিক ভূমিকম্প। আমার সীমিত জ্ঞান ও সাধ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত প্রথম ছয়টি পটপরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের দীর্ঘ ৩৬ বছরের শিক্ষা থেকে এখনকার জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় এবং এক-এগারো পরবর্তী বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিয়ে এখন বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দুই.

২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের পরিসংখ্যানের ধারা থেকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের দেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী এবং বাঙালি ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন, এ দুই যুধ্যমান রাজনৈতিক ধারার মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারাটি জনসমর্থনের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী। কারচুপিবিহীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনগুলোয় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এ ধারাটিকে বারংবার বিভাজিত করতে না পারলে, প্রতিটি নির্বাচনেই শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত দর্শন সংবলিত রাজনৈতিক দল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটের ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতর থাকে। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রকার কূটকৌশলের মাধ্যমে বর্ণিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভোট বিভাজনের কৌশলটি ব্যবহারের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জনমানুষ ইতোমধ্যেই বহুবার দেখে ফেলেছে। এখন প্রশ্ন হলো এক-এগারোর পরিবর্তন রাজনীতিতে এই দ্বি-ধারা বহির্ভূত নতুন কোনো সম্ভাবনা পুনর্বার সৃষ্টি করেছে কি না। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন অনুষ্ঠিত হলো না, কোন পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার জরুরি অবস্থা জারি করতে অনেকাংশে বাধ্য হলো এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে এবং আমার দুই কিস্তির বর্তমান লেখাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক-এগারোর পরিবর্তনের কোনোরূপ ব্যাখ্যা প্রদান নয়। এক-এগারো ঘটে গেছে এবং ঘড়ির কাঁটা আর পেছন দিকে ঘোরানো যাবে না– এটাই আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা। এক-এগারোর বাংলাদেশের পরবর্তী আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ, এ দেশের ১৫ কোটি স্বল্পে তুষ্ট অথচ কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এবং দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করার একটি সুবর্ণ সুযোগ এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করার বাস্তবভিত্তিক বিপদ একাধারে সৃষ্টি করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সোল এজেন্সির দাবিদার আওয়ামী লীগ কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি অসাংবিধানিক ও সামরিক অভ্যুত্থানকে সর্বদাই সমর্থন জুগিয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল' তাদেরই সৃষ্ট ছিল। ১৯৭৫ সালের অবশ্যম্ভাবী রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের একাংশ শুধু যে জড়িত ছিল তা-ই নয়, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারাই তখন ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ১৯৮২ সালের এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে আওয়ামী দলীয় মুখপত্র 'বাংলার বাণী' রীতিমতো সম্পাদকীয় পর্যন্ত ছেপেছিল। এ প্রসঙ্গে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার তখনকার বিখ্যাত মন্তব্য ছিল, 'I am not unhappy.' আর এবারের এক-এগারো সম্পর্কে শেখ হাসিনা গর্বের সাথে মাত্র ক'দিন আগ পর্যন্ত অবিরামভাবে দাবি করে গেছেন, এ সরকার তাদেরই আন্দোলনের ফসল। অবশ্য বিভিন্ন কারণে বর্তমানে তার আনন্দ-উল্লাসে কিছুটা ভাটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের অব্যাহত চরম ফ্যাসিবাদী চরিত্রের সম্ভবত আর কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমার বিভিন্ন লেখা পড়ে অনেকে অভিযোগ করেছেন, আমি নাকি দলীয় চশমা চোখে লাগিয়ে বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি, আর তাই সামরিক বাহিনী সমর্থিত এ সরকারটির প্রচুর ভালো কাজের প্রাপ্য প্রশংসা প্রদানে কার্পণ্য করছি। সন্দেহ নেই, জরুরি আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় আমার মতো এক ছাপোষা, দুর্বল মানুষের বিরুদ্ধে এ এক গুরুতর অভিযোগ। কথিত অভিযোগটি অভিযানে পরিণত হওয়ার আগেই

www.pathagar.com

শাসকদের তুষ্ট করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে বর্তমান লেখায় তাই এক-এগারোর পরিবর্তনের ফলে যে ইতিবাচক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে সে বর্ণনাও দিতে চাই। অবশ্য সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় বাংলাদেশের সব বিশাল বিশাল টেলিভিশন ব্যক্তিত্বদের(!) তোষামুদির যে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে আমার মতো রসকষহীন মানুষের স্থান সর্বপশ্চাতে হওয়ারই সম্ভাবনা সমধিক। সেদিন টেলিভিশনের এক 'টক শো'তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরিচয়ধারী এক অধুনা জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্বকে এ পর্যন্ত বলতে শুনলাম যে, তিনি নাকি বর্তমান শাসকদের অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত চেহারা দেখে যারপরনাই মনোবেদনায় ভুগছেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক তখনই ভেজা তোয়ালে নিয়ে উপদেষ্টাদের ঘামে ভেজা মুখ মুছিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পূরণের জন্য অনুষ্ঠান ছেড়েই দৌড় লাগাননি। চাটুকারিতার জন্য এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে অনেক রসালো গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু, অধ্যাপক সাহেব সেদিন রাজনীতিবিদদেরও নিশ্চয়ই লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।

এবার মূল প্রসঙ্গ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্যে বিশ্বাস করতে হলে এ উপসংহারে নিঃসন্দেহ উপনীত হওয়া যাবে যে, আমাদের রাজনীতিবিদরা বিত্ত-বৈভবের প্রতি তাদের উদগ্র, অশ্লীল ও সীমাহীন লোভ, সন্ত্রাস ও অরাজকতার প্রতি তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রতি তাদের নিদারুণ ঔদাসীন্যের মাধ্যমে রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মহান দায়িত্বকে খেলো করেছেন এবং রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে ছেড়েছেন। এক-এগারোর কুশীলবরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ ঘৃণ্য ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের লুকানো, অন্ধকার দিকগুলো দেশের মানুষের সামনে একেবারে উদাম করে দিয়েছেন। ফলে রাজনীতিবিদ নামধারী এ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আমাদের অনেক নাম না জানা শহীদের এবং তাদের পরিবারের মহান আত্মত্যাগের ফসল এ বাংলাদেশকে রাহুমুক্ত করার আরেকটি বিশাল সুযোগ আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। মাসখানেক ধরে অন্তত দেখা যাচ্ছে যে, সরকার রাজনীতিবিদদের মুখোশ উন্মোচনের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই যথাসম্ভব পক্ষপাতিত্বশূন্য এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন। দলীয় চিন্তা-চেতনায় কলুষিত নয় এমন প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এ জন্য শাসকরা অবশ্যই পেতে পারেন। কিন্তু যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের দেশের স্বার্থেই অনুভব করতে হবে তা হলো রাজনীতিবিদ নামধারী একশ্রেণীর দুর্বৃত্তের অপকর্মের কারণে দেশটিকেই একেবারে রাজনীতিশূন্য করে এটিকে বিদেশী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর খেলার মাঠে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। আমার স্মরণে আছে আজ থেকে প্রায় তিন-চার মাস আগেই অগ্রজ নিবন্ধকার ফরহাদ মজহার রাজনীতিশূন্যতার এ বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে অত্যন্ত প্রাজ্ঞতার সাথে সাবধান করেছিলেন।

জনগণকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে যে, অধুনা বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি শক্তির একচ্ছত্র অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সুযোগ সন্ধানীরা এমন ধারার রাজনীতিশূন্য পরিস্থিতির অপেক্ষাতেই থাকে। বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের বিবেচনায় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খোদা প্রদত্ত এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

রাষ্ট্র। ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরাশক্তি এবং তাদের এদেশীয় তাঁবেদারদের আচরণ এক-এগারোর পূর্বে এবং পরে কখনই স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়নি। আমরা যদি এমন বোকার স্বর্গে বাস করি যে, বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে দুর্নীতিমুক্ত করে জনগণের কাছে সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহিতামূলক একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার মহান ব্রতের লক্ষ্য নিয়েই বিদেশী মুরব্বিরা এক-এগারোর পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন, তাহলে ভবিষ্যতে জাতিকে ভয়ানক মাশুল দিতে হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি এতই মহৎ চরিত্রের অধিকারী হতো তাহলে অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে ইরাক যুদ্ধের অন্যতম রূপকার বিশ্বব্যাংক প্রধানকে পদত্যাগ করতে হতো না, ইরাকে তেল কেলেংকারির জন্য ভারতীয় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংয়ের চাকরিচ্যুতি ঘটত না, ঘুষ কেলেংকারির দায়ে জাতিসঙ্ঘে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মকর্তা সঞ্জয় বহলকে মার্কিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করত না, জাপানের একজন মন্ত্রীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হতো না অথবা বাংলাদেশে আজকে একজন অতি নিন্দিত, দুর্নীতিপরায়ণ ও কথিত ষড়যন্ত্রকারী সাবেক প্রতিমন্ত্রীর নৈশভোজে ঢাকাস্থ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রদূতরা মিছিল করে অংশগ্রহণ করে ওই অনুষ্ঠানে সে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসার ফুলঝুড়ি বর্ষণ করতেন না। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বর্তমানের অতি বিব্রতকর চেহারাটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এবং তার সুহৃদরা তার বহুবিধ ভ্রান্তির জন্য সমবেদনাও প্রকাশ করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে ভদ্রমহিলাকে অতিশয় সারল্যের জন্য না জানি কত রকম কৈফিয়ত প্রদান করতে হবে? বর্তমান অবস্থার সুযোগে বাংলাদেশের মাটি-মানুষের সাথে সম্পর্কবিহীন, এমনকি কোনো সঠিক ঠিকানাবিহীন, একশ্রেণীর মতলববাজ গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর নানা চক্রান্ত এখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসনের সব আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও কৌশল খ্রিস্টিয় মৌলবাদের ওপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হচ্ছে। বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধিতে সহায়তা করার জন্য বিখ্যাত মার্কিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক কেভিন ফিলিপস'র বহুল আলোচিত গ্রন্থ American Theocracy থেকে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে বলেই ধারণা করছি।

১। "He (Kevin Philips) then turns to the surge of fundamentalist and evangelical religion in the United States, outlining the way a long tradition of radical and sectarian religion has taken an unprecedented political role under George W. Bush, as more and more Republicans think is apocalyptic terms and seek to shape domestic and foreign policy around religion"

(কেভিন ফিলিপস তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবাদ ও খ্রিস্টিয় ভগবদ সমন্বিত ধর্মের উত্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। জর্জ বুশের শাসনামলে আদিম ও সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্ম পদ্ধতি সে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ করেছে। রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এখন অধিকহারে বাইবেলের ইঙ্গিতপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে অভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে উদ্যত হয়েছে।)

২। "Over three decades of Bush presidencies, Vice Presidencies and CIA directorship, the Republic Party has slowly become the vehicle of all three

www.pathagar.com

interests- a fusion of petroleum defined national security, a crusading, simplistic Christianity; and a reckless credit-feeding financial complex" (বিগত তিন দশকে বুশ পরিবার কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, উপ-রাষ্ট্রপ্রধান এবং সিআইএ পরিচালকের অফিস অধিকারকালীন সময়ে বিপাবলিকান দল তিনটি বিশেষ স্বার্থের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তিনটি স্বার্থ হলো– জ্বালানি নির্ধারিত জাতীয় নিরাপত্তা, মধ্যযুগীয় ক্রুসেডভিত্তিক অতি সরলীকৃত সাম্প্রদায়িক খ্রিষ্ট্রীয়বাদ এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ঋণ প্রবাহভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক জটিল ব্যবস্থা।)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের মৌলিক মানসিকতা অনুধাবন ছাড়া আমরা বাংলাদেশকে রক্ষা করার কৌশল যে নির্ধারণ করতে পারব না, এটি বর্তমান শাসকরা বুঝতে ব্যর্থ হলে জাতি হিসেবে আমাদের চরম মূল্য দিতে হতে পারে। আশার কথা হচ্ছে, জনশ্রুতি ও সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী স্বাধীনতার রক্ষাকবচ আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ চিন্তাশীল অংশ এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। বোদ্ধা পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন খনিজ ও বনজ সম্পদ দখল করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব বলতে গেলে এক সময় প্রতি মাসেই ওই মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ক্যু দ্যেতার মাধ্যমে যেকোনো স্বাধীনতাকামী সরকারের পতন ঘটাত। সরকার পতনের এই অনৈতিক কার্যকলাপে স্থানীয় সৈন্যদের সাথে সাধারণত বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যরাও (Mercenery) অর্থের বিনিময়ে অংশগ্রহণ করত। আফ্রিকা মহাদেশে সরকার পরিবর্তনের এই ঘৃণ্য খেলা নিয়ে আমার একজন প্রিয় ঔপন্যাসিক ফ্রেডরিক ফোরসাইথ (Frederick Forsyth) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Dogs of War"-এ ইতিহাসের অন্যতম মহোত্তম লেখক শেক্সপিয়রের অবিস্মরণীয় একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন, "Cry Havoc, and let slip the dogs of war"

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও বীরত্বের কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আমার এমনই শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে, তারা নিশ্চয়ই কোনো একদিন জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের মুখের ওপর বুক চিতিয়ে অবশ্যই বলবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গর্বিত সেনারা শেক্সপিয়র বর্ণিত মোটেই ভাড়াটে সৈন্য নয় এবং তারা একটি স্বাধীন দেশের রক্ষাকবচ যাদের ঈমান শুধু সামান্য কয়েকটি ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না।

এমতাবস্থায় আমাদের এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করতে হবে যা দেশ, জনগণ, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং এক- এগারোর বাস্তবায়নকারীদের একাধারে স্বার্থরক্ষা করবে। সব পক্ষকে সন্তুষ্ট করার এ মহৎ ইচ্ছাটি লিখে ফেলা যতটা সহজ কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নটি ততখানিই জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। বিপদটি আসে সাধারণত বহিঃশত্রু থেকে, কারণ যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে বাংলাদেশের সার্বিক স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত হবে সে প্রক্রিয়াটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিদেশী শক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে যাবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা থাকে দেশে একটি অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিবেশ দীর্ঘায়িত করা। কখনো কখনো তাদের প্রচেষ্টা সফল হয় আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীর গণপ্রতিরোধের মুখে এরা পরাজিত হয়। পশ্চিমা গোষ্ঠীর এ জাতীয় চক্রান্ত সফল হওয়ার প্রচুর উদাহরণ

www.pathagar.com

রয়েছে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোয়। আর ব্যর্থতার উদাহরণ ইদানীংকার ভেনিজুয়েলা অথবা বলিভিয়ায়। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এখন যারা বাংলাদেশ চালাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের দৃশ্যপট থেকে প্রস্থানের সব পদ্ধতিগুলো বিবেচনায় না নিলে আমরা কোনো বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। ইতঃপূর্বে এ বিষয় নিয়ে একটি মাত্র খণ্ডিত নিবন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আজকের লেখায় সাহস করে আর একটু গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করব।

বর্তমান সময়ে পত্রপত্রিকায় বহুল আলোচিত তথাকথিত কিংস পার্টি গঠন নিয়েই আমরা বিতর্ক শুরু করতে পারি। এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অতি জনপ্রিয় হাস্যরসাত্মক 'দুইখান প্রশ্ন' মনে পড়ে যায়। দুইখান প্রশ্নের মতোই কিংস পার্টি গঠনও দুইখান পদ্ধতিতে শুরু করা যায়। প্রথমখান হলো মার্কিন বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মিস বিউটেনিস এবং এক-এগারোর কর্মকাণ্ডে তার সহযোগী এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কর্মরত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর বিশেষ স্নেহ ও অর্থধন্য সুশীল(?) সমাজ নেতৃত্বাধীন কিংস পার্টি। এই শ্রেণীর নেতাগুলোর মধ্যে প্রচুর ভণ্ডামিপূর্ণ প্রতিযোগিতা শেষে দেশবাসীর কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অধুনা অতি বিনয়ী, জন্মদিনপ্রিয় এবং করজোড় ড. কামাল হোসেন নেতৃত্বের (এখনো বায়বীয়) দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই ভদ্রলোককে কখনো নিজেদের মানুষ হিসেবে গ্রহণ না করতে পারলেও ইহুদিবাদ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা বিশ্বের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এক অতি প্রিয়জন। আমার এই অভিমতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমেরিকান ও ব্রিটিশ দূতাবাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছরের আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় ড. কামাল হোসেন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কতবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এটি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে তদন্ত করার আবেদন জানাচ্ছি। ওই দু'টি অতি সুরক্ষিত স্থানে সুশীল (?) সমাজের আর যে ক'জন প্রায় চিরস্থায়ী আসবাবের রূপ পরিগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ শিরোমণি রাশিয়ান ডক্টরেট ঝঁংঢ়বহফবৎ ইৎধপব শোভিত দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্পাদকদের সম্পাদক দাবিদার এবং সার্বক্ষণিকভাবে একটি মেকি হাসিতে উজ্জ্বল মাহফুজ আনাম, স্বদেশে তাকে পাওয়াসাপেক্ষে (কদাচিৎ) একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস ও বাংলাদেশ থেকে সম্ভবত পরবর্তী নোবেল প্রত্যাশী, আফগানিস্তানে বিশেষ মিশনে বর্তমানে যথেষ্ট সক্রিয় ফজলে হাসান আবেদ। কৌতুকের বিষয় হলো সম্প্রতি যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদের চাপে আওয়ামী লীগের আবদুল জলিল সাহেব সুশীল(?) সমাজের আর এক মহীরুহর, আপাত সৌম্য মুখোশটি এক ঝটকায় খুলে ফেলে তাকে প্রায় উলঙ্গ করে ছেড়েছেন। পত্রিকার পাতায় এসেছে একাধারে সফল ও সাধু ব্যবসায়ী এবং প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবী মঞ্জুর এলাহী নাকি তিন কোটি মতান্তরে পাঁচ কোটি টাকা উৎকোচের বিনিময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে তার বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্সটি বাগিয়ে নিয়েছিলেন। এ অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ মি. এলাহীর কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সংবাদমাধ্যমে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় অভিযোগটির সত্যতা আমাদের কষ্ট হলেও বিশ্বাস করতেই হচ্ছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, বছর দেড়েক আগে উপরোল্লিখিত মঞ্জুর এলাহী এবং তার সিপিডি'র বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের খবর

www.pathagar.com

অনুযায়ী এ লেখককে সম্পূর্ণ মিথ্যাচারের ভিত্তিতে 'রাজাকার' বলে গালি দেয়ার কারণে আদালতে একটি মানহানির মামলা করেছিলাম। প্রসঙ্গত, 'রাজাকারকে' আমি এখনো বাংলাদেশে একটি অপমানজনক গালি হিসেবেই বিবেচনা করে থাকি। সুশীল(?) সমাজের বিশাল ও বিষাক্ত ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়ার প্রতিফলে প্রকৃত অর্থেই আমি কী পরিমাণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম তাও নিশ্চয়ই সচেতন পাঠকবৃন্দ বিস্মৃত হননি। তৎকালীন সরকার আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি, আমার পেশাজীবী বন্ধুরা পিঠ বাঁচানোর তাগিদে প্রধানত নিশ্চুপ ছিলেন। সুশীল(?) সমাজের মুখপত্র এবং অতিচেনা পত্রিকাগুলো নিত্যদিন আমার চরিত্র হননের মিথ্যা ও অরুচিকর প্রচেষ্টা ক্লান্তিহীনভাবে চালিয়ে গেছে। এমনকি আমার নির্দোষ পরিবারের সদস্যরা যারা অন্তরালে থাকতেই সর্বদা পছন্দ করেন তারাও তথাকথিত শিক্ষিতজনদের সে কুৎসিত ও অপমানজনক আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। বাংলাদেশ টিআইবি'র প্রধান এবং আমার সাবেক শিক্ষক ড. মোজাফফর আহমেদসহ অনেক সুশীল(?) ব্যক্তিত্বই পত্রিকার পাতায় নিত্যদিন আমার বিরুদ্ধে বিষোদগারের প্রতিযোগিতায় রত হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল যেন কোনো এক ম্লেচ্ছ অথবা দলিত ব্রাত্যজন জ্ঞাতসারে কোনো শুদ্ধ(?) পবিত্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করার মতো অপরাধ করে ফেলেছিলাম। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদে প্রায় বিশ্ববিখ্যাত আমার সম্মানিত শিক্ষক সে ড. মোজাফফরের প্রতি এখন আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, আপনি আজ সুশীল(?) সমাজের এ ঘৃণ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিশ্চুপ কেন? নাকি তিন বা পাঁচ কোটি টাকা ঘুষ প্রদান করে ব্যাংকের মালিক বনে যাওয়া টিআইবি'র বিবেচনায় দুর্নীতির সংজ্ঞায় পড়ে না। একজন অতি কমমেধাসম্পন্ন ছাত্রের অধিকারেই একটি উপদেশ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি যে, বিদেশী আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের 'তখতে তাউস' ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে একই রকম তীব্র ঘৃণার সাথে রাজাকার ও সুশীল(?) সমাজ এ শব্দ দু'টি সমস্বরে উচ্চারিত হবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের নিশ্চিত ধ্বংসের বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরিফের সূরা আল-আরাফের ৯৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।"

আমাদের দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা এখন নিত্যদিন মহান আল্লাহ তায়ালার উপরিউক্ত কঠোর ঘোষণার প্রমাণ পাচ্ছেন। এবার আপনাদের পালা। সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ড. দেবপ্রিয়কে তার প্রাথমিক নমুনা এক সাহসী, তরুণ সাংবাদিক সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন। তরুণ সাংবাদিক, আপনি আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ তায়ালার অপার করুণাধারায় এ দেশের ধর্মপ্রাণ, আপামর জনসাধারণ সর্বদাই সিক্ত হয়েছেন, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও হবেন। কাজেই বর্তমান নীতিনির্ধারকদের প্রতি আমার আবেদন বিদেশী ঘোড়সওয়ার পরিচালিত কোনো শকটে আরোহণ না করলেই আপনারা নিজেদের এবং বাংলাদেশের জন্য মঙ্গল করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গঠিত আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী শত প্রলোভন উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে জনতার পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করবেন, এ বিশ্বাস এখনো আমাদের দেশবাসীর মাঝে অটল রয়েছে।

www.pathagar.com

বিশেষ সমাজ তো বিতাড়িত হলো। এখন বিকল্প রাজনীতির অন্বেষণটা কোনখান থেকে শুরু করব? পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলি থেকে অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত, চারিত্রিকভাবে পচে যাওয়া শীর্ষ ও নীতিনির্ধারককারী রাজনীতিবিদদের সংখ্যা ১০০-এর কোটা হয়তো অতিক্রম করবে না। এটি আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত অত্যন্ত আশার কথা। ১৫ কোটি বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি উদীয়মান রাষ্ট্রের মাত্র ১০০ জন দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদকে আইনের স্বচ্ছ প্রয়োগের মাধ্যমেই দণ্ড প্রদান করে একটি নতুন রাজনীতির উন্মেষ ঘটানো অবশ্যই সম্ভবপর হবে। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে, আবার একটি সুবিধাবাদী, সমশ্রেণীভুক্ত দুর্নীতিবাজ, জনগণ কর্তৃক বারংবার প্রত্যাখ্যাত এবং অনেক ক্ষেত্রেই নামগোত্রহীন, জোকার রাজনীতিবিদদের সরকারি আনুকূল্যে নতুন করে সংগঠিত করে তথাকথিত তৃতীয় শক্তির উত্থান জনগণ বা রাষ্ট্রের কোনো উপকারে আসবে। বরং এদেরও আইনের কঠিন ও পক্ষপাতহীন নিগড়ে আবদ্ধ করতে পারলেই বাংলাদেশের জন্য একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত একটি সুস্থ রাজনীতির আত্মপ্রকাশের সুযোগ উন্মোচিত হবে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে আদর্শগতভাবে যে দ্বিধারার রাজনীতি আমাদের দেশে দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে বহমান রয়েছে সে আদর্শ অথবা আদর্শ লালনকারী নিশ্চিহ্ন করার কোনো প্রয়োজন দেখি না।

বর্তমান শাসকরা হয়তো কোনো কোনো উপদেষ্টাদের বুদ্ধিপ্রসূত এ জাতীয় অবিমৃশ্যকারী কৌশল গ্রহণ করেছেন এবং এতে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা শতকরা এক শ' ভাগ। সরকার বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও যথোপযুক্ত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে ইতোমধ্যেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এখন মাইনাস টু-এর অপরিপক্ব চিন্তা পরিত্যাগ করে সরাসরি আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পক্ষপাতহীনভাবে মাইনাস শ'খানেক শীর্ষ দুর্নীতিবাজ শায়েস্তাকরণ রাজনৈতিক কৌশলে প্রত্যাবর্তন করাই বোধহয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চাকে যদি অত্যাবশ্যকীয় করা যায়, তাহলে দলগুলোয় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরাই তাদের পছন্দসই দেশপ্রেমিক ও সৎ নেতৃত্ব নির্বাচন করার মতো বিচক্ষণতা প্রদর্শনে সক্ষম। বাংলাদেশের জনগণ যে জাতির প্রয়োজনে সর্বদাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমরা বহুবার পেয়েছি। আর এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের রাজনীতি কালিমামুক্ত ও পরিশীলিত হবে। সরকার ঘোষিত ১৮ মাসের সময়সীমার মধ্যে শাসকরা আন্তরিকতার সাথে এই কাজটুকু সম্পন্ন করে যেতে সক্ষম হলে তৎপরবর্তী নির্বাচনে যারা সংসদ সদস্যের মহৎ দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তারা নিজ স্বার্থেই সামরিক বাহিনী সমর্থিত বর্তমান সরকারের দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে গৃহীত সব কার্যক্রমকে যথাযথ আইনানুগ বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে সাংবিধানিক জটিলতা থেকে মুক্ত করবেন– এই বিশ্বাস আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না। সরকার বৈধতা নামক মরীচিকার পেছনে যতই আকুল হয়ে দৌড়াতে থাকবেন ততই দুর্নীতিপরায়ণ, সুবিধাবাদীরা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে এবং শাসকদের সব সৎ প্রচেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, 'শাইলক' (Shylock) তার স্বার্থের অংশটি (Pound of Flesh) কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করতে কখনই পিছপা হয়

www.pathagar.com

না। কে নেতা হবেন সে বিষয় নিয়ে সরকারের ব্যাকুলতার কোনো প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের কোনো এক শাইলককে খুঁজে বের করার এমনকি ঠেকা এ সরকারের ওপর পড়ল সেটি বুঝতে পারি না। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, মধ্যম মাপ ও মেধার এক নেতা শেখ মুজিবকে এ দেশের জনগণই বঙ্গবন্ধুর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র এ চার দিনের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনায়ক এবং সততার প্রতীক জিয়াউর রহমানের অবিস্মরণীয় উন্মেষ ঘটেছিল, ১৯৮৬ সালের এরশাদের পাতানো নির্বাচন বর্জনের সাহসী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিতান্ত সাধারণ, স্বল্প শিক্ষিত এক গৃহবধূ থেকে আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম হয়েছিল। আমাদের রাষ্ট্রের অহংকারের এ ইতিহাসগুলো কেন আমরা বিস্মৃত হব? শাসকদের কাছে বিনীত নিবেদন, জরুরি অবস্থার পিঞ্জর তুলে নিন, জনগণের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিন, ইনশাআল্লাহ আকৃতিতে ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশীরাই পুনর্বার হয়তো এখন পর্যন্ত অজানা কোনো এক প্রতিভাবান, সৎ নেতা অবশ্যই জাতিকে উপহার দেবে যিনি একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত একটি শোষণমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় যথাযথ নেতৃত্ব দেবেন। সে আদিম সময় থেকে ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে এসেছে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বিষবৃক্ষের জন্ম দেয়, আর দেশপ্রেমিক জনগণের সাহসী রাজনীতি দেশকে উন্নয়নের চাবিকাঠি প্রদান করে। আসুন না জনগণের সে সাহস, দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতাকে প্রাপ্য সম্মান দিয়েই ইতিহাসের শিক্ষাকে আরো একটিবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কার দেশের স্বার্থেই আমাদেরও কাম্য। তবে সে সংস্কার কোনো পরজীবী বিশেষ সমাজের স্বার্থপ্রণোদিত উসকানিতে বাংলাদেশের আধুনিক ভাইসরয় ম্যাডাম বিউটেনিসের নির্দেশে বাস্তবায়িত হোক, এটি নিশ্চয়ই কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিক চাইতে পারেন না।

১২.০৬.০৭ এবং ২০.০৬.০৭

www.pathagar.com

বাজেটের বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা

এ বছরের বাজেট সংক্রান্ত আমার লেখাটি যখন 'নয়া দিগন্তের' পাতায় প্রকাশিত হয় তখন বিষয়টিকে অধিকাংশ পাঠকের কাছে যে একেবারেই একটি নীরস এবং বাসি বিষয় বলে মনে হয়েছিল তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। লেখার এ বিলম্ব সম্পূর্ণভাবেই আমার ইচ্ছাকৃত। নিয়মমাফিক প্রতি বছর এ বিষয়টি নিয়ে কমপক্ষে মাসখানেক ধরে তাবৎ বিজ্ঞজনের অসংখ্য বিশ্লেষণ এবং উপদেশমূলক রচনা পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়। এত জ্ঞানী লোকের ভিড়ে আমার মতো নব্য আঁতেলের পাঠকের কাছে কলকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কারণেই ভাবলাম বিলম্ব করেই বরং পয়লা বছরে আমি কাতারের শেষেই অবস্থান নেই।

গত চারদলীয় জোট সরকারের শাসনকালীন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের প্রদত্ত প্রায় প্রতিটি বাজেটকেই পশ্চিমা গোষ্ঠীর অন্ধ সমর্থনপুষ্ট তথাকথিত জ্ঞানের সরোবর (থিংক ট্যাংক) অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সিপিডি তাদের বার্ষিক বিশ্লেষণে উচ্চাভিলাষী বলেই নিয়মিতভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করত। যতদূর মনে পড়ে তাদের অতিকথনপ্রিয়, অতিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় জোট সরকারের বাজেট সমালোচনা উপলক্ষে অন্তত দু'বার দু'টি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। একবার বলেছিলেন, জনাব সাইফুর রহমান অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে চওড়া গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছেন। আর দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, খানা-খন্দকপূর্ণ রাস্তা দিয়ে জনাব সাইফুর রহমান দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছেন। এ ধরনের মন্তব্য অর্থনীতির কোনো তত্ত্ব অথবা আমাদের সমাজের প্রত্যাশিত ভব্যতার মধ্যে পড়ে কি না সে বিচার বিজ্ঞ পাঠকরাই করবেন। তবে দেবপ্রিয় বাবুর বাকচাতুর্যের খ্যাতি যে সর্বত্রই রয়েছে সেটি সংবাদ মাধ্যমে তার সার্বক্ষণিক উপস্থিতিই প্রমাণ করে। সে রাশিয়ান ডক্টরেট দেবপ্রিয় এবার কিন্তু জরুরি সরকারের বাজেটের প্রশংসা করেই বলেছেন, এ বাজেটে সংস্কার প্রস্তাবের বেশ কিছু প্রতিফলন ঘটেছে এবং বাজেট বক্তৃতার মধ্যে এক ধরনের সজীবতা আছে। বলাই বাহুল্য, ভাষার এরূপ কোনো সজীবতা ড. দেবপ্রিয় জনাব সাইফুর রহমানের বক্তৃতার মধ্যে কোনোদিনই খুঁজে পাননি।

২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ এ তিন অর্থবছরে দেশের রাজস্ব আয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৫৪০০ ও ১৯০০০ কোটি, ৩৯২০০ ও ২০৫০০ কোটি এবং ৪৫৭২২ ও ২৪৫০০ কোটি টাকা। এ হিসাবে আলোচ্য তিন বছরে গড়ে রাজস্ব আয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৩.৬ এবং ১৩.৭ শতাংশ। ওই তিন বছরে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আমরা মোটামুটি অর্জন করতে সক্ষম হলেও আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং বিদেশী অর্থের ছাড়করণের নানাবিধ বিলম্বহেতু উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বরাবরই আমরা পিছিয়ে

www.pathagar.com

থাকতাম। জনাব সাইফুর রহমানের বাজেট বক্তৃতা আমি সর্বদাই উপভোগ করেছি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ, স্বভাবজাত রসিকতার মিশ্রণ এবং বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের সরল প্রকাশভংগির কারণে। ড. দেবপ্রিয় জনাব সাইফুর রহমানের প্রতি প্রশংসাবাক্য বর্ষণে কার্পণ্য প্রদর্শন করলেও এবার বাজেটের মধ্যে যে প্রচুর ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছেন এজন্য তাকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বরাবর নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী ভদ্রলোক যে মাতৃভূমি সম্পর্কে ইতিবাচক দিক শেষ পর্যন্ত কিছুটা হলেও খুঁজে পাচ্ছেন এটি বর্তমান সরকারের পরম সৌভাগ্য এবং আমাদের মতো আমজনতার জন্য অতি আনন্দের বার্তা। কিছু দিন আগে এটিএন চ্যানেলে এক 'টক শো'তে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী এ ব্যক্তিটি বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের অতি উচ্চমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য কত সহজেই না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার ভোগ্যপণ্যের অধিকতর চাহিদা এবং তৎসম্পর্কিত মূল্য বৃদ্ধির যুক্তি কী চমৎকারভাবে উপস্থাপন করছিলেন। জোট সরকারের সময়ে অবশ্য দ্রব্যমূল্যবিষয়ক তার বিশ্লেষণে অর্থনীতি বিষয়ক যুক্তির পরিবর্তে হাওয়া ভবন নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ডিকেটের বিবিধ কারসাজির বিষয়াদি অধিকতর প্রাধান্য পেত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বন্দুকের নলই যে সব ক্ষমতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেরও উৎস এ নব্য তত্ত্বটি সব সংবাদ মাধ্যমের অতিপ্রিয় চৌকস ব্যক্তিটি এবার প্রমাণ করেছেন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয় এবং বার্ষিক উন্নয়নমূলক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫২৯০০ কোটি এবং ২৮৫২২ কোটি টাকা। আগের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রাটি উচ্চাভিলাষী হওয়ার কারণে বছরান্তে অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত বাজেট আলোচনান্তে এবার আমরা একটু বিবেচনার চেষ্টা করি যে বাজেটের সাংবাৎসরিক অনুশীলনটি বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষের জন্য কী ধরনের অর্থ বহন করে? সে তো প্রবৃদ্ধি বোঝে না, পরিসংখ্যান বোঝে না কিংবা বিশেষজ্ঞ আর রাজনীতিবিদদের কূটতর্ক বোঝে না। তবে দীর্ঘদিন বাদে এবারের বাজেট আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পর্যবেক্ষণে একটি কৌতুককর ব্যতিক্রম নিয়ে এসেছে। সংসদে বাজেট বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই এবার আর ঢাকার রাজপথে 'গরিব মারার বাজেট মানি না' কিংবা 'যুগান্তকারী বাজেট পরিবেশেনের জন্য মোবারকবাদ' এ জাতীয় স্লোগান শোভিত ব্যানারের শোভাযাত্রা দেখতে পাইনি। কমার্শিয়াল আর্টের দরিদ্র শিল্পীদের বার্ষিক যৎসামান্য আয়ের সুযোগ নষ্ট হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আমার অকৃত্রিম সহানুভূতি রইল। বাজেট সংক্রান্ত লঘু আলোচনান্তে এবার গুরুগম্ভীর আলোচনার পালা। অবশ্যই এ ধরনের গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনার যোগ্যতা আমার যে যৎসামান্য এটি মেনে নিতে আমি কোনোরকম হীনম্মন্যতা বোধ করি না। তবে বিষয়টি হলো যে, প্রায় ৩০ বছরের সরকারি ও বেসরকারি কর্মজীবনে অর্থনীতির তত্ত্ব না বুঝলেও তার প্রায়োগিক দিক নিয়ে প্রতিনিয়তই কাজ করতে হয়েছে। এ ভরসায়ই অবসর পেলে নানা বিষয়ে কালি-কাগজ খরচ করি আর 'নয়া দিগন্তের' সম্পাদকমণ্ডলী সম্ভবত এর চেয়ে শ্রেয়তর লেখকের সন্ধান এখন পর্যন্ত না পেয়েই লেখাগুলো নিয়মিত ছেপে আমার পরিশ্রমকে পন্ডশ্রমে পরিণত হতে দিচ্ছে না। দেখা যাক, পাঠক কতদিন তাদের অপরিসীম ধৈর্য প্রদান করে আমাকে ধন্য করেন।

www.pathagar.com

২০০৭-০৮ সালের বাজেট পর্যালোচনার আগে আমাদের ২০০৫-০৬ সালের বাংলাদেশের অর্থনীতির দৃশ্যপট একটু ঝালাই করে নেয়া প্রয়োজন। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরটি আমি মোটামুটিভাবে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করছি। এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকার ২০০৬-০৭ অর্থবছরের মাত্র ৪ মাসেরও কম সময় ক্ষমতায় আসীন ছিল; দ্বিতীয়ত, অক্টোবর থেকে জানুয়ারি দীর্ঘ তিন মাস একশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের কল্যাণে দেশ অবরোধ, হরতাল, হত্যা, লুটতরাজ সংবলিত একটি সম্পূর্ণ অরাজক এবং অর্থনীতি বিনাশী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে; তৃতীয়ত, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দেশে প্রকৃতপক্ষে অর্থবোধক এবং কার্যকর সরকারের অস্তিত্বই ছিল না আর চতুর্থত, এক-এগারো পরবর্তী সময় থেকে পাঁচটি মাস অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একটি সঠিক, বাস্তবসম্মত, দীর্ঘমেয়াদি এবং বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নমুখী কোনো অর্থনৈতিক দর্শনের রূপরেখা তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বারো মাসের একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো নেতিবাচক ঘটনা সংঘটিত হলে সে বছরের অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনা বা বিশ্লেষণ বহুলাংশে নিরর্থক এবং সময়ের অপচয় বলেই আমি বিবেচনা করি। তবে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের অর্জন, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটের কোনো অর্থবহ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছর সংক্রান্ত এ বিশ্লেষণে দলীয় পক্ষপাতিত্বের সম্ভাব্য অভিযোগ এড়ানোর উদ্দেশ্যে আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই সম্পূর্ণভাবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ওপরই নির্ভর করেছি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ২০০৫-০৬ অর্থবছর সম্পর্কে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সামগ্রিক মূল্যায়নের চিত্রটি শুধু ভাষান্তর করে এখানে উদ্ধৃত করলাম : ২০০৬ অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল যা পূর্ববর্তী বছরে ৬ শতাংশ ছিল। এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে কৃষি উৎপাদনে আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তেজি অবস্থা এবং সেবা খাতের প্রাণবন্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ে। অবকাঠামোগত দুর্বলতা, বিশেষত নিয়মিত বিদ্যুৎ ঘাটতি নতুন বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অধিকতর সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। রক্ষণশীল আর্থিক প্রবাহ নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও অর্থ এবং ঋণ প্রবাহ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়নের ফলে মুদ্রাস্ফীতির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য স্থানীয় বাজারে হ্রাসকৃত হারে সরবরাহের কারণে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর যথেষ্ট ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের চলতি হিসাবে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে তেজি রফতানি প্রবৃদ্ধি, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী জনশক্তির প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির একটি মোটামুটি স্থিতাবস্থা বজায় থাকার কারণে। পুঁজিবাজারে সামগ্রিকভাবে বছরব্যাপী একটি নিম্নগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

(সূত্র : বাংলাদেশ ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক বিবরণী, জুন, ২০০৬, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)

আমি আগেই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীকার করে নিয়েছি, অর্থনীতি আমার বিষয় নয় এবং এ কঠিন বিষয়টির তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই।

www.pathagar.com

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মূল্যায়ন এবং তাদের উপদেশগুলো একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে খুবই সংক্ষেপে এবার কিঞ্চিৎ বোঝার চেষ্টা করছি। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প এবং সেবা এ তিনটি ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি আশাব্যঞ্জকভাবে উর্ধ্বমুখী ছিল। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো কথিত সুশাসনের অভাবের ফলে চারদিকে দুর্নীতির এত ছড়াছড়ি সত্ত্বেও ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী তো হচ্ছিলই, অধিকন্তু ২০০৬-০৭ অর্থবছরে আমরা ৭ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অর্জন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতির অধিকতর দ্রুত এবং টেকসই উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসেবে তাদের প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ সমস্যাসহ অবকাঠামোগত দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছে। তাদের এ পর্যবেক্ষণের সাথে আমি শতভাগ একমত পোষণ করি। পাঁচ বছরব্যাপী সরকারি দায়িত্ব পালনকালে দেশের বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, নেতা এবং সেমিনারজীবীর সাথে আমার নিয়মিত বিতর্কের প্রধান বিষয়ই ছিল যে এদেশের অর্থনীতি অধিকতর দ্রুতহারে অগ্রসর না হওয়ার পেছনে দুর্নীতি ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা এ দ্বিবিধ অভিশাপের মধ্যে কোনটি প্রধান। রাষ্ট্র ক্ষমতার একজন নগণ্য অংশীদার থাকার সময় আমার বিবিধ রচনা এবং বক্তব্যে অবকাঠামোগত দুর্বলতাকেই এ ব্যর্থতার জন্য আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি এবং এক-এগারোর পর দুর্নীতির জানা-অজানা, সত্য এবং মিথ্যা শত শত কাহিনী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরও আমার সে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের কৃতিত্ব অধিক রফতানি এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষকে সর্বতোভাবে প্রদানের মাধ্যমে একটি সরল সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এডিবি'র ২০০৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের মূল্যায়নে মূল্যস্ফীতির অব্যাহত চাপের যে আশংকা তাদের অর্থনীতিবিদরা ব্যক্ত করেছিলেন, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের একেবারে শেষার্ধে এসে সেটি মারাত্মক রূপ ধারণ করে সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। এ বাস্তবতাকে অপ্রকাশ্যে অনেক বর্তমান উপদেষ্টারাও সম্ভবত স্বীকার করবেন। অবশ্য অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম এবং এ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ড. দেবপ্রিয় তাদের নিজস্ব মূল্যায়নে পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমরা যে ভালো আছি গত সব সরকারের অনুসৃত অতি ব্যবহারে জীর্ণ এ জাতীয় তত্ত্ব জনগণকে গেলানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন। জুন, ২০০৬-এর তুলনায় পুঁজিবাজার যে আবার বহুলাংশে বিস্ময়করভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য আরেকটি সুসংবাদ। তবে ১৯৯৬ সালের শেয়ারের বুদবুদ বিস্ফোরিত হওয়ার দুঃসহ স্মৃতির কথা ভুলে না গেলেই সংশ্লিষ্টরা বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। এডিবি'র অর্থনীতিবিদদের অনেক বিশ্লেষণের সাথে আমি একমত পোষণ করলেও পাঁচ বছরের সরকারি দায়িত্ব পালনকালে যে বিষয়ে তাদের নীতিনির্ধারকদের সাথে এক প্রকার অব্যাহত যুদ্ধ করে গেছি তা হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এ দেশে বিবিধ প্রকার জ্বালানির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ। এডিবি এ মূল্যকে সর্বদাই অবমূল্যায়িত আখ্যায়িত করে এ নীতিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। এডিবি'র মূল্যায়নের বিপরীতে আমার বিবেচনা হচ্ছে

www.pathagar.com

বিশ্ববাজারে উৎপাদিত পণ্য রফতানির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই মূল্য সংযোজিত শিল্পগুলোয় কমমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করার বর্তমান নীতি আমাদের আরো অন্তত দশ বছর অব্যাহত রাখতে হবে। শ্রমঘন শিল্পের প্রসার না ঘটাতে পারলে বাংলাদেশের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সহস্রাব্দের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জ্বালানি তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে সরবরাহ করার নীতিকে আমাদের শিল্পের জন্য একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক উপাদান হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। এ প্রসংগে আমার মনে পড়ে গেল যে, বর্তমান সরকার যখন ডিজেল এবং কেরোসিনের মূল্য এক লাফে বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ লিটারপ্রতি সাত টাকা বৃদ্ধি করেছিল তখন আমাদের বিজ্ঞ অর্থ উপদেষ্টা দাবি করেছিলেন, জ্বালানি তেলের এ বিশাল মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। তার যুক্তিতে জ্বালানি তেলের মূল্যের অংশ মোট পরিবহন খরচের এতই ক্ষুদ্র একটি অংশ যে এর ফলে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পণ্যের সার্বিক বিক্রয় মূল্যের কোনো তারতম্য ঘটে না। আশা করি, অর্থ উপদেষ্টা তার তত্ত্বের ভ্রান্তি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সবাই আশা করছে, ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। ২০০৪ সালের মধ্যেই এলডিসি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই 'মধ্যম মানব উন্নয়ন রাষ্ট্রে' উন্নীত হতে ইতোমধ্যেই সক্ষম হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শিশু মৃত্যুর হার, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বার্ষিক অগ্রগতি লাভে নির্ধারিত সময়ের আগেই সমর্থ হয়েছে। এতসব সাফল্য সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে, আমরা এখনো এলডিসিভুক্ত একটি দরিদ্র রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও অধিক জনগণ দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অধিকন্তু বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে দেশের এ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন যেকোনো সরকারের জন্যই একটি কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। আমার বিবেচনায় বর্তমানের সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জটি আরো ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তদুপরি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের অনভিজ্ঞতা এবং অতিউৎসাহজনিত অর্থনীতির গতি ব্যাহতকারী নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে গত পনের বছরের প্রচেষ্টায় অর্জিত বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির এক প্রকার স্থিতিশীলতা ভয়ানকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকে বর্তমানে তারল্যের অনাকাঙ্ক্ষিত অত্যধিক মজুদ এক প্রকার চলমান অর্থনৈতিক মন্দার প্রমাণ দিচ্ছে যা আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণকেই সমর্থন করছে। দীর্ঘদিন পর দুঃখজনকভাবে বাজেট ঘোষণার দিন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ প্রকাশেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এসবই এক ধরনের স্থবিরতা এবং সমন্বয়হীনতার পরিচায়ক যা দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অনিশ্চয়তার আশংকা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মৌলিক চরিত্র বিশ্লেষণ ব্যতীত বাজেট নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অর্থবহ

www.pathagar.com

হবে না। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় দেশের বাজেটের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত ৪০ শতাংশ দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষের যথাসম্ভব দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন। এ ক্ষেত্রেও ২০০১ থেকে ২০০৭ সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্জন সন্তোষজনকই (বছর গড়ে ১.৮ শতাংশ) ছিল। এখন বিদগ্ধজনরা যে বিতর্কটির সূত্রপাত করবেন তা হলো এ দারিদ্র্য বিমোচনের দ্রুততর লক্ষ্য অর্জনের কৌশলটি কী হবে। অনেকে আছেন যাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি শব্দটিতে ভয়ানক আপত্তি এবং এটিকে অনেকটা বিদ্রূপাত্মকভাবেই তারা দেখতে অভ্যস্ত। এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে সম্পদের সুষম বণ্টনই হলো সরকারের প্রধান কাজ। প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশে সম্পদই যদি সৃষ্টি না করা যায় তাহলে তার বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে সব তাত্ত্বিক আলোচনাই আমার মতো অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এক অর্থহীন অনুশীলন ছাড়া আর কিছু নয়। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা না গেলে দারিদ্র্য বিমোচন যে সম্ভব নয় এ অতি সহজ কথাটি কেন যে বিদগ্ধজনরা বুঝতে চান না এটি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের বাইরে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি এবং শিল্পখাতে যথাক্রমে গড়ে ৩.৩৮ এবং ৬.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিতর্ক এড়ানোর জন্য সেবাখাতকে আমি হিসেবের বাইরে রাখছি যেহেতু এ খাতের উপযোগিতা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এমনকি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাতেও প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে সেবাখাতে তুলনামূলকভাবে দ্রুত কর্মসংস্থান সম্ভব। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রদত্ত উপরোক্ত পরিসংখ্যানে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে গত দশ বছরে দেশে যে তুলনামূলক সমৃদ্ধির যৎকিঞ্চিত আগমন ধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত শিল্পখাতের তেজি অবস্থানের কারণেই। এ পরিসংখ্যান নিয়ে সৌভাগ্যজনকভাবে এডিবি এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার মধ্যেও তত্ত্বগত কোনো মতদ্বৈততা নেই। বাংলাদেশে কৃষির প্রবৃদ্ধি অবশ্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ২০০২-০৩ সালের বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার যথাক্রমে ৫১, ১৪ এবং ৩৪ শতাংশ। তার অর্থ হচ্ছে কৃষিখাত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ কর্মজীবী মানুষের আয়ের প্রধান উৎস। বিগত পাঁচ বছরে হয়তো এ চিত্রের কিছুটা পরিবর্তন হয়ে কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৪৭-৪৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মোটা দাগে বলা যায়, এখনো দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী কৃষিখাতের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির ওপর নির্ভরশীল এ ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির বাইরে রেখে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের আশা অনুযায়ী কোন জাদুর চেরাগের জোরে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যকে জাদুঘরে প্রেরণ করব এটা অন্তত আমার মতো অতি সাধারণ মানের মেধার মানুষের বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না। বিদেশী অর্থে আমরা একটি বহুল আলোচিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরি করেছি। আশ্চর্যের বিষয় হলো সে দলিলের মধ্যেও আমার এ অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের কোনো বাস্তবসম্মত এবং বিশদ ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। আমাদের দেশের সব সুদর্শন, সুশোভিত সেমিনারজীবীরা আবার বিদেশীদের অর্থে এবং নির্দেশে সুশাসন নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, বাংলাদেশের মাটি-মানুষের সমস্যা কৃষিখাত নিয়ে আলোচনার তাদের খুব একটা সময় হয়ে ওঠে না।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, আমরা সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিকভাবে একটুখানি সুদিনের যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম তার ভিত্তি প্রধানত শ্রমঘন রফতানিমুখী শিল্পখাতে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির মাধ্যমেই রচিত হচ্ছিল। এ নিবন্ধে এটিও লিখেছি যে, বর্তমান অতিপ্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান সরকার সে শিল্পকেই তাদের গত পাঁচ মাসের বৈপ্লবিক শাসনামলে এমনভাবে আঘাত হেনেছেন যে এ সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ের একনিষ্ঠ সমর্থক বিশ্বব্যাংক, এডিবি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরাও এখন বলতে শুরু করেছে, ২০০৬-০৭ সালে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উর্ধ্বে হবে না। যদিও আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের আশাবাদী গভর্নর এখনো বলে যাচ্ছেন, বছরের শেষে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত ৬.৫ শতাংশ অর্জন করতে পারবে। যদি তর্কের খাতিরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের আশাবাদকে বাস্তবসম্মত হিসেবে বিবেচনা করেও নিই তাহলেও প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হবে। কৃষিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে না, শিল্পে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে, যৌথ বাহিনীর ভয়ে বিনিয়োগ আপাতত দেশান্তরিত হয়েছে, আত্মকর্মসংস্থান কমে গেছে, মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বগামী, ভোগ্যপণ্যের মূল্যের অবস্থা যেকোনো বাজারে গিয়ে সাহস করে ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন হবে, আমাদের অর্থনীতি তাহলে যাচ্ছেটা কোথায়? হ্যাঁ, অবশ্যই দুর্নীতি কমেছে, রাজনীতিবিদদের ফুলের মতো চরিত্র প্রতিদিন জনতার সম্মুখে লজ্জাকরভাবে উন্মোচিত হচ্ছে, বনরাক্ষসদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন পর হয়তোবা এবার টিআইবি বিশাল সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদকারী শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে পদকও প্রদান করে ফেলতে পারে। এদিকে আবার সুশীল(?) সমাজের বিশাল একজন নেতা, সিপিডি'র এক ট্রাস্টি এবং একাধিকবার সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে যে, তিনিও নাকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিপুল অংকের টাকা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে তার ব্যাংকের মালিক হয়েছিলেন। এ অপরাধে প্রায় সমান্তরাল সরকারের মতো ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠান সিপিডি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এমন কোনো সংবাদ আমাদের দৃষ্টিতে এখনো পড়েনি। অবশ্য আমাদের তো ভুললে চলবে না যে, আমজনতার জন্য যেটা অপরাধ সেটাই আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য লীলাখেলা।

অর্থনীতির এমনিতর টালমাটাল অবস্থায় বিস্ময়করভাবে নতুন বাজেটে সরকার বিদেশী পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ অনেকাংশে প্রত্যাহার করে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিশ্বায়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো উন্মুক্ত করেছেন। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ'র কর্তাব্যক্তিরা এ নীতিতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছেন। আবার একই সাথে সম্পূর্ণ উল্টো নীতি অনুসরণ করে শিল্পের কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল করার সব ব্যবস্থাই প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। কৃষি তো গেছেই, শিল্পও এবার সরকারের সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের ফলে যাওয়ার পথে। শাসকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক দর্শনের যে চেহারাটা ক্রমশই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তা দেশের জন্য যে কল্যাণকর নয় এ কথাটি এবার সাহস করে বলার সময় এসেছে। সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী গত ১০ মাসে দেশে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করেছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এ দুই খাতেই এক-এগারোর পর প্রবৃদ্ধি

www.pathagar.com

শুধু কমেই যায়নি, প্রকৃত পক্ষে গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ দাবিটির যথার্থতা প্রমাণের জন্য অবশ্য আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। শিল্পের কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির শুল্ক বৃদ্ধির পর আমাদের বিজ্ঞ অর্থ উপদেষ্টা আবারো দাবি করেছেন, এতেও নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের কোনো ক্ষতিসাধিত হবে না। আসলে উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক কিংবা অভিজ্ঞতাবিহীন কোনো তাত্ত্বিকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর হয় না। বিনয়ের সাথে বর্তমান শাসকদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ সরকারের সব ব্যর্থতার দায়ভার শেষ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে বহন করতে হলে আমাদের স্বাধীনতা দুর্বল হবে। অন্ততপক্ষে স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান করার জন্য সরকার শুল্ক ব্যবস্থায় যে একটি রক্ষাকবচের (Safeguard) প্রস্তাব করেছে এ জন্য তারা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবে। দেশের অর্থনীতির জন্য আরো একটি সুখবর হচ্ছে অব্যাহতভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্টে পড়ে থাকা অলস বৈদেশিক মুদ্রা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কোনোরকম ভূমিকা রাখে কি না সে প্রশ্নের জবাব অর্থনীতিবিদরাই ভালো দিতে পারবেন।

গত জোট সরকারের শেষ বাজেটে প্রস্তাবিত বহু নিন্দিত থোক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা দিয়েই দেশের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের এ কথকতায় সমাপ্তি টানব। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে সুশীল(?) সমাজ, বিরোধী দলের রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মতাদর্শের তাবৎ অর্থনীতিবিদ সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে এ থোক বরাদ্দ নিয়ে একযোগে কি নাজেহালটাই না করেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন থোক বরাদ্দের পুরো টাকাটাই বোধহয় তারই পকেটস্থ হবে। মজার ব্যাপার হলো, এ সরকারও কিন্তু থোক বরাদ্দ হিসেবে বাজেটে ৫৫০ কোটি টাকা রেখেছে। সরকারের সব কার্যক্রমকেই আমি অযৌক্তিকভাবে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি না এবং সে কারণেই ৫৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের এ প্রস্তাব আমি সরকারের অতি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হিসেবেই বিবেচনা করছি। আল্লাহ্ না করুন বাংলাদেশে এ বছর যদি একটি বিধ্বংসী বন্যা হয় কিংবা দেশটি যদি কোনো একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, সেরকম দুঃখজনক এবং অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে অর্থ সাহায্যের জন্য অতি উদ্ধত এবং দুর্বিনীত পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে না ঘুরে থোক বরাদ্দের এ অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোই আমাদের জন্য অধিক সম্মানজনক হবে। সর্বদা পরমুখাপেক্ষিতার অপমান থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে সরকারের একটি স্বচ্ছ, বাস্তবসম্মত এবং আত্মনির্ভরশীলতাভিত্তিক অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে কোনোরকম সময়ক্ষেপণ ব্যতিরেকে সবার সাথে মতবিনিময় শুরু করা আজকের কঠিন, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অবশ্য কর্তব্য। সংবাদ মাধ্যমের আনুকূল্যে ধন্য বিশেষ সমাজের অর্থনীতিবিদ দ্বারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার বিষময় ফলাফল বোধহয় দ্রব্যমূল্যের ভারে পিষ্ট এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগবঞ্চিত সাধারণ জনগণ মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই পেয়ে গেছে। বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শাসকদের আর বিলম্ব কেন?

২৭.০৬.০৭

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মিডিয়া টাইকুনরা, টিআইবি এবং একজন ওসমান চৌধুরী

তত্ত্বাবধায়ক তথা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান বেশ জোরেশোরে চলছে এবং এ অভিযানে বেশ ক'জন মিডিয়া টাইকুন ধরাশায়ী হয়েছেন। এ নিবন্ধের প্রধান চরিত্র এরাই। বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে অনেক মিডিয়া টাইকুন আত্মপ্রকাশ করেছেন ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছেন। কাজেই কাকে বাদ দিয়ে কার কথা লিখব এ এক ভীষণ সমস্যা। সমাধান খুঁজতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে সাম্প্রতিক সময়ে যারা বিভিন্ন কারণে আলোচিত, বিতর্কিত হয়েছেন তাদের দিয়েই শেষ করব লেখাটি, নইলে একটি মাত্র নিবন্ধে সবার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

শুরু করা যাক যুগান্তরের মহা শক্তিধর মালিক জনাব নূরুল ইসলাম বাবুলকে দিয়ে। বর্তমান সময়ে যে কোন পত্রিকা মালিকদের তুলনায় আপন স্বার্থে পত্রিকার ওপর তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ বাবুল সাহেবের উত্থান নিয়ে তার জন্মস্থান ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জে এবং ঐ সময় তার প্রধান বিচরণক্ষেত্র পুরানো ঢাকায় অনেক সরস আলোচনা রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা শিল্পপতি নূরুল ইসলাম বাবুলকে দেশের জনগণ নব্বইয়ের দশকে এক বিশাল চমকের মাধ্যমে চিনেছেন। চমকটি হচ্ছে তার প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এ্যারোমেটিকের হালাল সাবানের বিজ্ঞাপণ। এ দেশের ধর্মভীরু মানুষের আবেগকে ব্যবসায়ে সবচাইতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে এ্যারোমেটিকের এ হালাল সাবান বাংলাদেশের বিপুল শক্তিধর বহুজাতিক কোম্পানী ইউনিলিভার এর অতি জনপ্রিয় লাক্স সাবানকে বেশ কিছুদিনের জন্যে প্রায় বাজার ছাড়া করে ফেলেছিল। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে যে হালাল সাবানের সে ঝটিকা আক্রমণ হতে লাক্স ব্র্যান্ডকে বাঁচানোর জন্যে ইউনিলিভার নিযুক্ত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপণ সংস্থা এশিয়াটিক দীর্ঘদিন ধরে পাল্টা প্রচারণা চালিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের প্রতি এ শ্রদ্ধা যে বাবুল সাহেবের পুরোপুরি কৃত্রিম ছিল সেটি প্রমাণ হতে অবশ্য বেশী দিন প্রয়োজন হয়নি। এ আপাত ধর্মভীরু ব্যক্তিটি ২০০২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ থেকে যমুনা ব্রিউয়ারী এন্ড বেভারেজ নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীর নিবন্ধন গ্রহণ করেন। পাঠকবৃন্দ, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত জনগণকে হালাল সাবান ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সে একই ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি কোম্পানীর সংঘ স্মারক অনুযায়ী উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপঃ

"ক) কোম্পানী বিয়ার, বিয়ারজাতীয় পানীয়, এ্যালকোহল এবং ননএ্যালকোহল জাতীয় বেভারেজ, এ্যালকোহল, এক্সট্রা নিউট্রাল এ্যালকোহল, এ্যাবসলিউট এ্যালকোহল, পাওয়ার এ্যালকোহল, রাম, দেশীয় মদ, সাইট্রিক এ্যাসিড, ইস্ট উৎপন্ন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংমিশ্রণ, পরিশোধন করিতে পারিবে এবং এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী

www.pathagar.com

বর্তমানে অবস্থিত অথবা নতুন কারখানা, প্লান্টস মেশিনারী অথবা যে কোন যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ অর্জন, আমদানি, স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবসা করিতে পারিবে।

খ) কোম্পানী সমস্ত প্রকার এ্যালকোহল সংমিশ্রিত পানীয় এবং সলিড, লিকুইড, গ্যাসজাতীয় কেমিক্যাল প্রস্তুত, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, বদল, অর্জন ও ব্যবসাসহ সর্বপ্রকার কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি, স্থাপন, সংরক্ষণসহ ব্যাবসা করিতে পারিবে।"

এ শ্রেণীর ব্যক্তির ধর্মের নামে শঠতারও বোধহয় কোন সীমা থাকে না এবং এদের দুঃসাহস বিস্ময়কর।

যাহোক, উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে মদ তৈরীতে সক্ষম হয়নি বিনিয়োগ বোর্ডের তদানিন্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান অর্থাৎ এ নিবন্ধকারের প্রসিদ্ধ একগুঁয়েমির কারণে। ফলে সংগত কারণেই অদ্যাবধি দৈনিক যুগান্তরে প্রায়শই নিবন্ধকারের চরিত্র হনন সংক্রান্ত নির্লজ্জ মিথ্যায় পরিপূর্ণ প্রতিবেদন পাঠকেরা পড়ে থাকতে পারেন। এবার একই ব্যক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন প্রসংগে আসা যাক। রাজনৈতিক রং বদলের জন্যেও জনাব নূরুল ইসলাম বাবুল দেশে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ১৯৯৬ থেকে সম্ভবত ১৯৯৯ পর্যন্ত জনাব বাবুলের সংগে তদানিন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের দারুণ সখ্যতা ছিল। হঠাৎ একদিন তার কোম্পানীর প্রায় ৭৫ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকির ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম কিবরিয়া কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ মন্ত্রী সভায় বাবুল সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমন্ত্রীরা অনেক চেষ্টা করেও মরহুম কিবরিয়া সাহেবকে বাগে আনতে ব্যর্থ হলে বাবুল সাহেব দারুণ মনঃক্ষুণ্ন হন। বাবুল সাহেবের আওয়ামী মন্ত্রীবন্ধুদের নাম উল্লেখ করে আর তাদেরকে বিব্রত করতে চাচ্ছি না। নূরুল ইসলাম বাবুলের দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের এ বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার মানসে তিনি ঝুঁকে পড়লেন তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপির প্রতি। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অঢেল অর্থ থাকলে বাংলাদেশে যেকোন দলের রাজনীতিবিদদের সংগে বন্ধুত্ব করা খুবই সহজ কাজ। ফলে বিএনপিতেও তার বন্ধুর সংখ্যা খুব দ্রুতই বৃদ্ধি পেল। কিন্তু, ক্ষমতাসীন বিএনপির সংগে মধুর সম্পর্কে চিড় ধরলো মদের লাইসেন্স প্রাপ্তির জটিলতা নিয়ে। অবশ্য এর আগেই সরকারি জমি দখল নিয়ে সাবেক পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস এবং অজানা কারণে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সংগে তার মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র পর এবার বাবুল সাহেবের গন্তব্য হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকারী দল এলডিপিতে। জনশ্রুতি রয়েছে যে এলডিপিতে বিপুল অর্থ প্রদানের মাধ্যমে জনাব বাবুল ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থেকে বাতিলকৃত ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জনাব নূর আলীকে পেছনে ফেলে মহাজোট থেকে মনোনয়ন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কতই না ঠুনকো এদেশে রাজনীতিবিদদের তথাকথিত আদর্শবাদ। এ বিচিত্র বর্ণের ব্যক্তিটি বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে আছেন। অবশ্য কারাগার তার কাছে নতুন কোন বাসস্থান নয়। এর আগেও বিভিন্ন অভিযোগে বহুবার তিনি কারাগারে গিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় রয়েছে ভূমিদস্যুতা, শুল্ক এবং কর ফাঁকি, সন্ত্রাস, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চরিত্র নষ্টে ব্যবহৃত তার বিপুল সম্পদের উৎস বের করার দায়িত্ব এখন স্বাধীন

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমন কমিশনের হাতে। আমাদের মত সাধারণ জনগণের কাছে দুঃখ লাগে যখন দেখি এহেন বাবুল সাহেবের পত্রিকা 'যুগান্তরে' সম্পাদকের চাকুরী নেয়ার জন্যে দেশের প্রথিতযশা, বর্ষীয়ান সাংবাদিকরা কদর্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হচ্ছেন এবং একে অপরের চরিত্র হনন করছেন।

এবার সুশীল ব্যবসায়ী, মিডিয়া টাইকুন জনাব লতিফুর রহমানের গল্প। দূর্জনেরা বলেন, ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার সফলতম ব্যবহার করে জনাব রহমান, জনাব মাহফুজ আনাম, জনাব মতিউর রহমান এবং তাদের সহযোগী সুশীলেরা বিশেষত সিপিডি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। আজকাল বিভিন্ন সরকারী সভায় তারা এ জাতীয় দাবী প্রকাশ্যেই করতে শুরু করেছেন। এটি তো বাস্তব যে, তাদের এক সময়ের সহকর্মী বর্তমানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে যে যখন তখন তারা দল বেধে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সংগে দীর্ঘ সময় ধরে সভা করতে সক্ষম। ক্ষমতা প্রদর্শনের এ প্রতিযোগিতা আমজনতা আজকাল বেশ উপভোগই করছেন। লতিফুর রহমানের মালিকানাধীন পত্রিকাসমূহের একটি মুন্সিয়ানার প্রশংসা অবশ্য করতেই হবে। আর তা হলো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে অর্ধ সত্যের সংগে মিথ্যা মিশ্রিত করে media manipulation কে তারা একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বহুলাংশে সফল হয়েছেন। সাংবাদিকতার ethics বিরোধী আর একটি অনৈতিক কাজ তারা বাংলাদেশে বলতে গেলে প্রথম শুরু করেছেন এবং সেটা হচ্ছে trial by media।

যা হোক দেশের এমন ক্ষমতাধর জনাব লতিফুর রহমানকে সাক্ষাতে দেখেছি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত ডব্লিউ রহমান জুট মিলের সংগে দীর্ঘদিন আগে আমার সাবেক প্রতিষ্ঠান মুন্নু গ্রুপের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। পত্রিকা পড়ে জেনেছি যে এ জুট মিলের শ্রমিকেরা তাদের পাওনা টাকা না পেয়ে নিদারুন কষ্টে জীবন যাপন করছেন। ডব্লিউ রহমান জুট মিলের ব্যাংকের দেনা পরিশোধ না করার কারণে ঋণ খেলাপী জনাব লতিফুর রহমানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পদ থেকে সাবেক বিএনপি সরকার অপসারিত করেছিল তাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সংগে আমার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতাও প্রায় সমগোত্রীয়। আশির দশকের মাঝামাঝি মুন্নু জুটেক্স এবং মুন্নু স্ট্যাফলার্স এ দুটো প্রতিষ্ঠানের নিকট ডব্লিউ রহমান জুট মিলের বিপুল অংকের দেনা ছিল। সে দেনার তাগাদা দিতে বেশ কয়েকবার জনাব রহমানের মতিঝিলের অফিসে আমি গিয়েছি এবং যথারীতি বিফল মনোরথে ফিরে এসেছি। মুন্নু গ্রুপ থেকে পদত্যাগ করেছিলাম ১৯৮৯ সালে এবং স্মরণে আছে সে পর্যন্ত জনাব লতিফুর রহমান পাওনা টাকা পরিশোধ করেননি। অদ্যাবধি এ টাকা মুন্নু গ্রুপ পেয়েছে কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই এবং এ বিষয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী জনাব হারুনার রশীদ খান মুন্নুই ভাল বলতে পারবেন।

জনাব লতিফুর রহমানের এক সময়কার পরম মিত্র এবং এখনকার চরম শত্রু জনাব সোহেল রহমান এবং জনাব সালমান এফ রহমানের সংগেও দীর্ঘদিন ধরে জনাব লতিফুর রহমানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের কোষাগারে

www.pathagar.com

যখন বৈদেশিক মুদ্রা ছিলনা বললেই চলে তখন আমদানি রপ্তানির জন্য এসটিএ (STA) নামে এক বিশেষ বাণিজ্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এ পদ্ধতির সুবিধাভোগী প্রধান দুটি বেসরকারী সংস্থা ছিল জনাব লতিফুর রহমানের ট্রান্সকম এবং জনাব সালমান রহমানের বেক্সিমকো। তখন থেকেই তাদের যৌথ কারবারের শুরু। এ মধুর ব্যবসায়িক এবং পারিবারিক সম্পর্ক বজায় ছিল এরশাদ সরকারের শেষের দিকের বহুল আলোচিত চিনির ব্যবসা পর্যন্ত। অপয়া চিনির লাভের ভাগাভাগি নিয়েই দুই বন্ধুর সম্প্রীতি রূপ নিয়েছে বর্তমানের ভয়ংকর শত্রুতায়। লতিফুর রহমানের মালিকানাধীন ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলোর সংগে সালমান রহমানের বেক্সিমকোর সংঘাতের পেছনে কোন আদর্শিক বিরোধ নেই। বিষয়টি পুরোপুরি স্বার্থের সংঘাত। লুম্পেন, পুঁজিপতিদের ভেতরের চেহারায় কোন পার্থক্য থাকে না - বাইরের প্রলেপে রঙের পার্থক্য থাকে মাত্র। আর তথাকথিত সুশীলত্ব তো সরল জনগণকে ধোকা দেয়ার একটি মুখোশ মাত্র। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে সুশীল ব্যবসায়ী জনাব লতিফুর রহমান ভারত থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানিকালে বিপুল অংকের শুল্ক ফাঁকি দিয়েছেন এবং বহুল আলোচিত ওরিয়েন্টাল ব্যাংক থেকে চতুরতার সংগে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয় করেছেন। অভিযোগের সত্যতা নিয়ে বর্তমান দুর্নীতি বিরোধী সরকার হয়তো তদন্ত করবেন ।

বাংলাদেশের আরেক মিডিয়া টাইকুন, বেসরকারী খাতের বর্ণিল চরিত্র শেখ হাসিনার উপদেষ্টা জনাব সালমান রহমান। তিনি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। সম্প্রতি সরকার দুর্নীতির অভিযোগে যে প্রথম ৫০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে তার মধ্যে রয়েছেন জনাব সালমান রহমান। জনাব রহমানের বিরুদ্ধে প্রধানত ঋণ খেলাপী এবং ১৯৯৬ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে। বেক্সিমকো গ্রুপের উত্থানে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন মরহুম শেখ মুজিব পরিবারের বিশেষ করে শেখ কামালের অবদানের কথা শোনা যায়। পরবর্তীতে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের সংগেও এ গ্রুপের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লেনদেনের কাহিনী বহুল প্রচারিত। বেক্সিমকো মিডিয়া জগতে প্রবেশ করে ইংরেজী দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট নিয়ে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং খুবই দ্রুত তারা বাংলা দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, কয়েকটি সাপ্তাহিক সাহিত্য ও বিনোদন পত্রিকা এবং একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান চালু করে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির কারণে বেশ স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইন্ডিপেনডেন্ট ব্যতীত তাদের আর সব প্রকাশনা এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়।

বিএনপি চেয়ারপারসনের অতি বিশ্বস্ত এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল বিত্ত বৈভবের অধিকারী, সাবেক সংসদ সদস্য, মিডিয়া টাইকুন জনাব মোসাদ্দেক আলী ফালুর বর্তমান ঠিকানাও নূরুল ইসলাম বাবুল ও সালমান রহমানের সংগে কারাগারের প্রকোষ্ঠে। অতি দ্রুত জনাব ফালুর দেশের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং তিনিও দুর্নীতির দায়ে প্রথম পঞ্চাশজন অভিযুক্তের অন্যতম। দুদক এখন তার সম্পদের পরিধি এবং উৎস অনুসন্ধানে ব্যস্ত। দেশের জনগণ আশা করে সত্য উদঘাটন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মিডিয়া জগতে জনাব ফালুর রয়েছে দৈনিক পত্রিকা আমার দেশ এবং দুটি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ও আরটিভি। সম্প্রতি এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে দুঃখজনকভাবে তার তিনটি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে তিনি আবার দেশের অন্যতম বেসরকারী ব্যাংক আইএফআইসি (IFIC) -এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের আরো যে সমস্ত মিডিয়া টাইকুনদের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিতর্কের কারণে কলামের পর কলাম লিখে যাওয়া যায় তারা হলেন ইতিমধ্যেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বসুন্ধরা গ্রুপের জনাব শাহ আলম, আজকের কাগজের জনাব কাজী শাহেদ আহমেদ, ইত্তেফাকের জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এবং ইত্যাকার অনেক বিত্তবান, শক্তিমান ও এলিট ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি আজকের নিবন্ধের প্রধান চরিত্রে থাকবেন বর্তমান অস্থির ও অনিশ্চিত সময়ে অতি প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিবর্গরা মাত্র এবং সে কারণে অন্যদের সম্পর্কে ভবিষ্যতে লেখার বাসনা রইল।

এখন পাঠকবৃন্দই বিবেচনা করুন এ সমস্ত প্রশ্নবিদ্ধ এবং দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মিডিয়া টাইকুনদের মালিকানাধীন মিডিয়াসমূহের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি। একটুখানি গবেষণা করলেই জানতে পারবেন এ সমস্ত মিডিয়া পরিচালনায় media accountability, media responsibility, media transparency এ শব্দগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। এরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে একটি মাত্র কৌশলই ব্যবহার করেন আর তা হচ্ছে media manipulation। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সমস্ত পত্রিকার সংবাদ বাইবেলের মত আর সে প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ চ্যাপটার। টিআইবি প্রতি বছর বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কিত যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে তার একমাত্র source material হচ্ছে এ সমস্ত পত্র-পত্রিকা। এ বিষয়ে টিআইবি'র ওয়েব সাইটে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করছি, 'The corruption data base is based on news papers' অর্থাৎ দুর্নীতি বিষয়ক ডাটাবেজ সংবাদপত্রের খবরের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মিডিয়া টাইকুনদের পত্রিকার খবরের ওপর ভিত্তি করে নিজ মাতৃভূমিকে আমরা দুর্নীতিপরায়ণ বলব কিনা সে বিবেচনার ভার সচেতন পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে টিআইবি'র প্রচারের দায়িত্ব আবার গ্রহণ করেছে এ সমস্ত পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল সমূহই। টিআইবি'র ট্রাস্টিবৃন্দ এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের আমরা প্রায় প্রতিদিনই টেলিভিশনের পর্দায় অথবা পত্রিকার পাতায় দেখতে পাচ্ছি। তার অর্থ হচ্ছে এ টাইকুনদের সংগে টিআইবি'র কোথাও একটি যোগসূত্র আছে এবং তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করছে। এ সহযোগিতার উদ্দেশ্য দেশকে লাভবান করা নাকি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে ক্ষতিসাধন করা তার বিচারও একদিন নিশ্চয়ই এদেশের জনগণ করবে।

এক অসাধারণ, সৎ বাংলাদেশীর গল্প না বললে এ নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের গর্ব সে বাংলাদেশী হচ্ছেন জনাব ওসমান চৌধুরী এবং তিনি নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিছুদিন আগে জনাব চৌধুরী এক মার্কিন মহিলাকে ট্যাক্সিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার পর লক্ষ্য করলেন যে মহিলা যাত্রী তার একটি থলি ভুলক্রমে ট্যাক্সিতে ফেলে গেছেন। জনাব ওসমান চৌধুরী সারাদিন ধরে তার একটি দিনের আয় পরিত্যাগ করে মহিলা যাত্রীকে খুঁজে বের করে সে থলিটি ফেরত দিয়েছেন। পাঠকবৃন্দ শুনে চমকিত হবেন যে সে থলিটিতে মাত্র তিরিশটি

www.pathagar.com

হীরকখন্ড ছিল এবং জনাব চৌধুরী সারাটি দিন ধরে পাগলের মত হীরকের মালিককে খুঁজেছেন তার আমানত ফেরত দেওয়ার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরশপাথর কবিতায় এক ক্ষ্যাপা সারাজীবন পরশপাথর খুঁজে বেড়িয়েছে সোনা তৈরীর আগ্রহে আর আমাদের ওসমান চৌধুরী ক্ষ্যাপার মত ছুটে বেড়িয়েছেন তিরিশটি হীরকখন্ড তার মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যে। জনাব চৌধুরী আপনি আমার শ্রদ্ধাবনত সালাম গ্রহণ করুন। অতীব পরিতাপের বিষয় হলো এ খবরটি বাংলাদেশের কোন পত্রিকায় লাল হরফে হেডলাইন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, বাংলাদেশের সঠিক প্রতিনিধিত্ব মিডিয়া টাইকুনরা কিংবা টিআইবি'র ট্রাস্টিরা করেন না। সে মহৎ কাজটি করেন ওসমান চৌধুরীর মত মহান ব্যক্তিরা। এক ওসমান চৌধুরী অনেক অনেক মিডিয়া টাইকুন, অনেক অনেক সুশীলদের চেয়ে শক্তিমান। যতদিন ওসমান চৌধুরীরা আছেন ততদিন আমাদের এ মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দুর্নীতিপরায়ণ বলবার ধৃষ্টতা যেন আর কেউ না দেখান। এ খবরটি জার্মানীর এক হোটেলে একা, অসুস্থ, অসহায় অবস্থায় টেলিভিশনের পর্দায় দেখে শিহরিত হয়েছিলাম, প্রচন্ডভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। মূহুর্তে মনে হয়েছিল আমার অসুখ কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একেবারে সেরে গেছে। এ নিবন্ধের মাধ্যমে আমার সে আবেগের রেশ কিছুটাও যদি পাঠকদের মধ্যে সংক্রমিত করতে পেরে থাকি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

২৫.০৩.০৭

www.pathagar.com

বিত্তবানদের বিস্ময়কর মাতৃভূমি বিদ্বেষ

১৯৭৭ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের ধনবানদের সাথে আমার ওঠাবসা একেবারে ছিল না বললেই চলে। নিতান্ত মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী পরিবারের সন্তান, তার ওপর আমাদের বাল্য, কৈশোর, এমনকি যুবক বয়সের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত কেটেছে একেবারেই নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকা পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায়। চাকরি জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে অবশ্য বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করা নাক উঁচু বড়-মেঝো সাহেব, ধনবান পরিবারের অধিক ধনবান উত্তরাধীকারী মালিকপক্ষ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী নব্যধনী শ্রেণীসহ বাংলাদেশের অগণিত কোটিপতিদের সাথে অধস্তন কর্মচারী পর্যায় থেকে শুরু করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যায় পর্যন্ত কাজ করার কারণে অভিজ্ঞতার ঝুলি দিনে দিনে ভরে উঠেছে। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে হঠাৎ করেই এক সন্ধ্যায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার কার্যালয়ে ডেকে পাঠিয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের চাকরিটি কী এক রহস্যজনক কারণে প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সম্মানে উচ্চ, বেতনে স্বল্প, সরকারি চাকরির প্রস্তাব স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়ার দুঃসাহস আর সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম না। শুরু হলো কর্মজীবনের আর এক নতুন, অজানা অধ্যায়।

পাঠকবৃন্দ, এতক্ষণে হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন যে, এক অকিঞ্চিৎকর মাহমুদুর রহমানের বিরক্তিকর জীবনবৃত্তান্ত আদৌ কোন পঠনযোগ্য বিষয় কি না। ভুল বুঝবেন না। নিজের সম্পর্কে দীর্ঘ ক্লান্তিকর কোনো রচনা লেখার আদৌ আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। উপক্রমণিকাটুকু লিখতে হয়েছে এ লেখার প্রধান চরিত্রগুলোর সাথে আমার দায়িত্ব পালনজনিত কারণে অনাকাংখিত তবে বিভিন্ন কারণে চিত্তাকর্ষক সংযোগের ইতিহাস বর্ণনার একান্ত প্রয়োজনেই। নইলে নিবন্ধের শিরোনামের প্রাসংগিকতাটুকু পাঠকদের হয়তো বোঝাতে সক্ষম হতাম না। এ লেখাটি প্রধানত আমার পাঁচ বছরের সরকারি দায়িত্ব পালনকালীন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা হয়েছে। কারণ তার আগের পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের ঘটনা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এতই কম গুরুত্বপূর্ণ যে সে সম্পর্কে পাঠকের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। বিনিয়োগ বোর্ডে যোগদানের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বৈঠকে বুঝতে পারতাম এ দেশের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নেতার আমার তুলনামূলকভাবে সরকারি উচ্চ অবস্থানটি মেনে নিতে বেশ কষ্টই হচ্ছে। এসব চেয়ারে সাধারণত তারা সামাজিকভাবে একই শ্রেণীভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত সাবেক ডাকসাইটে আমলাদের দেখতে এবং তাদের যথাযথ বিনয় প্রদর্শনে অভ্যস্ত। তাদের বিবেচনায় বয়সে নবীন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় অপ্রাসংগিক, অরাজনৈতিক এক পেশাজীবীকে তার অবস্থানের কারণে সরকারি আইন দ্বারা নির্ধারিত

www.pathagar.com

সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করা আর তেতো নিমপাতা গলাধঃকরণের মধ্যে কোনটি অধিক কষ্টকর এ সিদ্ধান্ত নেয়া বেচারাদের পক্ষে সত্যিই এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। একটি ঘটনার উলে-খ করলে বিষয়টি পাঠকের কাছে আরেকটু খোলসা হবে। আমার নেতৃত্বে সম্ভবত মালয়েশিয়ায় একটি বিনিয়োগ প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নির্বাচনের দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমার ওপরই ন্যস্ত হলো। বাংলাদেশে ধনবানদের মধ্যে আবার তথাকথিত উচ্চতম শ্রেণীর ধনীদের মিলনকেন্দ্র নামে খ্যাত এক বিশেষ চেম্বারের তৎকালীন প্রধান ব্যক্তি সে বাণিজ্য সংস্থার প্রায় চিরস্থায়ী এবং অতিশয় জ্ঞানী মহাসচিবসহকারে আমার অফিসে এসে হাজির হলেন এক গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। তাদের অভিযোগ ছিল, প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি নাকি সম্মানী ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান রক্ষা করিনি। তাদের বিবেচনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ীদের সাথে উচ্চবর্ণের তথাকথিত নীল রক্তের ব্যবসায়ীদের একই প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব মানী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ অপমানজনক এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে আমার অনভিজ্ঞতার আরো একটি প্রমাণ। আমি স্বভাবসুলভ সরাসরি ভংগিতে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ব্যবসায়ীরা আমার বিবেচনায় একটি সম্মিলিত শ্রেণীরই অংশ এবং তাদের মধ্যে আবার নতুন করে কোনোরকম শ্রেণীবিভাগ করতে আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। যতদূর মনে পড়ে, সে অতীব ধনাঢ্য ব্যক্তিটি ওই প্রতিনিধিদলে যেতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তিনি ঘটনাক্রমে বর্তমান সরকারেরই একজন অতি ক্ষমতাবান উপদেষ্টা। জানি না সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের পর তার উন্নাসিক মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না। আমাদের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনার রূপটি বোঝানোর জন্যই এ ঘটনার অবতারণা করলাম।

বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং জ্বালানি উপদেষ্টার দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনকালে আমাকে বিভিন্ন চেম্বারের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হতো। ওই প্রকৃতির প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বেসরকারি খাতের বক্তারা সরকারের নানাবিধ ব্যর্থতা নিয়ে নিয়মিত তুলোধুনা করতেন। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো আপত্তি থাকত না। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও আমলাদের প্রকৃত চেহারা এক-এগারোর বদৌলতে এখন প্রত্যন্ত গ্রামের সরল কৃষকও জেনে গেছেন। কাজেই তাদের জন্য আবার কিসের সহমর্মিতা। তবে যে বিষয়টি নিয়ে আমি খুব শক্ত ভাষায় আপত্তি জানাতাম, তা হলো ওই সব অনুষ্ঠানে যদি ঘটনাচক্রে কোনো সাদা চামড়ার ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন তাহলে সমালোচনাকারীদের বক্তব্যের ধার বহুগুণ বেড়ে যেত এবং অনেক সময়ই তারা ভব্যতার সীমা অতিক্রম করতেন। আমি বেসরকারি খাতের এসব নেতাকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, নিজের দেশের সীমাবদ্ধতা এতটা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলে দেশের ভাবমর্যাদা তো ক্ষুণ্ন হয়ই সে সাথে ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ব্যবসারও ক্ষতির আশংকা থাকে। আমার যুক্তিটা এ ধরনের ছিল যে, বাংলাদেশের ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে যদি স্থানীয় বিনিয়োগকারীরাই নেতিবাচক মন্তব্য করেন তাহলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগের জন্য কেমন করে উৎসাহিত করা হবে। এ তো গেলো বিনিয়োগ বিষয়ক পর্যালোচনা। পাঁচ বছর ধরে দ্বিতীয় যে মতামতটি আমি অব্যাহতভাবে দেয়ার চেষ্টা করে গেছি, বাংলাদেশকেই যদি আপনারা এতটা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন তাহলে

www.pathagar.com

সে দেশেরই আপনাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোয় উৎপাদিত পণ্য কোন যুক্তি বা জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে রফতানি করবেন। কাজেই অভিযোগের শত সত্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্তত বিদেশীদের সামনে আমাদের একটি ইতিবাচক ভাবমর্যাদা দেশের সার্বিক স্বার্থেই তুলে ধরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্তত এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে থেকে বক্তব্য প্রদান করাই হবে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। একবার তো যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনে এক সাক্ষাৎকার প্রদানকালে বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বারের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আফতাবুল ইসলাম বলেই ফেললেন, দেশে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ যে এ দেশে তার স্বাভাবিক মৃত্যুরও গ্যারান্টি নেই। মহান আল্লাহতায়ালা ছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু বা কোনোরকম জন্ম-মৃত্যুর গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে এমন কোনো শক্তির অস্তিত্বে অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। জনাব ইসলামের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক তার দেশবিরোধী এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বাতিলকৃত সংসদীয় নির্বাচনে আফতাবুল ইসলাম সম্ভবত কুমিল্লার একটি আসনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন লাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। টাইম ম্যাগাজিনে তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের মাজেজা অনুধাবন করতে আমার একটু বিলম্ব হয়েছিল আর কী।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটি অংশ একধরনের পরিচয় সংকট এবং হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এ কারণেই বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কূটনীতিবিদদের যেকোনো রকম একটি প্রশংসাপত্রের জন্য তারা লালায়িত থাকেন। দেশের সম্মান রক্ষার নাগরিক দায়িত্বটি এ ধরনের ব্যক্তিগত অভিলাষের উদগ্রতার কাছে বারবারই পরাজিত হয়। এক দশক ধরে এ ব্যবসায়ীদের সাথে আবার সংযুক্ত হয়েছে তথাকথিত সুশীল(?) সমাজ। অবশ্য আমরা যদি এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি যে, দুই বিশেষ শ্রেণীর এ সংযোগ কাকতালীয়ভাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে গেছে তাহলে দেশের মানুষ আরো বৃহৎ ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলবে। বর্তমান বিশ্ব শাসনকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এ ধরনের মেলবন্ধনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট সুশীল(?) সমাজের নেতৃত্ব প্রধানত সিপিডি এবং টিআইবি নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আর সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী, সুশীল(?) সমাজ এবং সাম্রাজ্যবাদী অক্ষশক্তির মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দু'টি জনপ্রিয় বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাকে। সচেতন পাঠক লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝবেন যে, বিশেষ মিশনে নিয়োজিত নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে কী পরিমাণ বিজ্ঞাপন নিয়মিতভাবে পেয়ে থাকে। এর সাথে আবার অপ্রকাশ্য কোনো লেনদেন আছে কি না সে বিষয়ে শুধু সংশ্লিষ্টদেরই অবহিত থাকার কথা। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলোর বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের প্রকল্প হিসেবেই যে আমাদের দেশে সুশীল(?) সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদের কার্যকারিতা বজায় রাখাও যে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী কূটনীতিকদের দায়িত্বেরই একটি বড় অংশ সেটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সিপিডির সাথে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত দ্বন্দ্বের সময়। জাতীয় স্বার্থবিরোধী এজাতীয় গোষ্ঠী যে নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং প্রতিপক্ষের সাথে যেকোনো দ্বন্দ্বের সময়

www.pathagar.com

একযোগে বহুমাত্রিক আক্রমণ পরিচালনা করে তারও প্রমাণ ওই সময়ে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণ প্রত্যক্ষ করেছিল। বাংলাদেশে বহুল পরিচিত এক বর্ষীয়ান চেম্বার নেতা যিনি জনশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রতিটি চেম্বারের নির্বাচনে নানা কৌশল প্রয়োগ করে প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকেন তিনি এ লেখকের বিরুদ্ধে ওই ঘটনাবহুল সময়ে সব চেম্বার সমন্বয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করানোর জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন। তার প্রচেষ্টা পুরাপুরি ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ এফবিসিসিআইসহ বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় চেম্বার নেতৃবৃন্দ বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিপিডির মধ্যকার বিরোধে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। এ বর্ষীয়ান ব্যবসায়িক নেতার আবার সুশীল(?) সমাজভুক্ত আপাতসাধু ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাত একজন অতি বিখ্যাত ঘনিষ্ঠতম সহযোগী রয়েছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের দায়িত্ব পালনকালে সরকারি কাজে মাঝে মধ্যেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতে হতো। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অতিনিন্দিত রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর কক্ষে এ মাণিকজোড়ের নিয়মিত উপস্থিতি সে সময় ওই কার্যালয়ে অনেক সরস আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে বিখ্যাত মাণিকজোড়ের একজনের মালিকানাধীন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দু'টি পত্রিকাই সুশাসনের বিষয়ে সরকারকে অব্যাহতভাবে উপদেশামৃত বর্ষণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, এ গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের বিশেষ ভূমিকা এবং সরকারের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি যথেষ্ট অবলীলাক্রমে উপদেষ্টাদের সামনেই করার ক্ষমতা রাখেন। ভাবতে অবাক লাগে সহস্রাধিক বছর আগের গ্রিক সেনাপতির সে বিখ্যাত উক্তি এসব বর্ণিল ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশে আজো কত প্রযোজ্য। সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

এতক্ষণ বাংলাদেশের সব স্বনামধন্য ব্যবসায়ী নেতার মানসিকতা পাঠকদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। এবার দেশের প্রতি এদের অবদানের প্রসংগ উল্লেখ না করলে আলোচনাটি সংগত কারণেই একপেশে বলে অভিযোগ তোলা হতে পারে। নেতৃস্থানীয় এবং জ্ঞানগম্ভীর এসব ব্যবসায়ী নেতার মধ্যে দ্রুততার সাথে একটি শুমারি করলে এ শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে খুব কমসংখ্যককেই পাওয়া যাবে, যারা সরাসরি কোনোরকম উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে আদৌ সংযুক্ত। আপনারা হয়তো বলবেন, যে দেশ থেকে এখন প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি হচ্ছে সে দেশের সফল ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এ নেতিবাচক মন্তব্যটি করে আমি অতি গর্হিত একটি অপরাধ করে ফেলেছি। বেসরকারি খাতে বিভিন্ন পদে দীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার জোরে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, বাংলাদেশের জন্য মহামূল্যবান এ বৈদেশিক মুদ্রার জোগানদারের বৃহদাংশই মাঝারি ব্যবসায়ীদের শ্রেণীভুক্ত। তাদের আপনারা সাধারণত টেলিভিশনের পর্দায়, সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা সেমিনারজীবীদের আয়োজিত গোলটেবিলে সবজান্তার ভূমিকায় দেখবেন না। কাজের মানুষের অপচয় করার মতো এতো সময় থাকে না। এ মাঝারি মাপের কর্মঠ ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের পাশে নিজেরা দাঁড়িয়েই উৎপাদনের মতো মহৎ কাজে নিয়োজিত থেকে দেশের অর্থনীতিতে সত্যিকার অর্থেই অবদান রাখছেন। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জীবনযাপনের মানও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য মানানসই একটি বাঞ্ছনীয় সীমার মধ্যেই থাকে। তাদের

www.pathagar.com

হ্যামার, লেক্সাস, বিএমডবি-উ কিংবা মার্সিডিজ ব্র্যান্ড জাতীয় কোটি কোটি টাকা মূল্যের গাড়ির প্রয়োজন হয় না। এ ব্যবসায়ীরা নিজের মাতৃভূমি সম্পর্কে সচরাচর যথেষ্ট গর্ব ও মমত্ববোধ করেন। এ নীরব কর্মী ব্যবসায়ীদের মনমানসিকতা আমাদের খ্যাতিমান ব্যবসায়ীদের মনমানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার এবং উৎকোচের সবচেয়ে দুর্বল শিকারও আবার প্রধানত এ দেশপ্রেমিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাই। অথচ নিজ মাতৃভূমি সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইরে।

পক্ষান্তরে তথাকথিত বিজনেস টাইকুনরা যেকোনো সরকারি অফিসে একই অত্যাচারী আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে সচরাচর খুবই বিনীত ব্যবহার পেয়ে থাকেন। সরকারি অফিসে তারা কোনো কাজে পদধূলি দান করলে ওই অফিসের তুলনামূলক দামি চেয়ারটি তাদের উপবেসনে ধন্য হয়, এমনকি সরকারি অফিসের সীমিত ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার মধ্যেও তাদের দামি চা-নাশতা দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। এত সেবার পরও দেশ সম্পর্কে যত অভিযোগ, যত বিদ্বেষ এ সুবিধাভোগী শ্রেণীটিই দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে বেড়ান। সরকারি পদে অভিষিক্ত থাকার সুবাদে দু-একটি বিশেষ ভোজসভায় আমার মতো নিতান্ত অভাজনের অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সুবেশধারী বিত্তবানদের ওই সব ভোজসভায় আমি আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি সম্পর্কে নিন্দাবাক্য ছাড়া কোনো প্রকার প্রশংসা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে বলে স্মরণে আনতে পারছি না। আর এজাতীয় ভোজসভা যদি ঘটনাক্রমে কোনো বিদেশী কূটনীতিকের সরকারি বাসস্থানে হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই। মনে হতো ভোজসভাটি যেন আয়োজন করাই হয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রচারণার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে। আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেই আমাদের বিত্তবানরা একটাই বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করেন, তারা বাংলাদেশের মতো বিশ্বের নিকৃষ্টতম স্থানে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও জীবনে এতটা সফলকাম হয়েছেন শুধু ঈশ্বরপ্রদত্ত তার বিশেষ প্রতিভাবান এবং সৃজনী ক্ষমতা বিশিষ্ট মস্তিষ্কের বদৌলতে। এজাতীয় দু-একটি অনুষ্ঠান অনেক কষ্ট করে সহ্য করার পর আমার সহকর্মীদের প্রতি নির্দেশই ছিল, এ ধরনের দাওয়াতপত্র পাওয়া মাত্র সেটিকে আবর্জনার বাক্সে নিক্ষেপ করার।

রফতানিতে উলে-খযোগ্য সাফল্যের সাথে সাথে গত বছর দশেকে বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণের অভাবনীয় বৃদ্ধিও আমাদের অর্থনীতিকে মজবুত অবস্থানে নিয়ে গেছে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে যে অর্থ প্রেরণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বর্তমান অর্থ বছরে সে অংক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত এ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কৃতিত্বের প্রতিযোগিতা গত দুই দশক ধরে সব সরকারই করে এসেছে। বর্তমান জরুরি সরকারও একই দাবি করে যাচ্ছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এ অর্থ অর্জন যাদের একক কৃতিত্বে হচ্ছে তারা আমাদের দেশের অতিসাধারণ, অতিমাত্রায় অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষ। হিমাংকের নিচে তাপমাত্রায় কানাডার প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যেই বলুন আর মধ্যপ্রাচ্যের ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তপ্ত বালুতেই বলুন বাংলাদেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিক এ অতি পরিশ্রমী জনগোষ্ঠীর রক্ত পানি করা অর্থের বিনিময়েই আমরা সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণীরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারছি। কোটি কোটি টাকা

www.pathagar.com

মূল্যের কত নাম না জানা ব্র্যান্ডের গাড়ি আমদানি করছি, শপার্স ওয়ার্ল্ড এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড নামক বিলাসবহুল দোকান সাজিয়ে বিত্তবানদের জীবনযাত্রার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। পিজ্জাহাট, মভেনপিকের মতো দোকান খুলে দেশের অর্থ বিদেশে পাচারের সুযোগ সৃষ্টি করে তথাকথিত সাধু ব্যবসায়ীদের বিদেশের ব্যাংক একাউন্ট স্ফীতকায় করার ব্যবস্থা করছি। আর যারা তাদের প্রিয়জনদের মহান আল-াহতায়ালার করুণার ওপর সোপর্দ করে অজানা দেশে, আত্মীয়স্বজনহীন পরিবেশে অমানুষিক পরিশ্রম করে আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধি এনে দিচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের মানবেতর ব্যবহারের উদাহরণ আপনারা বাংলাদেশ বিমানের যেকোনো ফ্লাইটে কিংবা ঢাকা বিমানবন্দরের আগমন ও প্রস্থানের জন্য নির্ধারিত স্থানে গেলেই দেখতে পাবেন। আর আমাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত যেসব সৌভাগ্যবান পেশাজীবী উচ্চ বেতনে বিদেশে চাকরির সুযোগ পেয়েছি তারা কিন্তু তাদের আয়ের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও দেশে প্রেরণ করতে রাজি নই। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ পেশাজীবীরা আয়ের প্রায় পুরোটাই পাশ্চাত্যের যেকোনো দেশের ব্যাংকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমি এমন অসংখ্য উদাহরণের কথা জানি, যেখানে বাংলাদেশে বৃদ্ধ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় যে, কত দ্রুত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করে সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদেশের ব্যাংকে প্রেরণ করা যায়। অথচ এজাতীয় দেশপ্রেমবিহীন, সুবিধাভোগী শ্রেণীর সাথে যখনই দেশ সম্পর্কে কোনো আলাপচারিতায় অংশ নেবেন তখনই তাদের কাছ থেকে দেশবিরুদ্ধ বক্তব্য ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবেন না। এ এক অদ্ভুত, হীনম্মন্য, নিজ মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষপ্রসূত মানসিকতা। শত বছর আগে কবির লেখা 'বিদেশের কুকুর ধরি দেশের ঠাকুর ফেলিয়া' আজো বাংলাদেশের নানা জাতের বিত্তবানদের জন্য কত প্রাসংগিক। আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং সুশীল(?) সমাজ দেশপ্রেমের বিষয়টিকে যে কী পরিমাণ বিদ্রুপের সাথে বিবেচনা করেন তারও একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার ঘটেছিল বছর দুয়েক আগে সিপিডির সাথে আমার বহুল আলোচিত বিতর্কের সময়। আত্মস্বীকৃত সুশীল(?) সমাজভুক্ত এক ব্যক্তির বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করায় সম্পাদক সমাজের শিরোমণি মাহফুজ আনাম তার সম্পাদিত পত্রিকায় এ লেখককে স্যামুয়েল জনসনের `Patriotism is the last resort of a scoundrel' (দেশপ্রেম একজন ইতর দুর্বৃত্তের শেষ আশ্রয়স্থল) এ উদ্ধৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। জনাব মাহফুজ আনাম স্যামুয়েল জনসনকে উদ্ধৃত করে আমাকে তার অসীম জ্ঞানের কিয়দংশ থেকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। অথচ 'কাউলুল উলামা' বা ইসলামি আলেমবৃন্দ শিক্ষা প্রদান করেন যে 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ'। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির কাছে দেশপ্রেম সম্পর্কে 'কাউলুল উলামা'দের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থনপুষ্ট, পরজীবী সুশীল(?) সমাজ নেতা মাহফুজ আনামের কাছে অবশ্য স্যামুয়েল জনসনের তত্ত্বই সর্বাগ্রে স্থান পাওয়ার কথা। সংগত কারণেই এ শ্রেণীভুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোরকম দেশপ্রেম আশা করাটাই আমাদের চরম বোকামি।

০৪.০৭.০৭

www.pathagar.com

ভারত-আওয়ামী লীগ বিশেষ সম্পর্কের সম্ভাব্য বিবর্তন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ভারত সরকারের বিশেষ সম্পর্কের বিবর্তন নিয়ে নানা বিতর্ক সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি নানা সময়ে তাদের মূল্যবান মতামত, ইতিহাসভিত্তিক বিশে-ষণ প্রকাশ করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ রচনার শিরোনামটি দেখেই অনেক পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন তাহলে আবার এ জানা বিষয় নিয়ে একজন অতি সীমিত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির চর্বিত চর্বণের নতুন এ প্রয়াস কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আমাকে বলতে হবে বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রতিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের ফলেই উপমহাদেশের রাজনীতির দৃশ্যপটটি নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যা হলো যে মুহূর্তে রাজনীতির এ জাতীয় আলোচনায় উপমহাদেশ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হবে, তখনি আলোচনাটি আওয়ামী লীগ এবং ভারত শুধু এ দুই পক্ষের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ না থেকে ঐতিহাসিক কারণেই তার কিছুটা বিস্তৃতি ঘটতে বাধ্য। ধান ভানতে শিবের গীত - এ বহুল প্রচলিত প্রবচন সত্ত্বেও এবং পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদনের ঝুঁকি বিবেচনায় রেখেই আমার এ লেখার প্রারম্ভে ব্রিটিশ ভারতের দিনগুলোর উল্লেখ অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলে এসেছে। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সরকারব্যবস্থার সাম্প্রতিক নাটকীয় পরিবর্তনের আগমুহূর্তে এদেশে কর্মরত পশ্চিমা কূটনীতিকদের নানাবিধ অযাচিত তৎপরতার অভিজ্ঞতাই উপমহাদেশের ইতিহাসের পার হয়ে আসা সময়ে আমাদের বারবার প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারত আবিস্কারের আগেই এ উপমহাদেশ যে বিশ্বের অন্যতম বর্ধিষ্ণু অঞ্চলগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল এ সত্যটি সব ইতিহাসবেত্তাই স্বীকার করেছেন। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি সঙ্গত কারণেই এ সম্পদশালী উপমহাদেশের দিকে থাকলেও তৎকালীন মহাশক্তিধর মোঘল শাসকদের প্রবল পরাক্রমের সামনে অন্তত সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ অঞ্চল আন্তর্জাতিক লুটেরাদের কাছ থেকে নিরাপদই ছিল। দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ভারত শাসনকারী ব্রিটিশদের আমাদের দেশে আগমন ঘটেছিল অতি বিনীত এবং আপাত নিরীহ ব্যবসায়ীর রূপে। অসুস্থ কন্যাকে সুস্থ করে তোলার আনন্দে উদ্বেলিত সম্রাট শাহজাহান ব্রিটিশ চিকিৎসককে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতিপত্রটি যখন প্রদান করেছিলেন, তখন সম্রাটসুলভ বদান্যতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তিনি যে প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াই শুরু করে দিয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই সেদিন রাজসভায় উপস্থিত কোনো সভাসদের দূরতম কল্পনাতেও আসেনি। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আগত সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন কৌশলে ভারত উপমহাদেশ দখলের কাহিনী আমার নিবন্ধের মূল বিষয়বস্তু নয়। তবে শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশদের বিরূদ্ধে গৌরবময় সিপাহী বিপ্লবের ওপর ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পলের

www.pathagar.com

রচিত গ্রন্থ 'The Last Mughal' - এর নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র অথচ অতি বেদনাময় অংশটি উদ্ধৃত না করলে সচরাচর সভ্যতা এবং নিয়মনীতির মুখোশধারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্নিহিত চেহারাটা আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে না :

'At 4p.m. on a hazy November afternoon in Rangoon, 1862, a shrouded corpse was escorted by a small group of British soldiers to an anonymous grave in a prison enclosure. As the British Commissioner in charge insisted, no vestige should remain to distinguish where the last of the Great Mughal rests.'

(১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে রেঙ্গুনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরাহ্ন ৪টায় একটি আবৃত শবদেহ কারাবেষ্টনীর অভ্যন্তরের কবরস্থানে নিয়ে এল। উপস্থিত ব্রিটিশ কমিশনার নির্দেশ দিলেন যে শেষ মহান মোঘলের বিশ্রামস্থলটি কোনখানে সেটি আর কখনো চিহ্নিত করার কোনো সুযোগই যেন অবশিষ্ট না থাকে।)

দীর্ঘ ২০০ বছর শাসনান্তে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত করে যে তিনটি স্বাধীন দেশ জন্মলাভ করে তাদের মধ্যে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ যোগসূত্রই ভবিষ্যতে আর যাতে সৃষ্টি হতে না পারে হয়তো বা সে সুদূরপ্রসারী এবং অদ্যাবধি কার্যকর ব্রিটিশ কৌশলের নিদর্শন আমরা শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের এ অতি নগণ্য শেষকৃত্যানুষ্ঠানের বর্ণনা থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে গত ৬০ বছর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এ বিশাল উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে জন্মলাভ করা তিনটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একই সাথে এক বিচিত্র শত্রুতা এবং ভালোবাসার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আজো বিদ্যমান। মাত্র কিছুদিন আগে ভারতের নেহেরু পরিবারের পঞ্চম পুরুষ এবং ফিরোজ গান্ধী পরিবারের তৃতীয় পুরুষ রাহুল গান্ধী পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্মলাভ নেয়া সম্পর্কে তার নিজস্ব মূল্যায়নকে প্রকাশ করে উপমহাদেশের রাজনীতিতে আবার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ১৯৭১ সালের আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন যে, পাকিস্তানকে বিভক্ত এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার বিষয়ে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা তার পরিবারই পালন করেছে। উপমহাদেশের একটি সংবেদনশীল বিষয়ে তার এ বক্তব্য ভারতে এবং পাকিস্তানে যথেষ্ট উত্তপ্ত বিতর্ক সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকারের দুঃখজনক নীরবতা বিস্ময়কর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমাদের অগণিত শহীদের মহান সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এবং আমাদের বীরত্বের এ গৌরবগাঁথা ভিনদেশী কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে কোনোভাবে হেয় করার চেষ্টা বাংলাদেশের জাতিসত্তার জন্য অবমাননাকর হিসেবেই সবার বিবেচনা করা উচিত। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের মধ্যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে বাংলাদেশকে জন্ম দেয়ার যে ইংগিত রয়েছে সেটি রাজনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখ্যান করা সব বাংলাদেশীর অবশ্য কর্তব্য ছিল। সম্ভবত আরো একবার আমরা রাজনৈতিক সংকীর্ণতা পরিহার করে জাতীয় সম্মান রক্ষার দায়িত্ব পালনে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হলাম। অথচ ভারতের পশ্চিমের প্রতিবেশী, এক সময়কার ঘোষিত পয়লা নম্বর শত্রু এবং বর্তমানের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদাক্রমে ক্রমশই বন্ধুভাবাপন্ন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান মুসলীম লীগের মহাসচিব ও সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটির

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান সৈয়দ মুশাহিদ হোসেন রাহুল গান্ধী প্রদত্ত সুযোগটি কালবিলম্ব না করেই নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে কাজে লাগিয়েছেন,

'Mr. Rahul Gandhi's statement citing the breakup of Pakistan in 1971 as an achievement of the Gandhi Family shows that the Indian strategy was clear from day one, namely, to partition its neighbor through sponsorship of state terrorism. India created and armed the Mukti Bahini just as it created and armed the Tamil Tigers in Sri Lanka. It is an irony of history that Frankenstein monster of terrorism and extremism that Gandhi created ultimately devoured her in the form of Khalistan movement through its leader Sent Jarnail Singh Bhindrawala.'

(১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্ত করা সম্পর্কিত রাহুল গান্ধীর বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বিভক্ত করাই ভারতের কৌশল ছিল। ভারত শ্রীলংকায় তামিল টাইগার করার একই কায়দায় সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীকে সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের নির্মমতায় শ্রীমতী গান্ধী সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গীবাদ জরনেল সিং ভিন্দ্রাওয়ালার রূপ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত তাকেই গিলে ফেলে।)

ভাবছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সব বাঘা বাঘা সোল এজেন্ট গেলেন কোথায়? নাকি ভারতের নেহরু পরিবারের কোনো সদস্যের যেকোনো কক্তব্যের কোনো রকম বিরোধিতা করাকেই তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরূদ্ধ কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন?

১৯৮১ সালে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের বিষয়টি উত্থাপন ছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কিংবা এ দুটি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থবহ বিশে-ষণ সম্ভব নয়। বিদেশী মদদপুষ্ট ক'জন বিদ্রোহী বাংলাদেশী সেনা সদস্য কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকান্ডের অন্তরালের রহস্য সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা Sunday ১৯৮৭ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সে প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজনবোধ করছি।

'During his short lived premiership, Desai wanted genuine cooperation with all the neighbors. According to a report published in weekly Sunday of India in 1987, on his assumption of the office of Prime Minister RAW took to Morarji Desai the plan to assassinate President Ziaur Rahman."He (Desai) was appalled to see the plan" and ordered its scrapping. But Zia was ultimately assasinated after Indira Gandhi returned to power. Desai was also reportedly ordered scrapping of RAW plan to destroy the nuclear plant of Pakistan.'

[মোরারজি দেশাই তার স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় প্রতিবেশীদের সাথে আন্তরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যার এক পরিকল্পনা ভারতের 'র' (RAW) তার কাছে উপস্থাপন করে। দেশাই এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং

www.pathagar.com

অবিলম্বে পরিকল্পনাটিকে বাতিল করার নির্দেশ দেন । ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর অবশ্য জিয়া নিহত হন। সংবাদ পরিক্রমাটিতে আরো বলা হয় যে, দেশাই পাকিস্তানের আণবিক কেন্দ্র ধ্বংস করার 'র' (RAW) -এর অন্য একটি প্রস্তাবও বাতিল করেন।]

এ উপমহাদেশের দুর্ভাগ্য যে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত এ জাতীয় ষড়যন্ত্র সমাপ্তির কোনো সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হচ্ছে না। বিভিন্ন বিষয়ে উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব অদ্যাবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের সফলতারই নিদর্শন বহন করে।

উপমহাদেশ সংক্রান্ত নাতিদীর্ঘ প্রাসঙ্গিক আলোচনা শেষে আবার ফিরে আসি লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে। এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে, সব ভারত সরকারই আওয়ামী লীগকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের পক্ষশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সংবেদনশীল দ্বিপক্ষীয় চুক্তিগুলোর অধিকাংশই যে সই হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালেই, এটিও ইতিহাসেরই বাস্তবতা। অন্তত তিনটি চুক্তির প্রসঙ্গ এখানে উলে-খ না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথমটি, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার তথাকথিত ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি, যেটি ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় সম্পাদিত হয়েছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, উলি-খিত ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামিক সম্মেলনে (OIC) শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণ নিয়ে ঢাকা-দিলি-র মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং বর্ণিত মতানৈক্যের ঝুঁকি নিয়েই শেখ মুজিবুর রহমান শেষ পর্যন্ত লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত এ ইসলামিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের যোগদানের বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েত সে সময় বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে কুয়েতের আর্থিক সহায়তা ১৯৭৪ সালের এ সম্মেলনের সূত্র ধরেই সূচিত হয়। বর্ণিত তিনটি চুক্তির দ্বিতীয়টি ফারাক্কার পানি চুক্তি সই হয় ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে নয়াদিলি-তে শেখ হাসিনা এবং তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার সাথে। তৃতীয়টি আবার সেই শেখ হাসিনার শাসনামলেই ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী চাকমা উপজাতীয়দের সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি। অর্থাৎ যে রাজনৈতিক দলই ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, তারা আমাদের দেশে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার অবস্থান করলেই যে অধিকতর স্বস্তিবোধ করে সে বিষয়টি উলি-খিত চুক্তিগুলো সম্পাদনের সময় পর্যালোচনার মাধ্যমেই যথেষ্ট স্পষ্ট।

কিছুটা বিস্ময়করভাবে এক-এগারো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি ভারতের সাথে আওয়ামী লীগসহ আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার সম্পর্কের নানা প্রকার সংযোজন-বিয়োজনের এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। প্রথমেই যে বিষয়টি রাজনৈতিক বিশে-ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাংলাদেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারত সরকারের তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। সার্কের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার

www.pathagar.com

প্রধান শীর্ষ সম্মেলনে চেয়ারপারসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতিরেকেই ভারত সোৎসাহে দিলি- সম্মেলনের আয়োজন করেছে। অথচ ইতোপূর্বে সার্কভুক্ত অন্য রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে সম্মেলনের সময়সূচী পরিবর্তন, এমনকি নির্ধারিত সম্মেলন বাতিল করার মতো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ভারত সরকার একাধিকবার গ্রহণ করেছে। এদিক দিয়ে ভারত সরকারের এবারের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত উষ্ণ এবং বন্ধুবৎসল ছিল এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সমর্থিত জরুরি সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে আওয়ামী লীগ নেত্রীসহ অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা অভিযুক্ত হলেও ভারত সরকার এ জাতীয় অভিযানকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন প্রদান করেছে। শুধু শেখ হাসিনার স্বল্পকালীন লন্ডন নির্বাসনকালীন সময়ে তার সাথে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এবং ভারত সরকারের সাথে বিশেষ সম্পর্কটি পুনর্বার বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সব মিলিয়ে আগের তুলনায় আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের ক্ষমতাসীন দলগুলো এবং সংবাদমাধ্যমের সমর্থনে অন্তত বাহ্যিকভাবে এক ধরনের শীতল আচরণ সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নসের প্রকাশ্য ঘোষণা যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একযোগে কাজ করছে। এটি উপমহাদেশের রাজনীতিতে নতুন কোনো মেরুকরণের ইঙ্গিত বহন করে কি না তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে পারেন এবং এ নতুন মেরুকরণের ফলে হয়তো সংশি-ষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

এবার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তথাকথিত সংস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে সরকার পরিচালিত রাজনৈতিক সংস্কারের হালহকিকতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সংস্কার অন্তে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রধান দুই ধারাবহির্ভূত অন্তত আরো তিনটি নতুন রাজনৈতিক ধারা আবির্ভূত হতে পারে। সম্ভাব্য ধারা তিনটি যথাক্রমে সংস্কারপন্থী বিএনপি, সংস্কারপন্থী আওয়ামী লীগ এবং সব খুচরো দলের সমন্বয়ে আরো একটি তৃতীয় ধারা। তার অর্থ হচ্ছে আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের পোষ্য অথবা মক্কেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের একক অবস্থানের পরিবর্তে বাংলাদেশের কয়েকটি দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি। অভ্যন্তরীণ নীতিহীন রাজনীতিতে যেমন শেষ কথা বলে কিছু নেই, তেমনি পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রুর অস্তিত্ব ক্রমশ বিলীয়মান। মাত্র এক দশক আগেও বিশ্বে এমন পরিস্থিতি অকল্পনীয় ছিল যে, আমেরিকান রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরূপে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী পরিচিত হবেন। যা-ই হোক, উপমহাদেশের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের কাছে ভারতের একটি বেশ দীর্ঘ চাহিদা ফর্দ (shopping list) রয়েছে। এ ফর্দের মধ্যে উলে-খযোগ্য হচ্ছে - ট্রানজিট, ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ, তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো বন্ধকরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কথিত আন্তর্জাতিক ইসলামি সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসূচিতে সহযোগিতা এবং ভারতে বাংলাদেশীদের কথিত অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকারের সাথে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের সাম্প্রতিক বৈঠকের ফলাফল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা অনেকাংশেই জেনেছি। তবে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে সাধারণ বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার গভীরতা, দৃঢ়তা এবং সাধারণভাবে একটি স্বাধীনচেতা মানসিকতা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অন্তত ভারতের নিজ স্বার্থসংশি-ষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের কঠিনতম বাধা। প্রথম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ছাড়া বাংলাদেশের সবক'টি সংসদ নির্বাচনের ভোট প্রদানের ধারা বিশে-ষণ করলে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ভোটারের সংখ্যা এদেশে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ। অপরপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ধারা অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ভোটারের সংখ্যা সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৫৮ শতাংশ। কাজেই আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রচলিত দুই বিবদমান ধারার মধ্যে কোন বড় ধরনের বিবর্তন, বিভাজন অথবা বর্তমানে বহুল আলোচিত রাজনৈতিক সংস্কারের ফলে ভোটদাতাদের মন-মানসিকতার কোনো বৈপ-বিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে বাংলাদেশে গত তিন দশকের ভোট প্রদানের চরিত্র কার্যকরভাবে বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এ তথ্য ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, ১৯৮১ সালে দিলি- থেকেই দলীয় সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ২০০৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এ ২৬ বছরে আওয়ামী লীগ মাত্র একবারের জন্যই পাঁচ বছর ক্ষমতায় আসীন হতে সমর্থ হয়েছে। তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়ে বর্তমান সরকারের উৎসাহ কোনো গোপন তথ্য নয়। সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টা প্রায় প্রতিদিনই জনগণের দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সম্পর্কবিহীন কোনো এক সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। ইতোমধ্যে ২৬ জুন ১৫ দফা সংস্কারের যে রূপরেখাটি আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন তার মূল দফা হচ্ছে দলীয়ভাবে মাইনাস ওয়ান ফর্মুলাকে বৈধকরণ। সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটানোই সরকারেরও লক্ষ্য কি না - এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে।

বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রশ্নবিদ্ধ এ পদক্ষেপের মাধ্যমে সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তার কিছু সমর্থকসহ বিএনপিকে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া সর্বসমক্ষে শুরু করতে নিঃসন্দেহে সক্ষম হয়েছেন। যদিও সংবাদ সম্মেলনে যে স্বল্পসংখ্যক প্রাক-বিভক্ত বিএনপি'র নেতা উপস্থিত ছিলেন তাদের শারীরিক ভাষা দেখে অনুষ্ঠানটিকে কোনো যুগান্তকারী সংস্কারমূলক রাজনৈতিক সভার পরিবর্তে বরং একটি বিষণ্ন শোকসভা বলেই আমজনতার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার এ প্রকাশ্য উদ্যোগ কোনো বিশেষ বার্তা বহনের ইঙ্গিতবাহী হওয়ারও সম্ভাবনা প্রবল। 'স্বাধীনতা থেকে এক -এগারো' এবং পরবর্তী গন্তব্য' শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলাম যে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বার দশেক জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিকে বিভাজনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী এক-এগারোর পর থেকেই পর্দার অন্তরাল থেকে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নতুন দল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি জ্ঞাত না হলেও ২৬ জুনের উলি-খিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভাজনের যে আবার একটি

www.pathagar.com

সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, এ উদ্যোগের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার পাশাপাশি মান্নান ভূঁইয়া তথাকথিত একটি ভারতপন্থী বিএনপি'র জন্মদাতা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কি না? ভারতের স্বার্থেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রয়োজন, এ প্রকাশ্য বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের পছন্দের দিকটি তাদের সরকারের পররাষ্ট্র সচিব বেশ প্রাঞ্জল ভাবেই সবাইকে অবহিত করেছেন। মান্নান ভূঁইয়ার সংস্কারের মাইনাস ওয়ান রূপরেখা, ভারতীয় বিশেষ অতিথির বাংলাদেশ সফরকালে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন এবং সবশেষে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চরিত্রের ব্যাপারে শিব শংকরের প্রকাশ্য বিবৃতি, এতগুলো ঘটনাকে আর বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা অথবা বিশ্লেষণ করার কোনো সুযোগ রয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। বাংলাদেশের ১৫ কোটি স্বাধীন জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ রাজনৈতিক বিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখার এবং বোঝার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তবে মান্নান ভূঁইয়া এবং তার সমর্থকদের রাজনীতির নৈতিক দুর্বলতার দিকটি ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা অবস্থার মধ্যেই একটি বশংবদ কাউন্সিল আয়োজনের উৎসাহ প্রকাশের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিলে রাজনৈতিক মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম রাউন্ডে তিনি নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হয়েছেন। যা-ই হোক, বিএনপি'র নাম ব্যবহার করে বহুল আলোচিত পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো এক পক্ষের সংস্কারের প্রাথমিক রূপটি দেখার সৌভাগ্য তো দেশের মানুষের হলো। এখন প্রতীক্ষার পালা অন্যপক্ষ অর্থাৎ আওয়ামী লীগের মান্নান ভূঁইয়া কে বা কারা হচ্ছেন এবং তাদের নাটকটি কবে এবং কিভাবে মঞ্চস্থ হচ্ছে? খুচরা দলগুলোর কৌতুকপূর্ণ ভাঙা-গড়া, জোটবদ্ধ হওয়া, বহিস্কার করা ইত্যাদি কার্যক্রম আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানাবিধ পছন্দ-অপছন্দের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক, যার ইঙ্গিত সম্ভবত ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব ইতোমধ্যেই দিয়েছেন।

এক-এগারো সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে সাথে পুরো উপমহাদেশের জন্যই এক অজানা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। অনেক প্রকার সম্ভাব্য ভাঙা-গড়ার কথা ইতোমধ্যেই লিখে ফেলেছি। এখন দেখার বিষয় বিবিধ পুরনো এবং এখনো পর্যন্ত বিবর্তনশীল ধারাগুলো শেষ পর্যন্ত কী ধরনের পুনর্বিন্যাসের দিকে অগ্রসর হয়। পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্ট রাজনীতির চূড়ান্ত রূপের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের অভ্যন্তরীণ সরকার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর পক্ষাবলম্বন এবং প্রভাব বিস্তার। সে পরিবর্তিত অবস্থায় শেখ হাসিনা ভারতের ক্ষমতাসীন দলের সাথে তার ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের শক্তিতে নিজ দলে তার অবস্থান সংহত রাখতে পারবেন নাকি কৌশলগত কারণে ছোট বোন শেখ রেহানাকে নেতৃত্বে নিয়ে এসে নিজে সাময়িকভাবে হলেও পর্দার অন্তরালে চলে যাবেন, সেটিও নির্ভর করবে বর্তমান শাসকদের সামগ্রিক কৌশল এবং ভারতের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান উভয় প্রকার চাপ সহ্য করার ক্ষমতার ওপর। কোনো কোনো উপদেষ্টার বক্তব্য জনগণের কাছে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর মনে হলেও ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের চাহিদার ফর্দ

www.pathagar.com

পূরণ করার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই ভবিষ্যতে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বিদেশী স্বার্থের ধারক এক প্রখ্যাত আইনজীবী যতই এ সরকারকে সাংবিধানিক বৈধতার সার্টিফিকেট প্রদান করুন না কেন, সম্ভবত তিনিও জানেন যে, বর্তমান সরকারের বহুবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নানাবিধ বিতর্ক শেষে সাংবিধানিক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ক'দিন আগে এক ক্ষমতাশালী উপদেষ্টা সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাদেরও একটি রাজনীতি রয়েছে এবং তারা সেটি করছেনও। বর্তমান শাসকরা যে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক ভবিষ্যতকে বিপদমুক্ত রাখার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েই কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার দৃশ্যপট থেকে প্রস্থান করতে চাইবেন এটি না বোঝার কোনো কারণ নেই। যেকোনো যুক্তিবাদী নাগরিকের কাছেই শাসকদের এ প্রত্যাশাটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হবে এবং এ নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি থাকারও কথা নয়। তবে বাংলাদেশের সব স্বাধীনতাপ্রিয় জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত দাবি থাকবে যে, শাসকদের নিজস্ব প্রত্যাশা যেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে অতিক্রম না করে এবং উপমহাদেশের রাজনীতির পুনর্বিন্যাস শুধু বর্তমান সরকারের বিপদমুক্ত প্রস্থানের নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে রচিত না হয়। ২৫০ বছর আগে উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিদেশীদের কূটকৌশল ও দেশীয় মক্কেলদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অস্তমিত হলেও সে ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকেই বাংলাদেশের ছোটখাটো শারীরিক গড়নের সাহসী জনগণ বারবার প্রমাণ করেছেন যে, সময়ের দাবি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা কখনো ভুল করেন না। বাংলাদেশ থেকে সদ্য বিদায় নেয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস আমাদের ভবিষ্যত বিপদের বিষয়ে যতই সাবধানবাণী উচ্চারণ করুন না কেন, ইনশাআল্লাহ্ সব চক্রান্তকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা এবারো সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে যে জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে তারা জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

০৭.০৭.০৭

www.pathagar.com

দিশাহীন যাত্রা

প্রায় তিরিশ বছর আগে সাহিত্যিক অতীন বন্দোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস 'অলৌকিক জলযান' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল এমন একটি ভাসমান জাহাজের বর্ণনা দিয়ে যার ক্যাপ্টেনসহ সবাই মৃত। আর দিকভ্রষ্ট জাহাজটি সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিল এক বিশাল কফিনের মতো। উপন্যাসটির শেষ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করলে পাঠকরা উপলব্ধি করবেন কী কারণে সেই যুবক বয়সে পড়া এক উপন্যাসের প্রসঙ্গ দিয়ে আজকের নিবন্ধ শুরু করছি।

'সিউল-ব্যাংক জাহাজ নীল আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে কখনো অন্ধকারে অথবা সাদা জ্যোৎস্নায় অজানা সমুদ্রে এভাবে ভেসে যাচ্ছিল। তার প্রিয় ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস্ ভেতরে শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ওর শরীর ঢাকা। পোর্টহোলে তেমনি সূর্যের আলো, কখনো সমুদ্রের জল, কখনো নক্ষত্রমালার ছবি। অসীম সমুদ্রে সিউল-ব্যাংক এখন একটা ভাসমান কফিনের মতো। নীল আকাশের নীচে, নীল অন্ধকারে সাদা জাহাজটা শুধু একজন ক্যাপ্টেনের কফিন। আর কিছু না। ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস্ যেন ভেতরে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন। ভেসে যাচ্ছেন তার প্রিয় অলৌকিক জলযানে।'

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিপ-বী উদ্দীপনা নিয়ে একতাবদ্ধ হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মহান আকাংখা হৃদয়ে ধারণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্রটি কাকতালীয়ভাবে একটি আমবাগানে গৃহীত হয়েছিল, সে ঘোষণাপত্রেও আশা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হবে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকারের ওপর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত বাংলাদেশের কল্পিত চিত্রের সাথে এ ২০০৭ সালের বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা তুলনা করলে যেকোনো বাংলাদেশীর হৃদয় আশাভঙ্গের বেদনায় কিছুটা হলেও ভারাক্রান্ত হতে বাধ্য। এ দীর্ঘ ৩৬ বছরে বাংলাদেশ যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগোয়নি, তা নয়। গত ছয় মাসে আমারই লেখা একাধিক নিবন্ধে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর অর্জনগুলো একেবারে কম নয়। কিন্তু দুঃখবোধটা অন্যখানে। ছোটখাটো গড়নের ১৫ কোটি কর্মঠ, উদ্যমী ও পরিশ্রমী মানুষের এ দেশটি কোনো এক অভিশাপে গড়া ও ভাঙার এক মন্দ আবর্ত থেকে যেন কিছুতেই বের হতে পারছে না। স্বাধীনতার পর থেকেই সর্ব ক্ষেত্রে না ভেঙে শুধুই নির্মাণ করে যাওয়ার একটি নীতিকে জাতীয় চরিত্রে পরিণত করতে পারলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন যে আমাদের সব প্রত্যাশাকেই হার মানাতো, তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। অর্থনীতি, সমাজ উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি এবং তার সুষম বন্টনসহ সব ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা ও

www.pathagar.com

প্রাপ্তির মধ্যে দেশে বড় ধরণের ফারাক থেকে গেছে। বর্তমান নিবন্ধে গণতন্ত্র এবং অর্থনীতি শুধু এ দু'টি বিষয় নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি।

রাজনীতিই যেহেতু এখন সব সংবাদমাধ্যমে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়, তাই গণতন্ত্রকে ভাঙা-গড়ার প্রাসঙ্গিক ইতিহাস দিয়েই শুরু করি। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায়ই উলে-খ করা হয়েছে, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সংক্রান্ত, সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ ও গৃহীত হয়েছিল ঃ

'অনুচ্ছেদ-১১ ঃ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার - প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হইবে।'

সংবিধান নির্ধারিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রথমবারের মতো ভাঙার কাজটি মরহুম শেখ মুজিব নিজ হাতেই সম্পন্ন করেছিলেন চরম স্বৈরতান্ত্রিক, একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে প্রচন্ডভাবে বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর তৎকালীন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সব প্রতিবাদের সুযোগ রুদ্ধ করতে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি গৃহীত চতুর্থ সংশোধনীতে সংবিধানের উপরোলি-খিত অনুচ্ছেদ ১১ থেকে নিম্নবর্ণিত অংশটুকু বাদ দেয়া হয়। 'এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হইবে।'

জনগণের অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রের যে ধারা আমরা ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে প্রথম সংবিধান গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে শুরু করেছিলাম সে ধারা ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ অর্থাৎ মাত্র সোয়া দুই বছরের মধ্যে নিজেরাই রুদ্ধ করলাম। তারপর সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারায় আবার প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের দীর্ঘ ১৬টি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বহু রক্তপাত, একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান, অগণিত মানুষের প্রাণহানিসহ, সুদীর্ঘ সংগ্রাম শেষে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী আইন গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ১৯৭২ সালের প্রথম সংবিধানে বর্ণিত অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদ নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়।

"২। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া অভিহিত) - এর ১১ অনুচ্ছেদের 'নিশ্চিত হইবে' শব্দগুলির পর 'এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।"

বর্তমান বছরের ২২ জানুয়ারির নির্ধারিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের মাধ্যমে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থাকে পুনর্বার বাধাগ্রস্থ করলাম। ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলো, তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অতি অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রসহ সংশি-ষ্ট রাষ্ট্রগুলো ও জাতিসংঘকে নিতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র প্রথম তিন বছর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পর দীর্ঘ ষোল বছর বিভিন্ন রূপে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে দেশ পরিচালিত হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশে তৃতীয়বারের মতো গণতন্ত্র আবার কবে থেকে এবং কী রূপে চর্চা

www.pathagar.com

করতে পারব, তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতির যেমন অনেকগুলো ঋতু থাকে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে যা চলছে তাকে 'সংস্কার ঋতু' নাম প্রদান করলে খুব একটা আপত্তি ওঠার কথা নয়। আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে যতই ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করুন না কেন, চলমান সংস্কার ঋতুর একটি সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের বিষয়ে দেশবাসীর খুব আশ্বস্তবোধ করার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতির আপন নিয়মেই হেমন্তের শেষে বৃক্ষরাজি পত্রশূন্য হয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে থাকে ডালপালাসহ শুধু কাণ্ডটি। সে রকম 'সংস্কার ঋতু' শেষে গণতন্ত্রের গাছটিকে কী রূপে আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাবো, তার কোন ছবি এ মুহূর্তে শাসকদের মধ্য থেকে কেউ কি এঁকে দিতে পারবেন? উপদেষ্টা মহোদয়মন্ডলী এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশনাররা একবার বলছেন, ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলে রাজনীতিবিদদের সাথে নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজে পর্যন্ত বার দুয়েক সরকারের কাছে ঘরোয়া রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেয়ার আনুকষ্ঠানিক অনুরোধও জানিয়েছেন। মাঝখানে একই ব্যক্তি আবার বললেন, ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা অবস্থাতেও সংস্কার আলোচনা পুরোমাত্রায় চলা সম্ভব। তো এ 'বোধি' প্রাপ্ত হতে এত প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষতার দাবিদার কমিশনারদের প্রায় তিন মাস সময় কেন লাগল, সে প্রশ্ন তুললে তারা নিশ্চয়ই অতিশয় বিরক্ত বোধ করবেন। নির্বাচন কমিশনাররা আগে বহুবার বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রধান মক্কেল। সময় সুযোগমতো এখন তারাই বলছেন, নির্বাচনের সব বিষয়ে তাদেরই বর্ণিত প্রধান মক্কেলের সাথে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমানে রাজনৈতিক দলে সংস্কার প্রক্রিয়াই আবার নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় প্রধান বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কমিশনারদের বক্তব্য অনুযায়ী, সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কিছুতেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত প্রতিনিধিদের চিহ্নিত করতে পারছেন না।

বেচারাদের আর দোষ কী? দেশের জনগণই কি জানে যে, শেষ পর্যন্ত সংস্কারের ফল হিসেবে কতগুলো ব্র্যাকেটবন্দী 'প্রধান' দলের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। এক আওয়ামী লীগের সংস্কার প্রস্তাবক হিসেবেই যে আমরা কতজনকে সংবাদমাধ্যমে এ পর্যন্ত দেখলাম, সেটিইতো মনে রাখতে পারছি না। বিএনপিতে তবু অদ্যাবধি মান্নান ভূঁইয়া একাই তার বাড়ির ড্রয়িংরুম বেশ গরম করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত রাজনীতির ময়দান গরম করার যোগ্যতা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা তার আছে কি না, সেটি অবশ্য ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে। ওদিকে আবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বর্ণিল চরিত্র এরশাদের নাটকের তো কখনোই কোনো অন্ত থাকে না। আসলে কে যে পুতুল আর কে যে সে পুতুল অন্তরাল থেকে নাচায়, সেটি নিয়েই দেশবাসীর ধাঁধা কাটছে না। এর মধ্যেই ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সেদেশের রাষ্ট্রদূত আমাদের নাকের ডগায় বসেই সদম্ভে জানিয়ে দিয়ে গেছেন, বাংলাদেশের কোন চেহারাটা ভারত সরকার গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে। তাদের এ কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত কথাবার্তার কোনো প্রতিবাদ কী কারণে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং তার মন্ত্রণালয় করতে ব্যর্থ হলো তাও দেশবাসীর কাছে এক গভীর রহস্য। স্বাধীন দেশ থেকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক কোনো বৃহৎ শক্তির প্রদেশে পরিণত হয়েছে, এমন কোনো তথ্য দেশবাসী এখনো পায়নি। স্বাধীনতার পর বিগত ৩৬ বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোন সরকারের কোন স্তরের প্রতিনিধি কখনো আমাদের প্রত্যাশিত ভারত সরকারের চরিত্র সম্পর্কে

www.pathagar.com

বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে কি? নাকি আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে ভারতের দক্ষিণ এশিয়ার যেকোনো রাষ্ট্রের ওপর খবরদারি করার অধিকার বাকি রাষ্ট্রগুলোকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে? প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তার সুযোগ যে যেমন করে পারছে নিতে শুরু করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের সরকার নির্বাচন করার অধিকারবিহীন অবস্থা দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না এটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। যাই হোক সব মিলিয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একাধিক ভাঙা-গড়ার পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা পুনর্বার নতুন করেই যে শুরু করতে হবে এটি মেনে নেয়া ছাড়া আপাতত জনগণের কোন গত্যন্তর নেই।

গণতন্ত্রের পর এবার অর্থনীতি প্রসঙ্গ। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন এবং সার্বিক অর্থে অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে অনেকাংশে উদ্দীপ্ত করেছিল। কাজেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাড়ে সাত কোটি জনগণ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ারও স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করেই সশস্ত্র লড়াই করেছিল। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের ক্ষমতা গ্রহণকারী আওয়ামী লীগের অদক্ষতা, ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণতার সাথে বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলিত হয়ে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে চরমভাবে দুর্বল করে দেয়। ১৯৭৪ সালের নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। উপমহাদেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের লিখিত 'Poverty and Famines' গ্রন্থে ১৯৭৪ সালের সে দুর্ভিক্ষের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। সে মর্মান্তিক এবং অসহনীয় সময়ের অবস্থা উপলব্ধির জন্য প্রফেসর সেনের লেখা থেকে পাঁচটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে উদ্ধৃতি করছি ঃ

1. The price of rice rocketed during and immediately after the floods. In some of the most affected districts, the rice price doubled in the three months between July and October. Reports of starvation could be heard immediately following the flood, and grew in severity.

(বন্যাকালীন এবং তার অব্যবহিত পর চালের মূল্য রকেটের গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জুলাই থেকে অক্টোবর এ তিন মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে চালের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। বন্যার সাথে সাথেই অনাহারের সংবাদ আসতে শুরু করে এবং দ্রুত তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে।)

2. Mortality estimates vary widely. The official figure of death due to the famine is 26,000. Other estimates indicate much higher mortality, including the estimation that in Rangpur district alone 80 to 100 thousand persons died of starvation and malnutrition in 2-3 months.

(মৃতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দুর্ভিক্ষে ২৬ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অন্যদের হিসাবে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। একমাত্র রংপুর জেলায় বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ মানুষ অনাহারে এবং অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করে।)

www.pathagar.com

3. There is little doubt that the government of Bangladesh found itself severely constrained by the lack of an adequate food stock, and that this prevented running a larger operation at the height of the famine. ... In fact, in the crucial months of September and October the imports fell to a trickle, and the amount of food grains imported during these two months, rather than being larger, was less than one-fifth of the imports in those months in preceding year.

(এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সরকার পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদের তীব্র অভাব অনুভব করছিল এবং এ কারণে আরো ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। ... প্রকৃতপক্ষে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে খাদ্য আমদানির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। আমদানি বৃদ্ধির পরিবর্তে ১৯৭৪ সালের ওই দুই মাসে তার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় খাদ্য আমদানীর পরিমাণ এক পঞ্চমাংশেরও কম ছিল।)

4. It is worth mentioning in this context that Bangladesh, like many other countries in the world, had been receiving regular food aid from the United States. But the US food aid came under severe threat precisely at this point of time, since the United States decided to seek stoppage of Bangladesh's trade with Cuba.

(উলে-খ্য, বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এ সংকটময় সময়েই কিউবার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে খাদ্যসাহায্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।)

5. It is, however, necessary to consider the possibility that the decline in food availability was a regional one, and that it could not get sorted out within Bangladesh because of problems of food movement including the inter-district barriers imposed officially.

(অপর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তির সমস্যাটি যে অঞ্চলভিত্তিক ছিল, এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। আন্তঃজেলা খাদ্য সরবরাহের ওপর সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হয়নি।)

প্রথম তিনটি এবং পঞ্চম এ চারটি উদ্ধৃতি থেকে সে বছর বন্যার ভয়াবহতার কারণে চালের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, অনাহারে মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা এবং ত্রাণ ও খাদ্য পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অমার্জনীয় অদক্ষতার চিত্র পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। আর চতুর্থ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কৌশলের কাছে মানুষের প্রাণের মূল্য সর্বদাই কতটা তুচ্ছ বিবেচনা করা হয়। সেই সময় কিউবার সাথে বাণিজ্যের অপরাধে একদিকে নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে সে সরকারেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে আখ্যায়িত করে বিদ্রূপ করছেন এবং বিশ্বের কাছে হেয় করছেন। ৩২ বছর পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী এবং দ্বিমুখী আন্তর্জাতিক নীতিতে যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তা বিশ্ববাসী আফগানিস্তান এবং ইরাকে প্রত্যক্ষ করছে। তবে একই সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং দক্ষিণ এশিয়াসংক্রান্ত

www.pathagar.com

মার্কিন নীতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭৪ সালে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক এবং বাণিজ্য নীতিনির্ধারকদের মধ্যে উলে-খযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন বর্তমানে সিপিডি প্রধান প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং ওই সময় বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধে প্রফেসর রেহমান সোবহান সোভিয়েট-ভারত অক্ষশক্তির পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অথচ এ ২০০৭ সালের বাংলাদেশে যে তথাকথিত সুশীল(?) সমাজকে ক্ষমতাসীন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো সবরকম কৌশল অবলম্বন করে চলেছে সে বিশেষ সমাজের তাত্ত্বিক গুরু হিসেবেও দেশবাসীর কাছে একই প্রফেসর রেহমান সোবহানই আবির্ভূত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তথাকথিত শীতল যুদ্ধ চলাকালীন ভারত সর্বদা সোভিয়েট ইউনিয়নকেই সমর্থন দিয়েছে এবং বাংলাদেশের ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত পট পরিবর্তনের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়ন এবং ভারতের মূল্যায়ন একেবারেই আলাদা ছিল। সে অনিবার্য এবং দুঃখজনক পট পরিবর্তনের একজন সামরিক কুশীলবকে বিচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ৩২ বছর পর বাংলাদেশে এসে সরকারের কাছে হস্তান্তর করে যাচ্ছে এও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক উষ্ণ হতে শুরু করে। আর ২০০১ সালের নয়-এগারোর টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনা বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনের পাশাপাশি উপমহাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ভারসাম্যেও বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা যে ক্রমেই ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অধিকতর মূল্য দিচ্ছে সেটি বাংলাদেশে ২০০৬ সালের অক্টোবর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রমাণিত।

যা-ই হোক, ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০৭ এ দীর্ঘ ৩৩ বছরে কিসিঞ্জারের বর্ণিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আজ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে সমাজতন্ত্র পরিত্যাজ্য হয়েছে, মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, বিশ্বায়নকে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই বিবেচনা করা হচ্ছে। দেশীয় অর্থনীতির অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যেও একটি শিক্ষিত এবং তরুণ উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে উঠেছে, বেসরকারি খাত শক্তিশালী হয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বেগবান হয়েছে। বিভিন্ন কারণে কৃষিতে কিছুটা স্থবিরতা বিরাজ করলেও মূল্যসংযোজিত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিগত তিন-চার বছরে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ এখন শিল্প খাত থেকে আহরিত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে যেখানে দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, ২০০৭ সালে তা উলে-খযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৫০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। সম্পদের সুষম বন্টন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে দেশে দারিদ্র্যের হার বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৯ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে একটি শিল্পমুখী ধারা, সেটি শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনায় ধীরে হলেও প্রবাহিত হতে যে শুরু করেছে, তা নৈরাশ্যবাদীরাও হয়তো স্বীকার করবেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামগ্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেগবান অর্থনীতির অগ্রহণযোগ্য উপসর্গ হিসেবে অবশ্য দুর্নীতির আগ্রাসী ও কুৎসিত চেহারাটিও আমরা আগের তুলনায় অধিক মাত্রায় দেখতে পাচ্ছি।

www.pathagar.com

ভালো-খারাপ মিলিয়ে দেশের এমনই এক মিশ্র পরিস্থিতিতে এক-এগারো বিগত ১৬ বছরের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে। ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত এবং ১৯৯০ সালের তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতির জন্য ইতোমধ্যেই ইতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের দুঃসহ স্মৃতি যখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম এবং একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির পর দীর্ঘ মেয়াদে দেশজ টেকসই উন্নয়নের প্রক্রিয়া নিয়ে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক শুরু করেছিলাম, সে রকম একটি সময়ে এক-এগারো আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে একটি বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দিয়েছে। অর্থনীতির এ থমকে যাওয়া কী স্বল্পমেয়াদের জন্য নাকি ১৯৭৫ কিংবা ১৯৯১-এর মতো আবার আমাদের শূন্য ভান্ডার থেকে শুরু করতে হবে এ প্রশ্নের বাস্তবভিত্তিক জবাব পাওয়ার জন্য সম্ভবত বছরখানেক অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশের অর্থনীতির এক বছরের জন্য থমকে যাওয়ার সুদূরপ্রসারী ফলাফলটি কতখানি বিপর্যয়কর হতে পারে তা আশাকরি বর্তমান শাসকরা উপলব্ধি করেন। বাংলাদেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি যে আমাদের প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলোর আকাংখার বিষয় হতে পারে না এ কঠিন সত্যটিও তাদের উপলব্ধি করা আবশ্যক।

মাঝে মধ্যেই মাননীয় উপদেষ্টাদের বক্তব্যে একাধারে ভীত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। সম্প্রতি একজন উপদেষ্টা বলেছেন যে, দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্ব নাকি সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য অপেক্ষাকৃত শুভ লক্ষণ। আমার সীমিত জ্ঞানে যেকোনো দেশের জন্যই দুর্বল নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবেই অগ্রহণযোগ্য। আর বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌমত্ব রক্ষার মূল দায়িত্বটি বিবেচনায় নিলে তো রীতিমতো বিপজ্জনক এক সম্ভাবনা। ক'দিন আগে পত্রিকার পাতায় ভাত চুরির অপরাধে এক ন্যাড়ামাথা বালকের অপমানিত মুখের ছবি দেখে কষ্ট পেয়েছি। নিশ্চয়ই এ বাংলাদেশ দেখার জন্য আমাদের মহান শহীদরা তাদের জীবন বিসর্জন দেননি। নিবন্ধটি একটি জাহাজের প্রতীকী গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। দেশে বর্তমানে সংস্কারের অনিশ্চয়তা, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা, সরকারের সঠিক চরিত্র ও সময় নির্ধারণে অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। একটি দেশ চারিদিক থেকে এত অনিশ্চয়তায় ভারাক্রান্ত হলে সে দেশটি সময়ের প্রবাহে ভাসমান একটি দিকভ্রষ্ট জাহাজের সাথেই শুধু তুলনীয়। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা এবং অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের এমন পরিণতি জনগণ কখনোই প্রত্যাশা করে না। সে সাথে একটি অতিরিক্ত আশা করব যে, শাসকরা কেউই 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসের ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস হতে চাইবেন না।

১১.০৭.০৭

www.pathagar.com

সহস্রাব্দের দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশের জন্য সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা যখন নির্ধারণ করা হয় সে সময় দেশে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন দিক থাকলেও দারিদ্র্যবিমোচন প্রসংগেই এ নিবন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ৫০ শতাংশ হ্রাস করে হিসাব প্রক্রিয়ার প্রকারভেদে সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের সময় প্রধানত দেশীয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে একটি দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত হয়, যা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আগেও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এক-এগারোর পর থেকে দেশ একটি বিশেষ ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে, যার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও অনেক ধরনের প্রশ্ন চারদিকে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। সেনাবাহিনী সমর্থিত বর্তমান সরকার একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেও ইতোমধ্যেই ২০০৮ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। আইনপ্রণেতারা যখন সংবিধানের ৫৮-খ ধারা সন্নিবিষ্ট করার মাধ্যমে দেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রীতি প্রচলন করেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই দুই বছর মেয়াদি কোনো অনির্বাচিত সরকারের সম্ভাবনার কথা তাদের মস্তিষ্কে উদিত হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের পাঁচ বছর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকার মেয়াদ রয়েছে। সে তুলনায় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর মেয়াদ যথেষ্ট দীর্ঘই বিবেচনা করতে হবে এবং এ কারণেই সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কার্যক্রমের দায়িত্ব অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বর্তমান সরকারের ওপরও বর্তাচ্ছে। এ তথ্যটি সবারই জানা যে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে প্রায় ১ হাজার জনের বসতিবিশিষ্ট আমাদের এ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, জাপান ও রাশিয়ায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে ৩১, ৩২৯, ১৩৬, ৩৩৭, ও ৯ জন লোক বসবাস করে। রীতিমতো আতংকিত হওয়ার মতো তুলনামূলক পরিসংখ্যান। আরো ভীতিকর ঘটনা হচ্ছে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হারও উলি-খিত পাঁচটি দেশের চেয়ে অনেক বেশি। ২০০১ থেকে ২০০৬ এ পাঁচ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার গড়ে প্রতি বছর ১.৮ শতাংশ হারে কমা সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ নর-নারী এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। একটি দেশের তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকলে সে দেশ থেকে সামাজিক অস্থিরতা এবং আর্থিক দুর্নীতি যেমন দূর করা সম্ভব নয়, তেমনি নাগরিকের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অসম্ভব। কাজেই দেশের সব শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর স্বার্থেই দারিদ্র্য বিমোচন আমাদের সব সরকার, রাজনৈতিক দল এবং সব কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কোন কৌশল অবলম্বন করলে স্বল্পতম সময়ে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে, তা নিয়ে

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিতর্ক রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের যে পদ্ধতিগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক হয়েছে বা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বর্ধিতকরণ, কর্মসংস্থান এবং পরিশেষে বহুল আলোচিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। আমি পেশায় অর্থনীতিবিদ নই। তবে প্রায় ৩০ বছর ধরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে একজন পেশাজীবী হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করি যে দীর্ঘমেয়াদে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র কার্যকর কৌশল হচ্ছে দেশের কর্মক্ষম মানুষের জন্য কাজের সংস্থান করা।

২০১৫ সালের মধ্যে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে আগামী ৮ বছরে দেশের অন্তত ১৮ শতাংশ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার নিচে নামিয়ে আনতে হবে। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত অর্জিত দারিদ্র্য বিমোচনের হার অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলে ২০১৫ পর্যন্ত দেশের অতিরিক্ত ১৪ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। আর শতভাগ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচনের হার বর্তমানের বার্ষিক ১.৮ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। নিঃসন্দেহে যেকোনো সরকারের জন্যই এটি একটি অতি উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা। বিষয়টিকে আরেকটু প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ১৫ কোটি ধরা হলে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বছরে অতিরিক্ত ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার কিংবা পরিবারপ্রতি ছয়জন সদস্য বিবেচনা করলে ৫ লাখ ৬২ হাজার পরিবারের দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। এ হিসাবের মধ্যে আগামী আট বছরে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটবে সেটিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। সব মিলিয়ে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। আরেকটি পরিসংখ্যান এ আলোচনায় পাঠকদের কাছে যথেষ্ট প্রাসংগিক মনে হবে। কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত যথাক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ২১, ৩০ এবং ৪৯ শতাংশ সরবরাহ করছে। কিন্তু শ্রমশক্তির খাতওয়ারি বিশে-ষণে দেখা যাচ্ছে, উপরোলি-খিত তিনটি খাতে ৪৮, ১৭ এবং ৩৫ শতাংশ কর্মী নিয়োজিত আছে। খাতভিত্তিক শ্রমিকের হারের এ হিসাবের মধ্যে বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত শ্রমশক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতীয় আয় এবং শ্রমশক্তি ব্যবহারের হিসাব থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে কৃষি আশংকাজনকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। সুতরাং কৃষিকাজে যেসব শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন তাদের জন্য অধিকতর উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষির সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে অগ্রজ নিবন্ধকার এবং সুহৃদ ফরহাদ মজহার দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এবং নিয়মিত লিখছেন। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বিধায় এবং এ নিবন্ধের মূল বিষয়ও ভিন্ন হওয়ার কারণে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় নিয়ে লেখার ভার প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের ওপরই রাখলাম।

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল প্রসংগে আবার ফিরে আসি। আগেই বলেছি, আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই বেসরকারি খাতনির্ভর হয়ে উঠেছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। এ সময়ের মধ্যে সরকারি খাতে কর্মসংস্থান ক্রমাগতভবে কমেছে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই

www.pathagar.com

বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান প্রধানত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য এখন পর্যন্ত শ্রমশক্তির একটি দীর্ঘমেয়াদি বাজার চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারিনি অথবা সেরকম কোনো বাস্তবধর্মী চেষ্টাও দৃশ্যমান হয়নি। ২০১৫ সালে পা রাখতে আর মাত্র আট বছর বাকি রয়েছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি মূল লক্ষ্য আর কোনো রকম সময়ক্ষেপণ ব্যতিরেকেই নির্ধারণ করা উচিত। প্রকৃত সাক্ষরতার হার অন্তত পক্ষে ৯০ শতাংশ অর্জন, কার্যকর ও সমতাভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিল্প খাতের প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক মানব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, কৃষি শ্রমিকের অধিক উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের বিস্তার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ এ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পূর্বতন সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে একটি কৌশলপত্র তৈরি করে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিজনিত বাস্তবতার নিরিখে এ দলিলটির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন-পরিমার্জন সম্পন্ন করে অতি দ্রুত বাস্তবায়ন পর্ব শুরু না করলে সহস্রাব্দের লক্ষ্য অধরাই থেকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

বাংলাদেশের ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রথমেই শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ সালের মানবসম্পদ উন্নয়ন অংশে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, 'এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জন তথা দেশের হতদরিদ্র লোকের সংখ্যা কাংখিত মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই।' কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান শুধু বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য অর্জন কখনো সম্ভব হবে না। বর্তমানে আমাদের দেশে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান। সরকারি, বেসরকারি, সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। এর ফলে একটি শিশু তার পরিবারের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের শুরু থেকেই সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি সুস্থ এবং সৃজনশীল বিতর্কের আয়োজন এবং সে বিতর্কের সারমর্ম থেকে রাষ্ট্রের খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য বিতরণ করা যেতে পারে। সমস্যা হলো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে সঠিক পরিসংখ্যানের এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমান সরকারের অর্থ উপদেষ্টা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের অনেক পরিসংখ্যানই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়োপযোগী শিশু ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ কিংবা দেশে সাক্ষরতার হার ৬৩ শতাংশ, সরকারের এজাতীয় দাবি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে জনমনে সংশয় থাকতেই পারে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিকে একটি একমুখী, সমতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর প্রচেষ্টা বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত স্থগিত করতে হয়।

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টাসহ বর্তমান সরকারের অন্যান্য উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অব্যাহতভাবে এটিকে সংবিধানসম্মত একটি তত্ত্বধায়ক সরকাররূপে অভিহিত করে চলেছেন। তাদের এ দাবি ভবিষ্যতে সরকারকে বড় ধরনের আইনগত সমস্যায় ফেলতেও পারে। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৫৮-ঘ ধারা এ ধরনের সরকারের কার্যাবলি কোনো রকম নীতিনির্ধারণী কার্য সম্পাদন ব্যতীত শুধু দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বিগত ছয় মাসের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন বিষয়ে সরকার সাংবিধানিকভাবে প্রদত্ত তার কার্যাবলি পালনের সীমা ইতোমধ্যেই যে বহুবিধভাবে লংঘন করেছে, তা দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এখন এ অসংগতিগুলো ভবিষ্যতে কী পদ্ধতিতে আইনগতভাবে বৈধতাপ্রাপ্ত হবে, সেটি সরকার, রাজনীতিবিদ, সংসদ ও আদালতের বিষয়। আসল কথা হলো, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকরা সীমা লংঘন যখন করেই ফেলেছে তখন দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কল্যাণকর আরো কিছু কাজ তাদের নিজ স্বার্থেই সম্পন্ন করা উচিত। জনগণের জন্য সার্বিকভাবে হিতকর এসব কর্ম সম্পাদন করলে ভবিষ্যতে সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমের বৈধতাপ্রাপ্তির দাবি হয়তো নৈতিকভাবে জোরদার হতে পারে। শুধু ক্ষুদ্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে 'সংস্কার' সাধনে মনোযোগী থাকলে শেষ পর্যন্ত বৈধতাপ্রাপ্তির বিষয়টি জটিল হয়ে সম্পূর্ণ প্রস্থান পর্বটিই সুখকর নাও হতে পারে। যে ভালো কাজগুলো জরুরি সরকারের অন্যান্য সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাকে আড়াল করতে পারে তার মধ্যে যুগোপযোগী, কর্মসংস্থানমুখী, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন অন্যতম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি এখানে উলে-খ করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে অপ্রিয় হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করছে, এ তথ্যটি বিস্মৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তদুপরি, বাংলাদেশে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ণ নিয়েই যে বিতর্ক রয়েছে, তা নয়। এ বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কওমি, আলিয়া, হাফিজিয়া ইত্যাদি শিক্ষার মধ্যে আবার বিভাজন রয়েছে। অন্যান্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও এ জাতীয় সমস্যা ছিল এবং আছে। মালয়েশিয়া এর সমাধান করেছে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে একটি অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে। মিসরে ধর্মীয় ও বিজ্ঞানশিক্ষার সমন্বয় করে আধুনিক আল-আজহার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্তানে সাম্প্রতিককালে লাল সমজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিটের রক্তক্ষয়ী আক্রমণের মধ্য দিয়ে সেদেশে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার গভীরতা ও জটিলতা আরো একবার প্রমাণিত হয়েছে। আমাদেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সম্ভবত যেকোনো রাজনৈতিক সরকারের পক্ষেই এ সম্পর্কে কোনো সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ। এ ধরনের জটিল অথচ আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্তমান সরকারের অধিকতর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টিও সরকারের মনোযোগ দাবি করে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের একটি বৃহৎ অংশই অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সংগত কারণেই তাদের বেতন-ভাতাও তুলনামূলকভাবে বেশ কম। উপযুক্ত শিক্ষা এবং

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ প্রদান করে এ শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে তারা বিদেশে উচ্চ বেতন লাভ করতে সক্ষম হতো এবং দেশে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতো। সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য লাগসই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকার দ্রুত একটি শিক্ষা কমিশন গঠনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে। বর্তমান শাসকদের এ জাতীয় পরামর্শ দিতেও আবার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। কারণ এদের সর্ববিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক সুশীল(?) সমাজের দ্বারস্থ হওয়াটা প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।

বাজার চাহিদাভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে অধিক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, এ প্রধান দুটি লক্ষ্য থেকে নীতিনির্ধারকদের বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সরকার পরিচালনার সাম্প্রতিক ধারা অনুযায়ী সরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ অতি দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। সরকারি মালিকানাধীন শিল্পকারখানা এবং করপোরেশনগুলোয় শ্রমিক, কর্মচারী ছাঁটাই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে, সরকারি প্রশাসনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার গতিও অত্যন্ত ধীর। সরকারের পক্ষে যে আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এ বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে হবে। সুতরাং সরকারের যেটি দায়িত্ব তা হলো বেসরকারি খাতে অধিক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আত্ম-কর্মসংস্থান নিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন উদ্যোক্তার দক্ষতা, পুঁজি, অবকাঠোমো এবং বাজার চহিদা। ১৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে বাজার চাহিদার অভাব হওয়ার কথা নয়। বাস্তবভিত্তিক মানব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এরপর বাকি থাকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং পুঁজির ব্যবস্থা করা। অবশ্য বাংলাদেশে বিভিন্ন এনজিও নানা ধারনের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে কর্মরত থাকায় পুঁজির প্রবাহ আগের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এটিও সত্যি যে, এনজিও কর্তৃক সরবরাহকৃত এ পুঁজির সুদের হার অধিক হওয়ায় এজাতীয় পুঁজি গ্রহণ উদ্যোক্তার ব্যবসাকে ব্যয়বহুল করে। কাজেই তুলনামূলক কম সুদে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারেরই করা উচিত, যাতে করে আত্ম-কর্মসংস্থানের কোন উদ্যোগ পুঁজি কিংবা পুঁজির উচ্চমূল্যের কারণে বিঘ্নিত না হয়।

এক-এগারোর সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর যেসব কঠিন সর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি যেমন গ্রামীণ বাজার উচ্ছেদ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হকার উচ্ছেদ ইত্যাদি আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্যোগকে সহযোগিতা প্রদানের পরিবর্তে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শাসকরা বুঝতে পেরেছেন কি না জানি না, তবে এ ধরনের অনভিজ্ঞতা এবং অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপের নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। ৯০-এর দশক থেকেই বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে এবং বর্তমানে বেসরকারি খাতই প্রধানত চাকরির বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। বেসরকারি খাতের শিল্প ও সেবা উভয় অংশেই চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে শিল্প খাতেই অধিক সংখ্যায় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রণীত ২০০৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায়ও স্বীকার করা হয়েছে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২-০৩ সাল থেকেই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প উভয় শ্রেণীতেই অব্যাহতভবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে এ প্রবৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সাম্প্রাতিক বছরগুলোতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাবেক সরকারের এ সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য বর্তমান সরকারও তাদের প্রণীত প্রথম অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বেসরকারি খাতের অবদানকে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করেছে : 'সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠা এবং শিল্পকারখানাকে লাভজনকভবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালানার ক্ষেত্রে বহু গঠনমূলক এবং যুগোপযোগী সংস্কারসাধন করে বাণিজ্য উদারীকরণ করেছে, যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা লাভজনকভাবে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ফলে অধুনা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অবদান উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

খুবই ইতিবাচক এবং যথার্থ মূল্যায়ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বর্তমান নীতিনির্ধারকদের ঘোষিত নীতি এবং মাঠের কার্যক্রমের মধ্যে দুস্তর ফারাক বিদ্যমান। এক-এগারোর পরবর্তী দুর্নীতি দমন অথবা নির্মূল অভিযানে দেশের বেসরকারি খাত সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে। আক্রমণের ধাক্কায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে আতংক, দ্বিধা এবং আস্থাহীনতা এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট। এ আস্থাহীনতা দূর করার জন্য কোনোরকম সংকেত সরকারের কোনো মহল থেকেই না আসায় পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি কতভাবে এবং কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে সম্পর্কে অন্য নিবন্ধে আলোচনা করেছি। বর্তমান লেখায় আলোচনা শুধু কর্মসংস্থান সংশি-ষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখছি। বাংলাদেশে সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ হয়েছে ২০০২-০৩ অর্থবছরে। বর্তমান অর্থবছরে নতুন আরেকটি জরিপ করা হলে বিগত চার বছরে মোট কর্মসংস্থান এবং দেশের শ্রমশক্তির খাতওয়ারি ব্যবহারের সার্বিক পরিবর্তনের চিত্রটি অনুধাবনে সহায়ক হতো। তবে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী জানা গেছে, ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত এ সময়কালে বিধিবদ্ধ খাতগুলোয় (Formal Sector) অন্তত ২০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিবেচনায় যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি। দুঃখজনকভবে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কর্মসংস্থানের এ গতি মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে।

কর্মসংস্থানের এ দুরবস্থা দীর্ঘায়িত হলে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা কোন জাদুর কাঠির পরশে অর্জিত হবে সেটি বোধগম্য নয়। পরিতাপের বিষয় হলে শাসকদের মধ্যে এ সমস্যা নিয়ে তেমন কোনো উদ্বেগ এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তারা দুর্নীতির মূলোৎপাটন নিয়েই মত্ত। এমন একটি পরিস্থিতি হয়তো সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যেখানে দেশে সম্পদই সৃষ্টি হবে না। কাজেই দুর্নীতিবাজদেরও লুণ্ঠন করার মতো অবশিষ্ট কিছুই থাকবে না। মাথাও নেই, তাই মাথা ব্যথাও নেই। দুর্নীতি দূর করার এ অভিনব প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই আমাদের কারো কাম্য হতে পারে না। সরকার থেকে বলা হচ্ছে, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যই দেশের প্রধানতম সমস্যা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে জনদুর্ভোগের কারণ হলেও পনের কোটি জনসংখ্যার এ বাংলাদেশে সর্বদাই একনম্বর সমস্যা হচ্ছে দেশের

www.pathagar.com

কর্মক্ষম বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করা। সব সরকারেরই নিজ স্বার্থেই প্রচেষ্টা থাকে দ্রব্যমূল্যকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, যেটি বর্তমান সরকারও করে যাচ্ছে যদিও সাফল্যের মুখ দেখেনি। কিন্তু শাসকদের উপলব্ধি করতে হবে যে উৎপাদনশীল খাতে অধিকতর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দ্রব্যমূল্যজনিত সমস্যা মোকাবেলার অপর এক কৌশল। মনে রাখা দরকার, ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেলেও জনগণের তাতে কোনো উপকার সাধিত হয় না। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ সংশি-ষ্ট নানা বিশে-ষণের ওপর শাসকদের একটু কষ্ট করে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকারের সময় দেশের জনগণ দুঃখজনকভাবে দ্বিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত হচ্ছে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। অর্থ উপদেষ্টা নিজেই সরকারের এ ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও বলে দিয়েছেন, আগামী ছয় মাসে দ্রব্যমূল্য কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। একই সাথে সরকারের সদুদ্দেশ্যেই গৃহীত বেশ কিছু অর্বাচীন কার্যকলাপের ফলে জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগও দ্রুত হারে সংকুচিত হয়েছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার চেয়ে যুৎসই উদাহরণ খুব বেশি একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অর্থনীতিবিষয়ক বিভিন্ন লেখায় উপরিউক্ত আশংকা ব্যক্ত করে বিগত ছয় মাস ধরে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের ক্রমাগত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের জন্য সম্ভাব্য বিপদের এ ব্যাপকতা সরকার এখনো যে সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছে এমন কোনো লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এ সরকারের সব কার্যক্রম অদ্যাবধি দুর্নীতি দমন এবং রাজনৈতিক দলগুলোয় সংস্কার এ গন্ডির মধ্যেই আটকে আছে। শাসকরা নিজেরাই যেহেতু স্থির করেছেন, তারা অন্তত পক্ষে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাবেন সে কারণে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারা যে প্রকৃতপক্ষেই আন্তরিক এটি প্রমাণ করার জন্য সরকারের অন্তত তিনটি পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক। এক. মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন, দুই. সরকারের সাম্প্রতিক কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দ্রুত পুনর্বাসন এবং তিন. বেসরকারি খাতকে পুনরায় উজ্জীবিত করার জন্য উপর মহল থেকে যথাযথ সংকেত প্রদান। জানি না নীতিনির্ধারকদের কাছে এসব পরামর্শের আদৌ কোনো মূল্য রয়েছে কি না। তবে সাবেক সরকারের সময় অব্যাহতভাবে অর্জিত বার্ষিক ১.৮ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচনের নজির অতিক্রম করতে না পারলে সেটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশাল ব্যর্থতা হিসেবেই দেশবাসীর কাছে গণ্য হবে। জনগণ সে ব্যর্থতা মার্জনা করবে কি না সেটি অবশ্য ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে।

১৮.০৭.০৭

www.pathagar.com

সমন্বয়হীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্ববিরোধী মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার পর সরকার এবার মুদ্রা সরবরাহ সংকোচনের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা গ্রহণ করল। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার প্রস্তাবিত প্রধান কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ সংকোচন, প্রদত্ত ঋণের ওপর সুদের হার বৃদ্ধি এবং আমানতের ওপর সুদের হার হ্রাস। এরকম একটি 'পেটে কষে গামছা বাঁধা' মুদ্রা সংকোচন নীতি ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও বর্তমান অর্থবছরের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ অর্জিত হবে। মনে হচ্ছে, বর্তমান সরকার সোনার পাথর বাটি তৈরি করার কোনো বিশেষ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীতে করতে হলে অব্যাহতভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির যে কোনো বিকল্প নেই এ বাস্তবতা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও স্বীকার করবেন। প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগকে সবরকমে নিরুৎসাহিত করে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিস্ময় জাগে যে, মাত্র বছর দুয়েক আগেও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন সে সময় আমাদের এ বাংলাদেশেই সুদের হার এক অংকে নামিয়ে এনে শিল্পখাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সরকারের আগামী ছয় মাসের মুদ্রানীতি ঘোষণাকালে আরো বলেছেন, দেশের বর্তমান অবস্থা বেসরকারি খাতের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জরূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং পুঁজির উচ্চমূল্য তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেই সমন্বয় করতে হবে। আশাটা একটু অতিরিক্ত হয়ে গেল না কি? বিগত সরকারের আমলে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে গভর্নর আমার সহকর্মী ছিলেন এবং তিনি একজন অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবেই সমাজে পরিচিত। তবে ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান যে, জরুরি অবস্থার বর্মে সুরক্ষিত থেকে একটি অনির্বাচিত সরকারের শাসনকালীন এ ধরনের একটি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে পেরেছেন। সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের সময় সর্বদা নিন্দায় পঞ্চমুখ, হাওয়া ভবন সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের আবিষ্কর্তা, বাঘা বাঘা সব অর্থনীতিবিদ এখন গেলেন কোথায় ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। শীতকাল এখনো আসেনি যে তাদের শীতকালীন নিদ্রা দেয়ার সময় এসেছে। পাঠক, আলোচ্য মুদ্রানীতি এবং জ্বালানির প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে সিপিডি'র সাম্প্রতিক সমালোচনামূলক মন্তব্যের বিষয়টি আমার স্মরণে আছে। তবে সিপিডি প্রসংগে পরে আসছি। একটি তথ্য

www.pathagar.com

এখানে উলে-খ করা বোধহয় একেবারে অপ্রাসংগিক হবে না, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারই ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদকে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বানিয়েছিল এবং বর্তমান বিশেষ সরকারও তাকে স্বপদে বহাল রেখেছে। ড. আহমেদের মতো চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত বহু মেধাসম্পন্ন, সৎ এবং দক্ষ ব্যক্তি সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে এখনো স্বপদে কাজ করে চলেছেন। তার অর্থ হলো, বিগত সরকার কর্তৃক প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণের ঢালাও অভিযোগ ধোপে টিকছে না। যা হোক, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের প্রস্তাবিত মুদ্রা সংকোচন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা আদৌ বাস্তববসম্মত কি না তা বিবেচনা করতে হলে সদ্য প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৭-এ বর্ণিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের মাত্র প্রথম চার মাস গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী আড়াই মাস প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ মাস সামরিক বাহিনী দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত বর্তমান জরুরি সরকার দেশ পরিচালনা করছে। মুশকিল হলো, প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাবে পুরো বছরের সাফল্য-ব্যর্থতাকে একসাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এজাতীয় পরিস্থিতিতে সব সরকারেরই প্রবণতা থাকে শুধু সাফল্যটুকুর মালিকানা নিজেরা দাবি করে ব্যর্থতার ভার অন্য সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়ার। গত ছয় মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষমতাসীন সরকারের চরিত্রেও ভিন্নতা কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনো বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ এড়াতে পুরো বছরের পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করেই দেশের বর্তমান অর্থনীতির অবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাতীয় আয়, কৃষি ও বনজ খাত, বিদ্যুৎ এবং নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধি কমেছে যথাক্রমে ৬.৬৩ থেকে ৬.৫১, ৫.২৩ থেকে ২.৯৫, ৭.৪৫ থেকে ৪.৫২ এবং ৮.৩১ থেকে ৭.০৫ শতাংশ। অন্যদিকে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, খনিজ ও খনন, গ্যাস এবং পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে যথাক্রমে ১০.৭৭ থেকে ১১.১৯, ৯.২৬ থেকে ১০.০২, ৯.৩৭ থেকে ১০.৫৫ এবং ৬.৭৫ থেকে ৭.৪৪ শতাংশ। উলে-খ্য, ২০০৫-০৬ অর্থবছরেও জাতীয় আয়, কৃষি ও বনজ, খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প এবং গ্যাস খাতে প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বগামী ছিল। ওই বছর বিদ্যুৎ এবং পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে প্রবৃদ্ধি কমলেও নির্মাণ খাতে তা অপরিবর্তিত ছিল। পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি-সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বিগত সরকার কর্তৃক নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে এ খাতে প্রবৃদ্ধি দুই অংক অতিক্রম করেছে এবং পরপর দু'বছর ঊর্ধ্বগামী প্রবৃদ্ধির ধারা আমরা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছি। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি অর্জন করতে হলে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের দুই অংকের এ প্রবৃদ্ধি যে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট একটি দেশ হলেও ভোক্তার সীমিত ক্রয়মতার কারণে প্রধানত রফতানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির ওপর আমাদের জাতীয় আয়

www.pathagar.com

বহুলাংশে নির্ভরশীল। মূল্য সংযোজিত, শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে একদিকে যেমন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে রফতানির নতুন বাজার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হবে। সব মিলিয়ে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন, বিনিয়োগ ও রফতানি বৃদ্ধির আনুপাতিক হারেই কেবল আমাদের দেশে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়া সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই বর্তমান অর্থবছরে বিনিয়োগে যে আশংকাজনক স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

বিগত সরকারের পাঁচ বছরে বাংলাদেশে বিনিয়োগ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির পর ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হিসাবে আগের বছরের ২৪.৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪.০৩-এ দাঁড়িয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি সুদূরপ্রসারী অশনি সংকেত। আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিনিয়োগ আগের বছরের ১৮.৭-এ স্থির থাকলেও সরকারি খাতে বিনিয়োগ ৬.০ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশ হারে বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্ষমতা থেকে প্রস্থানের সময় এ হার ১৮.৭ অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে জিডিপি'র ০.৬ শতাংশ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এ সময়কালে আমাদের শিল্পের সার্বিক সক্ষমতা, রফতানির জন্য পণ্যের জোগান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ উলে-খযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের রফতানি আয় ২০০১-০২ অর্থবছরের ৫.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থলে আজ বার্ষিক ১২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। পাঁচ বছরে রফতানি আয় দ্বিগুণ করার এই অদ্বিতীয় নজির ধরে রাখার ওপরই বাংলাদেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো সংবাদ মাধ্যমেই আমাদের এ দরিদ্র দেশের কর্মঠ মানুষের সাফল্যগাথা প্রকাশিত হয়নি। বরং আমাদের দুর্নীতি, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়গুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। স্বদেশ সম্পর্কে কুৎসা রটনার জন্য বিদেশ থেকে টাকা এনে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ প্রতি সপ্তাহে সেমিনারের আয়োজন করেছে। সুশাসনের অভাব এবং দুর্নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে পাঁচ বছর ধরে সেমিনারের পর সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। অথচ এ বিপুল জনসংখ্যার, দুর্বল অবকাঠামোর একটি দেশ শত বাধা পেরিয়ে কেমন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে একটি সেমিনার করার জন্যও কোনো বেসরকারি আয়োজক কিংবা বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসেননি। কেন দ্বিমুখী আচরণ - এ প্রশ্নের জবাব এখন সম্ভবত একটু একটু করে আমরা পেতে শুরু করেছি। আমাদের বর্তমান শাসকরা বড় বেশি মাত্রায় সুশীল সমাজভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ সিপিডি'র গবেষণাকর্ম না পড়ার জন্য সাংবাদিকদের ভর্ৎসনা করেন, কেউ আবার বাংলাদেশে টিআইবি'র দুর্নীতিবিষয়ক আবিষ্কারের সপক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন। সংশি-ষ্টদের এ হীনম্মন্যতা দেখে সংশয় জাগে, তবে কি 'এক-এগারো'র নেপথ্য কারিগর এরা সবাই? রাজনীতিবিদরা সম্পদের প্রতি তাদের অশী-ল ও সীমাহীন লোভ এবং পারস্পরিক জিঘাংসা প্রদর্শনের মাধ্যমে হয়তো বা আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ দিনের এ যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের অজুহাত সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, দেশে বিনিয়োগ কমতে শুরু করেছে। আমাদের অর্থ উপদেষ্টা বেসরকারি খাতের ১৮.৭ শতাংশ হারে বর্তমান বিনিয়োগে অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি সম্ভবত ভুলে গেছেন, ২০০৫-০৬ অর্থবছরেও স্থানীয় বিনিয়োগের একই হার ছিল এবং বর্তমান বছরে সে হার আর বৃদ্ধি না পাওয়াটাই দেশের অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনকে সংকেত। অর্থ উপদেষ্টা অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ। তিনি জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি হলে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় কিংবা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যে বিনিয়োগে একটি বৃহৎ অন্তরায় এসব তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ নিশ্চয়ই একমত হবেন, বিনিয়োগের সুফল জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে পরিণত হতে শিল্পের প্রকারভেদে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে যে উচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে তার ফলে দেশে স্থিতিশীলতা বজায়সাপেক্ষে আমাদের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি সম্ভবত ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। বিনিয়োগ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বছরের জানুয়ারি থেকে জুন, অর্থাৎ জরুরি বর্তমান সরকারের শাসনামলের প্রথম অর্ধবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ নেতিবাচক ধারা বছরের অবশিষ্ট ৬ মাস অব্যাহত থাকলে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি কমতে বাধ্য। ফলে ওই সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও বড় আকারের পতনের আশংকা রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ মন্দার নেতিবাচক প্রভাব কর্মসংস্থানে অবশ্য তার অনেক আগেই অনুভূত হবে। জরুরি অবস্থার এ অতি কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যেও সাম্প্রতিক সময়ে গুরুতর অপরাধ প্রবণতার যে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা শুধু আইনশৃঙ্খলাজনিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে বর্তমান সরকারের ভুলের তালিকা দীর্ঘায়িত হবে মাত্র।

সহস্রাব্দের দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা শীর্ষক নিবন্ধে কর্মসংস্থানের করুণ অবস্থার চিত্র বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। ওই লেখাটিতে আশা প্রকাশ করেছিলাম, বেসরকারি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ আশা ভংগ হতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগেনি। অর্থ উপদেষ্টা কিংবা গভর্নর মহোদয় যা-ই বলুন না কেন, ঘোষিত মুদ্রানীতির বাস্তবায়ন যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রাপ্তিকে কঠিন ও ব্যয়বহুল করে তুলবে, এটি বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এ ধরনের মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হলে এ নীতির প্রতিবাদে এত দিনে সব চেম্বার নেতা সাংবাদিক সম্মেলন থেকে শুরু করে মানববন্ধন পর্যন্ত সবকিছুই করে ফেলতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় স্বাগত জানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন হেলাল উদ্দিনের মতো দোকান মালিক সমিতির কোনো 'বিপ-বী' নেতা সরকারি কর্তাব্যক্তির দানাপানি বন্ধ করার হুমকি প্রদানের কথা নিশ্চয়ই কল্পনায় আনতেও ভয় পান। ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণকারী প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলের চরম অরাজক সময়ে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজকে ঠিক এ ভাষায়ই হুমকি প্রদান করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআন শরিফে মহান আল-াহতায়ালা বারবার সীমা লংঘনকারীদের সাবধান করা সত্ত্বেও এ দুষ্কর্মটি আমরা সবাই নির্বিবাদে করে চলেছি।

বেসরকারি খাতের জন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহব্যঞ্জক মুদ্রানীতি ঘোষণার আগে সরকার বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে শিল্পের কাঁচামালের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করে দেশের

www.pathagar.com

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের ওপর প্রথম আঘাতটি হেনেছে। সবশেষে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় উদীয়মান শিল্প খাতের সব সম্ভাবনা রুদ্ধ করার জন্য চূড়ান্ত আঘাতের আগাম ঘোষণা দিয়েছেন। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের একসাথে মূল্যবৃদ্ধির অভিনব ও অবিবেচনাপ্রসূত ফর্মুলা বাস্তবায়িত হলে দেশজ উৎপাদনের বৃহত্তম এ শিল্প খাতের কফিনে শেষ পেরেকটি সরকার সাফল্যের সাথে ঠুকে দিতে সক্ষম হবে। ক'দিন আগে সেনাপ্রধান এক বক্তব্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকেই তার বাহিনীর বিশেষ সমর্থনপ্রাপ্ত সরকারের প্রধান সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য একসাথে বৃদ্ধি করা হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কী গতিতে বৃদ্ধি পাবে সেটি দেশের সর্বাপেক্ষা সংগঠিত বাহিনী প্রধান উপলব্ধি করতে পারছেন কি না, সে বিষয়ে অবশ্য আমরা জ্ঞাত নই। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, সেনাবাহিনী এ সরকার পরিচালনার সাথে জড়িত নয়, তবে সরকারের সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করছেন। দেশের সাধারণ জনগণ সরকার পরিচালনার প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখে না কিংবা শাসকদের বক্তব্যের নিগূঢ়ার্থ নিয়েও তাদের মাথা ঘামানোর সময় নেই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একটি বিষয় শাসকদের সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে এক-এগারোর সরকারের সফলতা-ব্যর্থতার সাথে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীর ভাবমর্যাদা এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, বর্তমান সরকার পরিচালনায় তাদের ভূমিকার প্রকৃত রূপ আর কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন সরকারের প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের কারণে সাধারণ জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়ভার প্রকাশ্য এগারো জনের সাথে দুঃখজনকভাবে সেনাবাহিনীকেও বহন করতে হবে।

১৯৯১ সাল থেকে গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হওয়ার পর প্রায় ষোল বছর সফলতা ও ব্যর্থতার সংমিশ্রণে রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের সফলতার কথা কেউ উলে-খ করার প্রয়োজনবোধ করেন না। বিগত সরকারের প্রদত্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাসহ সব মহল শুধু ব্যর্থতার পরিমাপেই ব্যস্ত। এগুলো সবই আমাদের সুযোগসন্ধানী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান সরকারও অনন্ত কাল ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে না। জনগণ তাদেরও মূল্যায়ন করবে সার্বিক কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করেই। যতই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করা হোক না কেন অথবা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের পরিবারের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত গ্রেফতার করা হোক না কেন, একটি সরকার কোনো সংকীর্ণ দর্শনের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হতে পারে না। বর্তমান সরকার দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, তা নিয়ে জনমনে যে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয় না। বিনিয়োগের নিম্নমুখী প্রবাহ, সংকোচনশীল মুদ্রানীতি, শিল্প খাতবিরোধী শুল্কনীতি, জ্বালানির উচ্চমূল্য ও অব্যাহত বৃদ্ধি এবং নানাবিধ সরকারি পদক্ষেপের কারণে সন্ত্রস্ত ও দ্বিধান্বিত বেসরকারি খাতের অসুস্থ মিশ্রণ দেশের তুলনামূলক সবল অর্থনীতিকে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান বন্ধ, সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস সব মিলিয়ে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান যে ক্রমেই নিচের দিকে যাচ্ছে, এ চরম সত্যটি আর আড়াল করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনীতির এ নাজুক অবস্থা প্রলম্বিত হলে দারিদ্র্য বিমোচন তো দূরের কথা, বরং সাম্প্রতিক সময়ে যারা দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছেন তাদের আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার আশংকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতিনির্ধারকের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই এখন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। স্থানীয় শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে রফতানি বাজার শেষ করে বাংলাদেশের ১৫ কোটি জনগণের এ বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজারও আঞ্চলিক পরাশক্তির হাতে সমর্পণ করার জন্যই কি আইএমএফ'র নির্দেশের কাছে বর্তমান শাসকদের এ প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পন? সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ নীতিগুলোর প্রতি আইএমএফ'র অযাচিত ও অকুণ্ঠ সমর্থন জনমনে উপরোক্ত সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করেছে। যে সুশীল সমাজ দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চিহ্নিত করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল এবং সরকারকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তারাও এখন সম্ভবত পিঠ বাঁচানোর তাগিদে উল্টো গীত গাইতে শুরু করেছে। বিশেষ সমাজভিত্তিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠান, সিপিডি এতদিন ধরে দৃশ্যত সরকারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার পর এখন অনেকটা আকস্মিকভাবেই সরকারের মুদ্রা নীতি ও জ্বালানি নীতির বিষয়ে সমালোচনামুখর হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক পরাশক্তির স্থানীয় পোষ্য কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি অতীতের রাজনৈতিক সরকারের দলগুলোয় ক্রিয়াশীল চাটুকারদের মতো সর্বতোভাবে নীতিনির্ধারকদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যাতে সরকার অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে। ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের বিরক্তি উৎপাদনজনিত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত আমাদের নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন সরকারকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ তাদের ভোল পাল্টানোর এ দুর্বল প্রচেষ্টা দেখে ডুবন্ত জাহাজ থেকে পলায়নপর ইঁদুরের গল্পই দেশবাসীর স্মরণে আসবে। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এ ব্যক্তিরাই বাংলাদেশের বর্তমান জটিল অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তারা পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্নকারী অপতৎপরতা চালিয়েছেন, বর্তমান সরকারের প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন নেতিবাচক পরামর্শ দিয়ে শাসকদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছেন। সর্বদা অর্ধসত্য সংবলিত তথ্য দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন। এ শ্রেণীর এখন আত্মোপলব্ধি করা উচিত, কোনো মুখোশ ধারন করেই আর জনগণের রুদ্ররোষ থেকে পালানো যাবে না। বাংলাদেশের দুর্নীতিপরায়ন রাজনীতিকরা আজ যেমন তাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে, একই পন্থায় জ্ঞানপাপীরাও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডের জন্য অদূর ভবিষ্যতে বিচারের সম্মুখীন হবে এমন প্রত্যাশা দেশবাসী করতেই পারে।

আমার বিভিন্ন লেখায় শাসকদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, দীর্ঘমেয়াদি তাদের সাহসী ও ভালো কাজের সঠিক মূল্যায়ন হবে না, যদি না বর্তমান সরকারের

www.pathagar.com

শাসনামলে সাধরণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সংশি-ষ্টদের আরো উপলব্ধি করতে হবে, দুর্নীতির নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য বিস্তার সত্ত্বেও সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ বাস্তবভিত্তিক বিষয়গুলো আমলে না নিয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে সংস্কার পরিচালনার ব্যাপকতা অনুধাবন না করে শুধু দুর্নীতির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হলে দেশের সার্বিক এবং অর্থবহ উন্নয়ন সম্ভব নয়। কল্পনার রাজ্য এবং বাস্তব জগতের মধ্যে যে বিশাল ফারাক রয়েছে সেটিকে অস্বীকার করলে নিজেকে শুধু হাস্যাস্পদ করে তোলাই হয়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। এর আগে একটি লেখা গ্রিক পুরাণের 'নার্সিসাস' বিষয়ক গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। এ লেখাটি ষোড়শ শতকের স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মিগুয়েল সারভেনটিসের লিখিত পৃথিবী বিখ্যাত কালজয়ী গ্রন্থ 'ডন কুইহোট ডি লা মাঞ্চ'র প্রধান চরিত্র ডন কুইহোটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শেষ করছি। এ গ্রাম্য অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক হঠাৎ করে একদিন নিজেকে মধ্যযুগীয় বীররূপে কল্পনা করতে শুরু করলেন। একটি হাড় জিরজিরে ঘোড়া এবং তার গ্রামেরই এক নির্বোধ প্রতিবেশী সাংকো পানজাকে সহকারী যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ অন্যায় দূর করার দুর্নিবার এক মহৎ আকাংখা নিয়ে ডন কুইহোট যোদ্ধার বেশে গৃহত্যাগ করলেন। এ রম্য ও প্রতীকী কাহিনীর সমাপ্তিতে প্রবীন কল্পনাবিলাসী ভদ্রলোকের ভুল ভাঙল। তিনি কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন এবং পরিশেষে গভীর মনোবেদনা নিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, আমাদের দেশে একাধিক ডন কুইহোটের পুনর্জন্ম ঘটেছে।

২৫.০৭.০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com